শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮

বর্ষ—২৮ সংখ্যা—১

756.3
002/25

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী	
সাবিত্রী	...
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
আত্মার মুক্তি ও প্রকৃতির রূপান্তর	অরবিন্দ বসু
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. বি. পুরাণী
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীনা
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০'০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

P8446

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12

Edited by : NOLINI KANTA GUPTA

Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

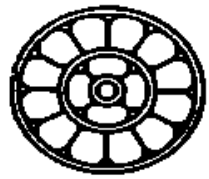

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮

ভাগবত প্রেমের প্রকাশ শীঘ্রতর করবার শ্রেষ্ঠ
উপায় হল সত্যের বিজয়ে সহযোগী হওয়া।

—শ্রীমা।

মাতৃবাণী

ছোটদের জন্য

(১)

আনন্দকে জানা হ'ল ভগবানকে জানা।
ভগবানকে জানা হ'ল আনন্দকে জানা।
দুটি অন্তরঙ্গভাবে চিরন্তনভাবে এক অদ্বিতীয় অবিভাজ্য একত্বে সংযুক্ত।

৩০-৮-৬৭

*

এ হল তোমার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সাধারণ জীবনে আসক্ত যা আর যা আকাঙ্ক্ষা করে দিব্যজীবন, এই দুই-এর মধ্যে যেটি বলীয়ান তাকেই বেছে নেবে, কাজ করবে সেই অনুসারে।

*

ঝগড়া করা সব সময় ভুল, এমন কি যদিও তুমি নিজে আরম্ভ না করে থাক।

*

দুটির একটি বেছে নিতে হবে—একদিকে পুরাতন সাধারণ জীবন, তার বিধান, সংস্কার সব, আর একদিকে নবজীবন, যা নিয়ে যায় ভাগবত চেতনার কাছে। নিজে বেছে নাও, স্থির সিদ্ধান্ত কর।

*

ব্যায়াম করা, সহজ এবং সুস্থ জীবন যাপন করা ভাল নিশ্চয়ই। কিন্তু শরীরকে সত্যসত্যই যদি নির্দ্দোষ করে তুলতে হয়, তবে তাকে দিব্য শক্তিসকলের কাছে নিজেকে খুলে ধরতে হবে, একমাত্র ভাগবতপ্রভাবের অনুগত হতে হবে, নিরন্তর আস্পৃহা রাখতে হবে ভগবানকে লাভ করবার জন্যে।

*

আমাদের সকল প্রয়াস প্রচালিত হয় যেন সত্যের অনুপ্রেরণায়।

*

আমাদের অনুপ্রেরণা সত্যের দিকে, আমাদের সত্তার মধ্যে আমাদের সত্তার যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে সেই সত্যের পূর্ণ বিজয়ের দিকে।

*

হে সত্য, আমরা চাই তুমি আমাদের দিশারী হও, পৃথিবীতে আসুক তোমার রাজ্য।

*

সত্যই হয়ে উঠুক তোমাদের কর্তা ও নিয়ন্তা।

*

শিক্ষার সকল স্তরে, আরম্ভে, মধ্যমভাগে এবং উচ্চতর বিভাগে শিক্ষার্থীরা সকলেই তাদের শিক্ষায় যোগসাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তারা নিজেদের তৈরী করবে চেষ্টা করবে নূতন জ্ঞান নামিয়ে আনবার জন্যে, সুতরাং বলা যেতে পারে সকল শিক্ষার্থীরা যোগ সাধনা করে।

তবে একটা পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যেতে পারে সাধক এবং শিষ্যের মধ্যে। শিষ্য হতে হ'লে প্রয়োজন আত্ম-সমর্পণ আর সেই সিদ্ধান্ত হবে পূর্ণাঙ্গ, স্বতঃস্ফূর্ত। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে যখন আসে তার আহ্বান। এ জিনিষ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না বা এমন কি পরামর্শ হিসাবেও দেওয়া যায় না।

দেহগত কোষদের প্রার্থনা

ভগবৎপ্রসাদের ফলে আমরা ধীরে অচেতনা হতে উঠে চলেছি সচেতন জীবনের মধ্যে, জেগে চলেছি, এখন তবে এই তীব্র প্রার্থনা আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে—

"বিশ্বের পরম বিধাতা তুমি, তোমার কাছে আমাদের বিনতি, আমাদের দাও সেই শক্তি, সেই সৌন্দর্য্য, সেই সুসমঞ্জস পরিপূর্ণতা যার কল্যাণে আমরা হয়ে উঠতে পারব পৃথিবীর উপরে তোমার দিব্য যন্ত্র।

*

নিষ্প্রাণ বাহ্য অনুষ্ঠানের পিছনে রয়েছে একটা জীবন্ত প্রতীক—তাকেই স্মরণে রাখবে।

শান্তি সদ্ভাব সকলের জন্য।

রূপান্তরের দাবী হ'ল সমগ্র এবং অখণ্ড উৎসর্গ। সকল সত্যকার সাধকেরই এই নয় কি আস্পৃহা?

সমগ্র অর্থ পাশাপাশি সত্তার সকল স্তরে, জড়তম থেকে সূক্ষ্মতম। অখণ্ড অর্থ স্তরেস্তরে, যে সব বিবিধ এবং প্রায়শঃ বিরোধী অংশ দিয়ে বাহ্যসত্তা গঠিত, (দেহ-প্রাণ-মন), তাদের মধ্যে।

যদি তুমি সত্যসত্যই ভগবানকে ভালবাস, তবে তা প্রমাণ কর শান্ত হয়ে স্থির হয়ে। প্রত্যেকেরই জীবনে যা-কিছু আসে তা আসে ভগবানেরই কাছ থেকে একটা কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে। আর আমরা যদি তা ঠিক ভাবে গ্রহণ করি তবে আমরা দ্রুতবেগে এগিয়ে যাব। তাই তবে চেষ্টা কর।

(২)

আর কোন চেতনা নেই
পরম চেতনা ব্যতিরেকে।
আর কোন ইচ্ছাশক্তি নেই
পরমা ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে।
আর কোন জীবন নেই
পরম জীবন ব্যতিরেকে।
আর কোন ব্যক্তি নেই
পরম ব্যক্তি ব্যতিরেকে
যিনি এক এবং সর্ব্ব।

আমি কখনও ধ্যানে বসি না। তার জন্যে সময়ও নেই, আর দরকারও নেই, কারণ ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ ধ্যানের সহায়ে হয় না, তা হয় উৎসর্গ ও প্রণতির সহায়ে। আর সে উৎসর্গ ও প্রণতির সাধনা হয় জীবনের যাবতীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়ে।

জীবনে যত বৎসর তুমি কাটিয়েছ তা তোমাকে বৃদ্ধ করে তোলে না, তুমি বৃদ্ধ হয়ে পড় যখন ক্রমগতি তোমার থেমে যায়।

যখনই তুমি অনুভব কর যা-কিছু তোমার করবার ছিল তা তুমি শেষ করেছ, যখনই তুমি মনে কর, তুমি জান যা-কিছু তোমার জানবার ছিল, যখনই তুমি বসে পড়তে চাও তোমার প্রয়াসের ফল ভোগ করবার জন্য, এই বোধ নিয়ে যে জীবনে তুমি যথেষ্ট কর্ম্ম করেছ, তখনই সেই মুহূর্ত্তেই তুমি হয়ে পড় বৃদ্ধ, তখনই তোমার ক্ষয়ের আরম্ভ।

পরন্তু যখন তোমার স্থির বিশ্বাস যে যা তুমি জান তা যা এখনও জানবার রয়েছে তার তুলনায় কিছুই নয়, যখন তোমার অনুভব, যা তুমি করেছ তা যা করবার আছে তার সূত্রপাত মাত্র, যখনই তুমি চেয়ে দেখ ভবিষ্যৎকে মনোহর সূর্য্যের মত, প্রোজ্জ্বল সে তার অসংখ্য ভাবী সম্ভাবনা সব নিয়ে, তখনই তুমি তরুণ, পৃথিবীর উপরে যত সংখ্যক বৎসরই তুমি কাটিয়ে থাক না কেন, তরুণ তুমি, সমৃদ্ধ তুমি আগামীকল্যের যাবতীয় সিদ্ধি নিয়ে।

আর যদি তুমি না চাও শরীর যাতে বিকল হয়ে পড়ে, তবে বৃথা চাঞ্চল্যে তোমার শক্তিসব ক্ষয় হতে দিও না। যা-কিছু করবে, করবে শান্ত আত্মস্থ স্থিতির আশ্রয়ে। শান্তির মধ্যে, নীরবতার মধ্যেই পরম সামর্থ্য।

সাবিত্রী

(অনুবাদ)

(৫)

[সাবিত্রী সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সৃষ্টি পার হয়ে চলে গিয়েছে সৃষ্টিকর্ত্তার পাশে—সৃষ্টিবিধাতা তাঁর ত্রিমূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন সাবিত্রীর সম্মুখে। পরব বিধাতা শেষে তবে বললেন : "সাবিত্রী, এই দেখ সৃষ্টিরহস্য, মূল রহস্য হ'ল এই—এক ধারা নেমে এসেছে, উপর থেকে এখানে অবধি, আর একধারা উঠে গিয়েছে, এখান হতে ঊর্দ্ধ অবধি। এ দু'ধারা পাশাপাশি চলে গিয়েছে, উভয়ের মধ্যে সংযোগের সেতু যেন নাই। তুমি এক ধারায় নেমে এসেছ, অপর ধারায় এখন উঠে চলে যাও। তোমাকে দেখিয়েছি ঊর্দ্ধের জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় শ্রীময় পূর্ণতাময় লোক সব, তাদের পরম উৎসের মধ্যে গিয়ে তুমি চিরন্তন শাশ্বত শান্তি সুখ সার্থকতা ভোগ করতে পার।" সাবিত্রী কি বললেন এই নিমন্ত্রণের উত্তরে ?]

ঊর্দ্ধে ছিল অনন্তের ধ্যানমগ্ন আনন্দ,
ছিল তার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিময় প্রশান্তি
আর তার অচঞ্চল নীরবতা, নির্ব্বিশেষ নিঃসঙ্গ।
শক্তি যত গাথা সব সংখ্যাহীন সম্মেলনে।
বিশ্বের স্রষ্টা যে আনন্দ জীবন্ত হয়েছে দেহে তার।
মধুময় রূপের তার শীর্ষ হ'ল প্রেম আর প্রবোধ;
লুব্ধকর তাদের জালের বন্ধনী মাঝে
রেখেছে বেঁধে গর্ব্বভরে রসস্নাত অঙ্গেরা
আভোগ যত, ছুটে চলে যারা
অতিক্রমী হৃদয়ের দ্রুততাল,
ধায় যারা প্রাণের বাসনাবেগ পশ্চাতে ফেলে রেখে।
যা-কিছু দর্শন চোখে ধরা দেয়নি কখনো,
যা-কিছু সুখ ধরা দেয় স্বপ্নে আর সমাধিতে
যে অমৃত প্রণয়ের কম্পিত হস্ত হ'তে ঝরে পড়ে,
যে উল্লাস প্রকৃতির পেয়ালা ধারণ করে না,
জমাট হয়েছে সব তার সুখের সুষমায়,
উন্মুখ তারা তার মধুর হাস্যে ফুটে উঠতে।

নিঃশব্দচারী মুহূর্তেরা লুকিয়ে রেখেছে যাদের,
ভাবনা যত পায় না ভাষা জীবিতের কণ্ঠে,
অসীমের সঙ্গে জীবাত্মার সফল সঙ্গতি
জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে, হয়েছে প্রজ্বলিত বহ্নিময়,
কুসুমের তারকার নিভৃত আলাপ
হয়েছে অর্থময় তারই অতল দৃষ্টির মাঝে,
ওষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গে ফোটে কথা উষার অরুণিমা যেন,
হাসি তার খেলা করে মনের বিস্ময়সঙ্গে,
মুছে যায় যদি এসে অধরপ্রান্তে
রয়ে যায় তবু হৃদয়ের মাঝে ;
করে ঝলমল উষার তারকার প্রভায়,
রয়ে খচিত করে দেয় আকাশের উদার প্রকাশে।
দৃষ্টি তার শাশ্বতের নিরীক্ষণ,
বচনের প্রশান্ত একাগ্র ভাবধারা তার
জ্ঞানময় নীড় যেন মহাতৃপ্তির—খুলে ধরে
যুগ যুগান্তরের আলো, মুহূর্তমালার উল্লাসে
অলৌকিক কুঞ্জবনে জ্বলে জ্ঞানসূর্য্য যেন।
মনের বিশাল বিচিত্র ঐকতান মাঝে তার
বিরোধী আকৃতি যত লভে তাদের নিবিড় সাজাত্য,
সমৃদ্ধ হৃদয়ে প্রীতিময় বিস্ময়ে সম্মিলিত তারা,
মুগ্ধ পরস্পরের বহুল বিবিধ সুরের খেলায়
একানুবর্ত্তী পরিবারে ভ্রাতৃকুল যেন
মিলেছে পুনরায় তাদের অভিন্ন অপরূপ গৃহতলে।
আনন্দ-বিভোল কোন দেবতার বীণা হ'তে
ঝঙ্কৃত যেমন রতস গীতের সুর-সঙ্গতি,
অগাত রহে না সেখানে স্বর্গের কোন রসভোগ—
প্রনৃর্ত্ত জ্যোতির মাঝে এহেন জীবনধারা :,
সীমাহীন আকাশে প্রসারতা সে দেবতা,
দুঃখহীন পৃথিবীর প্রাণাবেগ সে দেবতা,
বিশ্বব্যাপী তপনের প্রদাহন সে।
দুজনা চাহিল এই দুজনার পানে
আত্মা হেরিল আত্মারে।

*

হৃদয়ের জ্যোতির্ময় গুহা হতে বজ্রের মত
বাণী এক ঊর্দ্ধে উঠে গেল—যাদুকর ধ্বনি তার
পৃথিবীর মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনকে রূপান্তরিত করে
পরম উল্লাসে, বিলাপ তার হয়ে ওঠে আত্মার সঙ্গীত।
হে অমর বাণীর মানুষী প্রতিমা!
পুষ্পরাগ প্রাচীরের ওপারে স্বর্গের দুয়ারে
দেখেছ কি তুমি দীপ্তিময়ী স্বয়ম্ভুকুল,
ডেকে তুলেছ কি দেবগণে তাদের জাগ্রত প্রসুপ্তি থেকে?
জ্ঞানোদ্ভাস তোরণের তলে উদার উন্মুক্ত করে ধরেছ কি
চিন্তাবৃত কারুখচিত দুয়ারখানি,
অধ্যাত্মদৃষ্টির বীথিশ্রেণী করেছ অর্গলমুক্ত
আর ঊর্দ্ধতর স্বর্গের প্রবেশপথ এক দেখিয়ে দিয়েছ
তোমার আত্মারে—আনন্দ-বিভোল আত্মা যে
নিয়ে চলে সোনার কাঠি।
মানুষের অন্ধ নয়ন হারিয়েছিল যে গুপ্ত দৃষ্টি
তোমার মধ্যে খুলে ধরেছে তার আপন লক্ষ্য,
পার হয়ে আমার রথযাত্রা সব কালক্রম,
পার হয়ে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ আমার, কেটেছি যারে
জীবনের ভিতরে
আনন্দের অদৃশ্য দূরান্তরে পৌঁছিবার জন্যে।
সতর্ক দেবতার নিস্তব্ধ জিজ্ঞাসা আমি,
আমার জ্ঞানের রহস্যময় বৃহৎ কর্ম্মের সন্ধানে চলে তারা,
স্বর্গগামী সহস্র পথের যোগাযোগে হয় যার পরিচয়,
অনবগুণ্ঠিতা কিরণের মধুরিমা আমি,
সীমাহীন রজনীর গভীর পথ সব বেয়ে
আমি নিয়ে চলি
পৃথিবীর অজেয় তীর্থযাত্রী-হৃদয়,
মাথার উপরে তারকাদের মশাল জ্বালিয়েছি
অদৃশ্য আনন্দসার আমি,
আমাকে দেখেছে যে আর শোক নাই তার।
নিশীথের কোলে নিবাস যে নয়নের তারা আমার
দেখবে বরূপ।
ধূসর দুঃখ-অরণ্যের আকাশের নীচে

বয়ে চলে যে সচেতন ফেনিল সঙ্কীর্ণ জলস্রোত
তার ছায়াচ্ছন্ন দুই কূলে
দুটি শক্তি পাশাপাশি বিচরণ করে
জন্ম তাদের একই আদি আনন্দ হতে
বিচ্ছিন্ন যদি বা মানুষের জীবনে—
একটি আনত পৃথিবীর দিকে আর একটির আকাঙ্ক্ষা
আকাশের অভিমুখে।
স্বর্গ তার হর্ষ নিয়ে স্বপ্ন দেখে এক সর্ব্বসুন্দর পৃথিবীর,
পৃথিবী তার বেদনা নিয়ে স্বপ্ন দেখে সর্ব্বসুন্দর স্বর্গের,
উভয়ে আকাঙ্ক্ষা করে উভয়ের মিলন, তবুও চলে পৃথক পথে;
মিথ্যা তাদের ভেদ, এসেছে তাদের মিথ্যা আত্ম-মোহ হতে,
তাদের একত্ব হতে বিচ্ছিন্ন তারা তাদের মায়ার আতঙ্কে।
যোজনের পর যোজনের চিন্তা তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে
অপরূপ ব্যবধান
পরস্পরের দিকে তারা চেয়ে রয় সুপ্তির নীরব
গহ্বরের পারাপারে
অথবা শয়ান তারা পাশে পাশে আমার অসীমার উপরে
বর ও কন্যা যেন, বিচ্ছিন্ন ছিল যারা কোন যাদুবশে,
জাগে তারা, চায় পরস্পরের, কিন্তু পারে না
আলিঙ্গনবদ্ধ হতে।
প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে, তাদের বাসরশয্যায়
দোলে যে ক্ষীণ রেখা খড়্গের ছায়ামূর্ত্তি এক
তারে অতিক্রম করে যেতে পারে না তারা।
কিন্তু যখন মায়াবী বহ্নিরেখা নিভে যায় মুছে যায়
তখন দেশ বা কাল আর বিচ্ছিন্ন করে না
প্রেমিক হতে প্রেমিকারে, দেশ সরিয়ে ধরে তার
বিপুল স্বচ্ছ যবনিকা, কাল হয়ে ওঠে
অন্তরাত্মার অফুরন্ত আনন্দের নিঃসরণ।
তোমাদের ভাগ্যের সেই স্বর্গীয় মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় থেকো;
তবে তার আগে তোমরা দুজনে মৈত্রের বিধান
পালন করে চলবে—
সে বিধান সবে মাত্র দিব্য চক্ষুষ্মান অগ্রণীদের লক্ষ্যে এসেছে,
যারা তাদের চিন্তার বনরাজী ভেদ করে এগিয়ে চলে,

অবশেষে পৌঁচেছে গিয়ে দেবলোকের সঙ্কীর্ণ যত সেতুবন্ধে।
অপেক্ষা কর, সয়ে চল রূপের ভঙ্গুর বন্ধনসব,
বিচ্ছেদ হ'ল তোমাদের মধুর উপায়,
তোমাদের একত্বের আনন্দ, তাতে আনন্দে আনন্দে বহুগুণিত হবে
তোমাদের উভয়ের অন্তবর্তী স্পন্দিত আকাশের আকর্ষণের বশে ;
কিন্তু তবুও তুমি যদি দুর্গত ভূতল ছেড়ে চলে যেতে চাও।
মর্ত্যের মলিন হাহাকারে কর্ণপাত না করে,
পার হয়ে এস তবে সেতুবন্ধ, জলপ্লাবন অতিক্রম করে,
কর্ম্মকৃৎ শক্তির সঙ্গে তোমার সহযোগ দূর কর,
ছিন্ন কর পার্থিব জীবের সঙ্গে যে বন্ধন বেঁধেছে তোমায়—
মানুষী হৃদয়ের জন্যে মুছে ফেল করুণা,
উঠে দাঁড়াও—তোমার অন্তরাত্মার অর্জিত অধিকার সার্থক কর,
দূরে ফেলে দাও তোমার ক্ষণিকের আসুতার ;
উদাসীন নক্ষত্রের হিমদৃষ্টিতলে
ফেলে এসে মাটির উপরে তোমার ঋণকৃত দেহভার ;
হে চিন্ময়, উঠে এস তোমার আনন্দের ভবনে
এই এখানে চিরন্তন শিশুর ক্রীড়াক্ষেত্রে
অথবা জ্ঞানময় দেবতাদের রাজ্যে কর বিচরণ
তোমার জ্যোতিপুঞ্জ সঙ্গীকে নিয়ে যথেচ্ছ ভ্রমণ কর,
অনন্তগামী এক সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত চিন্ময় আকাশের তলে ;
জীবনযাপন কর দেবতাদের মত,
জগতের জন্য কোন চিন্তা না রেখে
প্রকৃতির শক্তির কর্ম্মশ্রমে কোন অংশ না গ্রহণ করে ;
তাদের আত্মমগ্ন রভসের মধ্যে কালযাপন করে তারা।
দূরে ফেলে দাও পার্থিব বাসনার অনিশ্চিত মরীচিকা
হে অমর, উঠে যাও পরাৎপর আনন্দে।

শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

(১)

তাঁর "ধ্যান ও প্রার্থনা"য় শ্রীমা বলছেন—

"এত অনুরাগ, এত যত্ন দিয়ে যে ভোজ্য আমি তৈরী করলাম, মানুষ তা চাইল না, তাই ভগবানকে ডাকলাম তা গ্রহণ করতে।

ভগবান, তুমি ত গ্রহণ করলে আমার নিমন্ত্রণ, আমার পাতা আসনে এসে বসলে তুমি আর আমার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর নৈবেদ্যের পরিবর্তে আমায় দান করলে শেষ মুক্তি।"

৩।৯।১৯

এই কথাকটিতে মা বুঝিয়ে দিলেন, সৃষ্টির মধ্যে, পৃথিবীর উপরে আমাদের যা পরম করণীয় কর্ম্ম বা সেবা তা দিয়ে আমরা পৃথিবীর, মানুষের উপকার করব এ জন্য নয়—আমরা উপকার করছি এই ভাবটির মধ্যে উপকার করার চেয়ে বেশি জোর এসে পড়ে যায় "আমরা"র উপর। এতে সাধারণতঃ আমাদের ব্যক্তিগত অহংই বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং অপরেরও সত্যকার কল্যাণ কর্ম্ম সাধিত হয় না। ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে ভাগবত ইচ্ছায় বা প্রেরণায় যে কর্ম্ম তাই সত্যকার কর্ম্ম, ফলপ্রসূ কৃতি। ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্ম হবিঃ··· সকল যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরকে সর্ব্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় এবং সর্ব্বদাই তাঁর শরণ গ্রহণ করতে হয়। ব্রহ্ম, পরম সৎপুরুষ ভগবানই সব—কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম—প্রত্যেক উপাদান বা অঙ্গ সেই এক মূল চেতনায় সচেতন থাকবে নিরন্তর, পদে পদে ফিরে ফিরে সেই এক উৎসের সঙ্গে মিলে চলতে হবে তাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ বিধান যেমন সত্য এবং অলংঘনীয় তেমনি দেবতাদেরও এই শাসন মেনে চলতে হয়। আমরা স্মরণ করতে পারি উপনিষদে দেবতারা কিরকমে তাঁদের বিজয়ে গর্বিত হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন তাঁদেরই নিজেদের বিজয়, তাঁদের নিজেদের মাহাত্ম্য এ। তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান হয়েছিল বিজয়িনী শক্তি আর এক।

ভগবৎ-কৃপাও যখন নেমে আসে এই পৃথিবীতে শরীরী হয়ে ব্যক্তিরূপ নিয়ে, সর্ব্বদা সে সংযুক্ত থাকে তার স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে এবং সজ্ঞানে সর্ব্বদা তার বাহ্যপ্রেরণা আসে সেই একই উৎস হতে, বাহ্যচেতনার প্রতি মুহূর্ত্তে এই সংযোগ জাগ্রত রাখতে হয় আপন কর্ম্ম সিদ্ধির জন্যে এবং মানুষের শিক্ষার জন্যে। যন্ত্রীর মুক্তি, নিত্যমুক্তি এই রকমে, মুক্তকর্ম্মও এই রকমে।

মায়ের এই ধ্যান-প্রার্থনাটি আমাদের কাছে ধরে দিয়েছে আর একটি সত্য যা আমাদের মানুষদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়।

কোন সামগ্রী তবে না এনেছিলেন মানুষের জন্যে যা আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হ'ল সে আর কিছুই নয়—মানুষের জন্য দেবত্ব, মর্ত্যের জন্য অমরত্ব। মানুষ চাইলে না মৃত-সঞ্জীবনী, পৃথিবী চাইলে না স্বর্গের সুধা। চায় না প্রথমত: অজ্ঞানের বশে; এমন বস্তু যে কিছু আছে তার জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। আদিকাল হ'তে অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে সে এসেছে, অন্ধকার ব্যতীত অন্য বোধ বা গতি তার নেই।

A shadow spinning through a soulless void...
Earth wheeled abandoned in the hollow gulfs,
Forgetful of her spirit and her fate."

ছায়া এক ঘুরে চলেছে চেতনাহারা রিক্ততার ভিতর দিয়ে...
ঘুরে চলেছে পৃথিবী, পরিত্যক্ত যেন শূন্য এক গহ্বরের মধ্যে,
ভুলে গিয়েছে তার অন্তরাত্মাকে, ভুলে গিয়েছে তার নিয়তিকে।

এই অজ্ঞানের জাগরণ হয় কখনও কখনও, জোর করে, যন্ত্রণের আঘাতে যেন। কিন্তু ক্ষণিকের অনভ্যস্ত জাগরণ, ক্ষণিকের মধ্যেই চক্ষু তার নিমীলিত হয়ে যায়। কোন প্রকারে জাগ্রত হলেও, অজ্ঞান তার কথঞ্চিৎ দূর হলেও, আসে আবার তার অনিচ্ছা; অপরিচিতকে নূতনকে গ্রহণ করতে স্বাগত করতে চায় না, চায় না এবং পারেও না। কারণ নূতন হয় তার পক্ষে পীড়ন, অন্ধকারের কাছে আলো আসে তার স্নেহপ্রলেপ নিয়ে নয়, দংশন নিয়ে। আনন্দের ধারা তার কাছে হয় প্রলয়-প্লাবনের দুর্যোগ। অজ্ঞান, অনিচ্ছা, অশক্তি ছাড়াও অধঃপতিতের, প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে আর একটি নিবিড় বাধা, তা হ'ল প্রচ্ছন্ন বিরোধ এক, স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান।

একটা দ্বৈত হ'ল সৃষ্টির মূল প্রকৃতিগত। যে মুহূর্ত্তে হয়েছে সৃষ্টি সেই মুহূর্ত্তেই তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে অসৃষ্টি অর্থাৎ প্রলয়ের প্রবেগ। ফলত: প্রতি মুহূর্ত্তে একটা ধ্বংসকেই আশ্রয় করে সৃষ্টি ফুটে উঠেছে। এই সত্যেরই আর এক রূপ জন্ম-মৃত্যু। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মধ্যে নিহিত যে একটা ঊর্দ্ধমুখী গতি তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তাকে অস্বীকার ক'রে বাধা দিয়ে চলেছে আর একটা প্রবৃত্তি, তাও স্বাভাবিক। এই যে দ্বন্দ্ব তার অর্থ আবিষ্কার এবং তার মীমাংসারও আবিষ্কার হ'ল প্রকৃতির ও মানুষের জীবন-যাত্রার রহস্য। ব্যক্ত প্রকৃতির তিনটি স্তর—তার অনুসরণে মানুষেরও মধ্যে তিনটি জগৎ। আমরা সকলেই জানি তা হ'ল, দেহ প্রাণ ও মন। দেহ প্রাণ ও মনের বর্ত্তমানে হ'ল অজ্ঞানের বা অর্দ্ধজ্ঞানের ধর্ম্ম। বিশ্বের প্রগতি এবং মানুষের প্রগতি অর্থ এই অপরিণত দেহের প্রাণের ও মনের মধ্যে নূতন জ্ঞানের, নূতন চেতনার এবং নূতন সত্তার আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। দ্বন্দ্ব তবে ঠিক এইখানে—প্রতিষ্ঠিত পুরানের সঙ্গে নূতন আবির্ভাবের। এই রহস্যের একটি পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্যে, 'সাবিত্রী' গ্রন্থে।

(২)

মাটির মানুষের ত্রাণকর্ত্রীরূপে, তার ইষ্টদেবী হয়ে ভাগবত জননী প্রকট হলেন তাঁর ত্রিমূর্ত্তি নিয়ে। এই ধারাত্রয়ে জননী আবির্ভূত হয়েছেন সৃষ্টির মানুষের পরিশোধনের জন্য পরিত্রাণের জন্য। সৃষ্টির প্রথম পৈঠা পৃথিবী, মানুষের আসন এই মাটি এবং মাটির দেহ। এখান থেকেই শুরু জীবনযাত্রা কিন্তু যাত্রা আরম্ভ যজ্ঞান দিয়ে দুঃখ দিয়ে দৈন্য দিয়ে মৃত্যু দিয়ে। তাই এখানে জননী নিজেই হয়েছেন দুঃখময়ী, দাক্ষিণ্যময়ী, সন্তাপনয়ী, সন্তাপহারিণী, সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় মানুষের বেদনা ও অভাব নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন—আপনাকে আপনি ব্যথিত করে তুলেছেন, তাই ত হ'ল তাঁর ছিন্নমস্তারূপ, সপ্তশূলবিদ্ধধারাময়ী ছিন্নমস্তা (The Mother of Seven-Sorrows), পরম করুণায়, কারুণ্যে প্লাবিত তিনি মানুষের সালোক্যে সাধর্ম্যে সাযুজ্যে। এইভাবেই তিনি প্রবাহিত করেছেন তাঁর আন্তর স্নেহের ধারা, তাঁর পবন প্রেমের অন্তরঙ্গ প্লাবন।

মূর্ত্ত ভগবৎ-প্রসাদ সাবিত্রীর কাছে নেমে এল এই ভগবানের দান, এই কারুণ্যদেবী, সন্তপ্ত মানুষের সেবায় পরিবপনের জন্য। কিন্তু জগৎ-জননীর এই করুণা ও কারুণ্যবৃত্তি মাটির মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তার দৃষ্টি উর্দ্ধে উঠে চলে না, সে দেখে কেবল তার পরিচিত নিত্যনৈমিত্তিকের দুঃস্থতা ও দুরবস্থা। ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানভরে সে বলে ওঠে—

I am the Man of Sorrows, I am he
Who is nailed on the wide cross of the Universe...
I toil like the animal, like the animal die.
I am man the rebel, man the helpless serf...
I know my fate will ever be the same,
It is my Nature's work that cannot change.
I was made for evil, evil is my lot;
Evil I must be and by evil live;
Nought other can I do but be myself;
What Nature made, that I must remain.

"আমি হলাম দুঃখসার মানুষ, সেই জীব
বিশ্বের বিপুল ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে...
পশুর মত আমি পরিশ্রম করি, পশুর মত প্রাণ হারাই।
আমি হলেম মানুষ বিদ্রোহী যে, অসহায় দাস যে...

আমি জানি চিরকাল আমার ভাগ্য একই থেকে যাবে
আমার প্রকৃতির যে কর্ম্ম তার পরিবর্ত্তন হবে না।
পাপকর্ম্মের জন্য আমার জন্ম, পাপকর্ম্মই আমার ভাগ্য;
আমাকে হতেই হবে পাপকর্ম্মী, পাপই আমার জীবন।
আমি আমিই, অন্য কিছু হতে পারি না।
প্রকৃতি আমাকে যেমন গড়েছে তেমনি আমাকে থাকতে হবে।

মানুষ যখন গ্রহণ করলে না এই প্রসাদের দান, ভাগবতী জননীর প্রতিভূ প্রত্যাবর্ত্তন করলেন যেন তাঁর করুণাময়ী প্রতিচ্ছায়াসহ, কিন্তু আশা দিয়ে গেলেন তিনি ফিরে আসবেন, মানুষকে জগৎকে এই অজ্ঞাননয় ক্ষোভ হতে মুক্ত করবেন

One day I will return, a bringer of strength...
Misery shall pass abolished from the earth,
The world shall be freed from the anger of the Beast,

একদিন আমি ফিরে আসব, নিয়ে আসব সামর্থ্য...
পৃথিবী থেকে মুছে যাবে দুঃখ-দৈন্য,
জগৎ মুক্ত হবে পশুর হিংস্রতা থেকে,

কেবল কারুণ্য নয়, প্রয়োজন আমার শক্তির। শক্তির প্রতিষ্ঠা প্রাণে। প্রাণে ভাগবতী শক্তি তাই কালীশক্তি, তারই নাম রুদ্রাণী, মহাকালী। এই শক্তিই পিছনে থেকে সৃষ্টিকে মানুষকে নিয়ে চলেছে অব্যর্থভাবে তার মহাসিদ্ধির অভিমুখে। এই মহাশক্তিরই আর এক নাম দুর্গা ও লক্ষ্মী। এই শক্তিই আছে বলে—

"Slowly the Light grows greater in the East,
Slowly the world progresses on God's road.
His seal is on my task, it cannot fail;
I shall hear the silver swing of heaven's gates
When God comes out to meet the soul of the world."

পূর্ব্বাশায় ধীরে আলোক ফুটে উঠেছে, বেড়ে চলেছে,
ধীরে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে ভাগবত সরণীর উপর দিয়ে।
তাঁর অনুজ্ঞা রয়েছে আমার ব্রতের উপর,
কখনও তা ব্যর্থ হবে না

আমি গুনব স্বর্গের দুয়ার খুলে গিয়েছে কৃপানী ঝংকার দিয়ে
ভগবান যখন প্রকট হয়ে আসবেন বিশ্বের আত্মার সঙ্গে
সম্মিলনের জন্যে।"

কিন্তু মানুষী শক্তি তার অজ্ঞান অহংকারে এ দেবীকে স্বীকার করে না। মানুষী শক্তি দেবী-শক্তির প্রতিবিম্ব প্রতিচ্ছায়া, অনেকাংশে অপচ্ছায়া মাত্র। মানুষের বিশ্বাস অর্থাৎ এই যে অহংকার-প্রতিষ্ঠ প্রাণশক্তি তার ধারণা এবং বোধ, তারই আপনশক্তিতে তার সিদ্ধি অধিগত হয়ে চলেছে, মানুষে যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তা সে করেছে আপন গুণের গরিমায় এবং ভবিষ্যতে যদি আরও নবতর সৃষ্টি হয় তবে সে সব হবে তারই আপন প্রতিভার মাহাত্ম্য। বিপুল এক অহমিকার বশে আপনার বাইরে বা উর্দ্ধে আর কোন মহত্তর সত্তাকে সে দেখে না ও বোঝে না। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মধ্যে এরই নাম রাক্ষসী বা আসুরী শক্তি। তার দর্শন হল—

"I climb, a claimant to the throne of heaven,
The last born of the earth, I stand the first...
I am God, still unevolved in human form;
Even if He is not, He becomes in me...
No magic can surpass my magic skill.
There is no miracle I shall not achieve."

"আমি উঠে চলি, স্বর্গের সিংহাসনে রয়েছে দাবী আমার;
পৃথিবীতে জন্ম আমার সর্ব্বশেষে, আমি হয়েছি সর্ব্বপ্রথম—
আমি স্বয়ং ভগবান, মানুষীরূপ গ্রহণ করেছি, এখনও পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠিনি
তিনি যদি নাই থাকেন তবুও আমারই মধ্যে হয়ে ওঠেন...
কোন যাদুই আমার যাদুর চাতুর্য্য ছাড়িয়ে যেতে পারে না,
কোন অলৌকিক ক্রিয়া নেই যা আমি সম্পন্ন করব না।"

মানুষের প্রাণাত্মক ভাগবতীশক্তিকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ভাগবতীশক্তি আশ্বাস দিয়ে যায় তবু, যে আবার সে ফিরে আসবে মানুষের এই অহংকারের গর্জন যখন শান্ত হয়ে যাবে, নবতর শক্তির মহানন্দ আয়ত্ত করবে—

The cry of the ego shall be hushed within,
Its lion-roar that claims the world as food.
All shall be might and bliss and happy force.

অহংকারের আরাব অন্তরে স্তব্ধ হয়ে যাবে ;
তার সিংহ-গর্জন সমস্ত জগৎকে তার আহার্য্য বলে দাবী করে।
সবই হয়ে উঠবে শক্তিময়, আনন্দময়, সুখময় বীর্য্য।

দেহে মানুষ হল পশুবৎ, প্রাণে সে রাক্ষস বা যন্ত্রবৎ, তারপর সে উঠে এল মনে, মনেই সে পেয়েছে তার প্রথম মানুষী ভাব। জ্ঞানের আলো সে পেয়েছে, নব নব আবিষ্কার করে চলেছে, প্রকৃতির সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সব, নিগূঢ় শক্তি সব উদ্‌ঘাটিত করেছে। মানুষের এই সব সুকৃতি সম্ভব হয়েছে, কারণ জগৎ-জননী মানুষের মধ্যে তার অন্তরাত্মার, সৃষ্টির অন্তঃস্থলে নেমে এসেছেন চিন্ময়ী জ্ঞানময়ী জ্যোতির্ময়ীরূপে। মানুষ কিন্তু তার মানুষী জ্ঞান দিয়ে মানুষী চেতনা দিয়ে তাঁর সম্যক পরিচয় পায় না। তার বিশ্বাস এ সবই তার মানুষী আলো তার বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ। এই যে পরম জ্যোতি তা হ'ল আবার আনন্দঘন প্রেমসার, সে নিয়ে আসে যে-প্রশান্তি যে-পরম স্বস্তি মানুষের হৃদয়ে তা স্পর্শ করে কি না সন্দেহ। সত্য যা-কিছু তা তারই জ্ঞানে ব্যক্ত, বাইরে কিছু নেই। পারমার্থিক সত্য, মায়া এবং মোহ। এই হল যাকে বলা যায় মানুষের বিজ্ঞানী মন। একদিকে যেমন তার অন্ধ যাক্-প্রত্যয় আত্ম-বিশ্বাস—আত্মগর্ব্বে ঘোষণা করতে পারে—

I have seized the cosmic energies for my use.
I have pored on her infinitesimal elements
And her invisible atoms have unmasked...
If God is at work, his secrets I have found.

"আমার ব্যবহারের জন্যে যাবতীয় বিশ্বশক্তি আমি কবলিত করেছি।
প্রকৃতির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপাদান সব তন্ন তন্ন করে দেখেছি,
উদ্‌ঘাটিত করেছি তার অদৃশ্য পরমাণুবাহিনী...
ভগবানই যদি কর্ম্ম করে চলেন, তবে তার গুপ্তরহস্য
আমি আবিষ্কার করেছি।"

অন্যদিকে আবার সে তেমনি সন্দেহাকুল, এমন কি অসহায় শিশুর মত—

"All is a speculation or a dream :
In the end the world itself becomes a doubt"

"সবই হল কল্পনা বা স্বপ্ন :
পরিশেষে জগৎ স্বয়ং হয়ে ওঠে সংশয়স্থান।"

বিজ্ঞানের চেতনা তাকে এনে দিয়েছে একটা অস্পষ্ট আনন্দের বোধ কিন্তু তাকে স্বীকার করবার গ্রহণ করবার মত অন্তঃপ্রেরণা তার নাই। তাই তার শাস্ত্র তার শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল—

Our smallness saves us from the Infinite.
In a frozen grandeur lone and desolate
Call me not to die the great eternal Death...
Human I am, human let me remain.
Till in the Inconscient I fall dumb and sleep.

আমাদের ক্ষুদ্রতা অনন্ত থেকে আমাদের রক্ষা করে;
নিঃসঙ্গ জনহীন একটা হিমনিথর মহিমার মধ্যে
আমাকে ডেকে নিয়ে যেও না চিরন্তন মহামৃত্যুলয় পেতে।...
মানুষ আমি, মানুষই রয়ে যেতে চাই
যতদিন না নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবে যাই মূক মহানিদ্রায়—

সাবিত্রীর মধ্যে আবির্ভূতা এই দিব্যজ্যোতির্ময়ী জননী প্রত্যাখ্যাত হ'লেন তাঁর পূর্ববর্ত্তিনীদের মতই। কিন্তু কোন অনুযোগ করা তাঁর এল না, স্নিগ্ধ কণ্ঠে সমচিত্তে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আবার তিনি আসবেন তাঁর অবদান নিয়ে; সে অবদান ত মানুষেরই অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে।

অবিশ্বাসী অতৃপ্ত মানুষকে তবু আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি—

"One day I shall return, His hands in mine,
And thou shalt see the face of the Absolute.
Then shall the holy marriage be achieved,
Then shall the divine family be born."

একদিন ফিরব আমি তাঁর হাতে হাত দিয়ে,
তুমি দেখবে চোখের সামনে পরমের আপন মুখখানি
তখনই ভাগবত পুণ্য-পরিণয় উদ্‌যাপিত হবে
তখনই জন্মগ্রহণ করবে ভগবানের আপন পরিজন।

ফলতঃ সাবিত্রী তাঁর ভাগবতী সত্তা থেকে তাঁর এই শক্তিত্রয়কে ডেকে এনেছেন, সম্মুখে স্থাপন করেছেন মানুষকে দেখাবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে তার স্বরূপের প্রতিবিম্ব কিছু।

উপরের জ্যোতি এই রকমে বার বার নেমে এসে বার বার ফিরে যায়, আবার নেমে আসে—এইরকমেই সৃষ্টি ক্রমে শুদ্ধ হয়ে ওঠে, তৈরী হয়ে ওঠে, এগিয়ে চলে। বৈদিক ঋষির চিত্রে এই রকমই পৃথিবীর উপর কত উষার উদয় হয়েছে, শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, কত কত উষার উদয় হয়ে, কিন্তু সকল উষার এক লক্ষ্য—এক গন্তব্য, এক ইষ্ট, সনাতনবন্ধু—পূর্ণ সূর্য্যের প্রকাশ।

কিন্তু এদের কাজ আরম্ভ হবে কিছু পরে। বর্ত্তমানে সাবিত্রীর সম্মুখে রয়েছে আর একটি বৃহত্তর কাজ, সে জন্যে তাঁকে আরও উর্দ্ধে, আরও গভীরে যেতে হবে। সৃষ্টির দুর্য্যোগের মানুষী অজ্ঞানের দুঃস্থতার উৎসে তাঁকে পৌঁছতে হবে, সেখানে যে শক্তি জীবন্ত মহিমান্বিত তাকে জয় করতে হবে, তারই নাম মৃত্যু, নাস্তিদেব। এই মূল কারণ যখন দূরীভূত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে, তখনই সৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে দেখা দেবে নূতন জীবনের নূতন উষা।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(১০)

তাহলে কর্মযোগের প্রথম সঙ্কেত হল, কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা। এ একটা সাময়িক অনুষ্ঠান মাত্র নয়। যজ্ঞভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সমস্ত জীবনব্যাপী সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত করতে হবে, গীতাতে এরকম নির্দেশ আছে। আবার দেখানো বেদে যজ্ঞকে বলা হয় সুকৃত, এবং তাই হল কর্ম। আবার যজ্ঞভাবনা না থাকলে সব কর্মই বিকর্ম। গীতা পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, শুধু নিজের জন্য স্বার্থভাবনা নিয়ে কোন কর্ম করলে, সেটা বন্ধনই হয়। আবার সেই কর্মই যদি দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে মুক্তি, আর তা-ই যজ্ঞ। আধুনিকযুগে দেবতার বদলে মানুষকে বসানো হয়েছে। মানবজাতির জন্য, মানুষের প্রগতির জন্য কর্ম ছাড়া কর্ম যে দেবোদ্দেশে হয়, এখন আর তা কেউ ভাবে না। সমাজ স্থিতিকে বজায় রাখাও যে কর্মের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন কালেও গার্হস্থ্যাশ্রমে অবশ্য করণীয় ছিল পঞ্চ মহাযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ। সংসারাশ্রমে এগুলি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হলে তবেই তা ধর্মসংসার আখ্যা পেতে পারত। যজ্ঞের মূল ভাব, "ইদং তব ন মম", কিনা তোমারই সব। সেই 'তুমি'র স্থানে আমরা প্রিয়কে না বসিয়ে পারি না। সেজন্য সংসারে ভালবেসে যে ত্যাগ করা হয়, সেটা যজ্ঞ। কিন্তু সেই ত্যাগের মূলে বিরাটের ভাবনা না এলে, যজ্ঞেশ্বরকেও চেনা যাবেনা, যজ্ঞভাবনাও ঠিক হবেনা। ভাগবতের ভাব অনুশীলন করতে গেলে পাই—"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এই ভাবে আমি ছেড়ে তুমি বা দেবতাব এলেই প্রিয়ের জন্য ত্যাগ সহজে হয়, আর চিত্তও বৃহৎ হয় ও অনন্তে প্রসারিত হতে থাকে। আধুনিক যুগে মানবতার প্রভাবে, মানুষকেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ভাবে গ্রহণ করার দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম ভাবনায় এ কথা নতুন নয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা এ সব উচ্চ আদর্শ ছিল এবং আজও আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেবা করতে গিয়ে 'অহং' যদি বিলুপ্ত না হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে, তাহলে সবই নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে, যত বড় পরিবেশে সেবাব্রত গ্রহণ করা হোক না কেন,

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

ত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও প্রেমরসে মধুর না হলে, ঈশ্বরবোধ বা ভগবৎসেবার ভাব হবে না। অন্তর্মুখ হয়ে ছঁশে থাকতে হবে, আর তাতেই হবে যোগ এবং তা হতেই কর্ম হবে যজ্ঞ। কাজেই মনুষ্যযজ্ঞই হোক আর দেবযজ্ঞই হোক, ছঁশে থেকে ভগবৎসেবার বুদ্ধি নিয়ে করতে থাকলে, আর একটি তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে। নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করা যায় যে, হৃদিস্থিত পরম দেবতা সবার মধ্যে থেকেও সবাইকে ছাপিয়ে আছেন। তাঁর নাগাল পেয়েও পাওয়া যায় না। দেবতার সম্বন্ধে এই ভাবই হল লোকোত্তরের ধারণা। ঠিক তেমনভাবে, যখন নিজের উৎসর্গ নিজকেও ছাপিয়ে (Self-exceeding) তাঁর দিকে চলে যায়, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যজ্ঞ। আবার যাঁর উদ্দেশে এই উৎসর্গ, সব ছাপিয়েও যাঁর কূল পাই না, সেই অনন্ত অসীমই আবার যজ্ঞেশ্বর।

তাহলে দেখছি, যজ্ঞের সাধনাই আমাদের কর্মযোগের পথ। কর্মযোগে জ্ঞান ও ভক্তির আর প্রয়োজন নেই, এমন ধারণাও অনেকের হয়। কিন্তু যাঁরা জানি শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের গোড়াতেই বলেছেন, কর্ম জ্ঞান ভক্তি আলাদা করা যায় না। গীতার ভাবও তাই। যাঁর কাছে যাব আর যাঁকে উৎসর্গ করব, সব দিয়ে দেব, সেই তাঁর কাছে অনুরাগ না থাকলে যাবই বা কেন, আর দেবই বা কি করে? তাঁর সঙ্গে আমার পরম মধুর এক প্রীতির সম্পর্ক আছে বলেই, তাঁর জন্য সব বিসর্জন দিতে পারি। এই ভাব বা ভক্তি না থাকলে কর্ম যান্ত্রিক হয়ে যায় কিন্তু ভক্তিতে কর্ম সরস হয়। সেই ভাবে কর্ম করে, আপনাকে যথার্থভাবে দিতে পারলে নিজের স্বরূপকেই ফিরে পাওয়া যায়। স্বভাবে রণচণ্ডী এমন মেয়েকে দেখা যায় যে, ভালবাসার প্রভাবে হয়ে যায় কল্যাণী প্রতিমা। এই ভাবযুক্ত কর্মে চিত্তের উৎকর্ষ হতে থাকে এবং জ্ঞানের পরমে পৌঁছে আত্মাকে জানা যায়। তখনই পরিপূর্ণভাবে ভালবাসায় নিজকে দিতে পারলে বিরাটের ভাব অধিগত হবে। তখন জ্ঞান ও ভক্তির দুই পক্ষ ভর করে, সাধক কর্মযোগে উড়ে চলবে পরম অভীষ্টের পানে।

এই পরম অভীষ্টই যজ্ঞেশ্বর—তিনিই আত্মনিবেদন ত্যাগ বা যজ্ঞ, এ সবের লক্ষ্য। যজ্ঞেশ্বরের ভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অসীম ও অনন্তের সেই বোধটি চাই। আমি তো একদিকে সসীম ও সান্ত, আমার চারিদিকে কত দিক দিয়ে গণ্ডী-টানা। অথচ আমাকে ব্যাপ্ত করে ও ছাপিয়ে বিরাট পৃথিবীরূপিণী এই যে দৃশ্য জগৎ, এ সবই তো তিনি। তিনি ভূমা, তিনি বৃহৎ, তিনি আকাশ বাতাস সব-কিছু, আবার তিনিই আমার সকল শক্তির উৎস। এইভাবে অনন্ত ও বিরাটের বোধে অন্তরজগতের সঙ্গে, ওই বিরাটের এক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যখন কথা বলি, মা-ই রাশ ঠেলে দেন।" তেমনি অনন্ত এক শক্তির ভাণ্ডার থেকেই সব-কিছু শক্তি, মনের ক্ষেত্রে প্রাণের ক্ষেত্রে ও জড়ের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই উৎসারিত হয়। আমি বা আমাদের

এই যে ব্যষ্টি খণ্ডবোধ, তা সান্ত ও সীমিত হলেও, ওই অনন্তবোধে যুক্ত থেকে আমরাও সীমার মধ্যে অসীমকে পেতে পারি। এ কথা যুক্তি দিয়েও বোঝা যায় এবং এতে, আলাদা করে ভগবানের বিগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা না করলেও চলে। অসীম ও অনাদি অনন্তের এক ব্যাপ্তিবোধের আবেশ, আমরা কল্পনায় ও ধারণায় আনতে পারি।

কিন্তু যখন যোগের পথে যাত্রা শুরু হয়, বোধির ক্ষিপ্র ও চমকিত আবির্ভাবে যে রাজ্য-গুলি খুলে যেতে থাকে, তার সংজ্ঞা কিভাবে দিতে পারি? শ্রুতি যেমন বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" কৃপাবাদীও তেমনি বলবেন যে, তিনি না জানালে তাঁর সঙ্গে যোগের রাজ্য বুঝতে পারি, এমন সাধ্য নেই। তাই যদি তাঁর দেখা নাও পাই, তবুও কালের এমন মুহূর্ত আছে যে, প্রতিবোধের দ্বারা বোধ হয়—এটা স্বীকার করে নিয়ে চলতে হবে। সে প্রতিবোধ কালসাপেক্ষ, তাই তাঁর কৃপা ও কালের কৃপা সমানভাবে পাওয়া চাই। এ ছাড়াও অপরের দৃষ্টান্ত দেখে, তাঁর জীবনবেদ প্রত্যক্ষ করেও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের এক মানসিক প্রত্যয়ের ভূমি আছে। সেভাবেও কারো কারো জিজ্ঞাসা জাগে। যুক্তির ভূমিতেই খোলা মন নিয়ে, বিজ্ঞানাগারের সমীক্ষা ও পরীক্ষার মত ফলিত কর্ম করতে করতে সে সে-রাজ্যের সন্ধান পেয়ে গেল, আর যোগসাধনের আনন্দ পেয়ে যোগপথে তাঁর সঙ্গে যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়ল, তাও হতে দেখা যায়।

এই জন্য যজ্ঞেশ্বরকে জানতে ও বুঝতে না পারার জন্য প্রবর্তসাধকের ব্যাকুলতার মধ্যে একটা ছটফটানির ভাব আসে। তিনি কে, তাও সে জানতে চায়, আর তাঁকে প্রত্যক্ষও করতে চায়। তার নিজের মানসী প্রতিমাকে সে চাক্ষুষী করতে চায়। কিন্তু কিভাবে যে সে সেই ত্রিলোভনকে গড়ে নেবে, তা তো সে জানে না। অন্তরের এই আকূতিটি ঠিক মত জাগলে, সেই ভাবের পরিপাকে অন্তরের পথগুলি নানাভাবে খুলে যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ সেই আন্তর পথগুলি সব বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ সাধকের ক্ষেত্রে সাধনার শুরুতেই এক বিরাট পরিমণ্ডল খুলে যায়। যেমন এক বিরাটের পরিমণ্ডল, তার মধ্যে এই আমি। এই বিরাটকে উপনিষদের ভাবনায় দেখতে ও শিখতে হয়। তিনিই সেই বিরাট পুরুষ, পৃথিবী তাঁর পাদপীঠ মাত্র। তাঁর একাংশে স্থিত এই জগৎ। এই অনুভবকে জ্ঞানের ধারায় গ্রহণ করতে পারি। আবার এই বিরাটের ভাবনাতে, আকাশ বাতাস আলো জল ওষধি বনস্পতি, এ সবের মধ্যেও তাঁর উপস্থিতি যেন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। গাছের পাতাটি সূর্যাস্তের সময় শির শির করছে, এর মধ্যে যে তাঁরই স্পর্শ! তাঁরই মধ্যে সর্ব অঙ্গ দিয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, আর আমার শিরায় শিরায় সেই একই প্রাণসত্তাকে বহন করে চলেছি। এ হল ভক্তির দিক দিয়ে অনুভব। আবার এই দুই দিকের দুধারার ভাবের পরিপাকে, অথবা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে আমার সামনে প্রতিমারূপে দেখি—বিষয়ীর বিষয় রূপে। বোধ হয় যে জ্ঞান কর্ম সংবেদন সবই তাঁকে নিয়ে, এরকম

অদ্বৈতরসনিবিড় একরসপ্রত্যয়েও বৃহতের একতান যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। যেভাবেই হোক না কেন, এই বিরাটের কল্পনা বা ভূমাবোধই চিত্তে মুক্তি এনে দেয়। তাঁর অনন্ত-বোধের আভাসে তাঁকে যেটুকু ধরতে পারি! তাও আমি ধরেছি বা খুঁজে পেয়েছি এভাবে কিন্তু নয়, তিনিই যে আমাকে ধরেছেন, আমাকে তিনি পেয়েই আছেন, এই গভীরের ভাবপ্রত্যয়টি আবিষ্কার করতে পারলে, সাধনা অনেকটা নিশ্চিন্ত ও সহজ হয়। শিশু যেমন সহজভাবে জানে ও ধরে থাকে তার মায়ের কোলটি। মা যে তার সবচেয়ে আপন জন এ তার আমার অনুভূতি, গভীরের প্রত্যয়। একথা তো তাকে আলাদা করে শিখতে হয়নি। তেমনি করে, এই আকাশ বাতাস আলো যেমন আমার কাছে প্রত্যক্ষ ও সহজ, তেমন প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রাণে শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে সহজ আনন্দে তাঁকে পাই, এ ধারণার অভ্যাসও জীবনের সহজ ধারার মধ্যে পড়ে। বৈদিক ঋষির আকাশ-ভাবনা যেমন সহজ ছিল, তেমন এক শূন্যতার বোধে যখন নিজকে একেবারে হারিয়ে ফেলি, তখন সেই শূন্যের মধ্যে জাগে আলোর দীপনী। তাঁরই ছোঁওয়ায় বিরাটের বোধে রংছুট হয়ে একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে, আবার তারই আলোর সম্ভারে ঝলমল করা, এই রকম স্মরণ ও মনন চলতে থাকলে বিরাটের আবেশ ঘটে। তাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থভাবনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেছেন, তুমি তাঁর—এটা কিন্তু শেষে হবে। যখন তাঁর ছেঁওয়ায় ধ্যানে আবিষ্ট হয়ে যাই, কোনও কূল কিনারা পাইনা, তখন হল ব্রহ্মের ভাব—অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহং অস্মি ইত্যাদি। এক আত্মচৈতন্য বিরাট হতে হতে বিস্তৃত ব্যাপ্ত, তার মধ্যে খোলা রয়েছে শুধু চোখটি, অর্থাৎ দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র। এতে সবের মধ্যে আমি এ ভাব যেমন হতে পারে, তেমন তিনিই বিরাট অনন্তবোধে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আর তার মধ্যেই আমি বা আমার যা-কিছু সব; এ দুরকম বোধও হতে পারে। যোগের দিক থেকে ওই আমি বা আত্মাকে দেখার সাধনা হল, নেতি নেতি করে খোঁজা। আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই, এভাবে দেখে খুঁজতে খুঁজতে শুধু থাকে কূটস্থ চৈতন্য-রূপে সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র —শিবোঽহম্। আবার তার মধ্যে ডুবে গলে গেলে আত্মার স্বভাবের নিয়মেই আমি বৃহৎ হয়ে যাই—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই অনন্ত। এরই অপর দিক হল এইভাবে জগৎকে দেখে নিয়ে, নেতি নেতি করে উজিয়ে জগৎ-ব্যাপারের সম্পূর্ণ বাহিরে চলে যাওয়া। জগদতীত (transcendent) অবস্থায় চলে গেলে, লোকোত্তরে এক বিস্ফারণ ঘটে। এটা না হলে নেতি নেতি এই আদেশ সম্পূর্ণ হয় না। এর আগে জগতে সবই দেখেছি। তুমি আকাশ বাতাস আলো জল সবই হয়ে আছ, আর দেখেছি বর্ষার জলের মত তোমারই ধারাসারে আমি অভিষিক্ত হয়ে রোমাঞ্চিত। তোমারই মধ্যে আমি—এই ভাব। কাজেই এখানে দুটা পথ দেখতে পাচ্ছি। নেতি নেতি করে গেলে লোকোত্তরে আমার পরম নির্বাণ, অন্তরের পথে এটা হল মোক্ষের পথ, প্রকৃতির ব্যাপার থেকে ছুটি নেওয়ার ভাব

এসে পড়ে আর তীব্র বৈরাগ্য দেখা দেয়। সহজ সংস্কারেও অকস্মাৎ এ ভাব এসে ধরে। স্বামী বিবেকানন্দের এ রকম হতে দেখা গেছে। রামকৃষ্ণদেব এই 'নেতির কথা সহজ কথায় বুদ্ধিগ্রাহ্য করে বলেছেন—এ যেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। একই জিনিষ দেখছি আর একটা করে কোষ ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকছি। শেষ পর্যন্ত আর কিছুই রইল না। এই অবস্থা থেকে প্রকৃতি-পরিণামের পথে আর ফিরে নাও আসতে পারি, একথা আমরা অনেক শুনেছি। কালাপানিতে পড়লে জাহাজ আর যেমন ফেরে না, তেমন এক স্রোতের চোরাটানে যেন সত্তাকে টেনে নিয়ে নিঃশেষ করে দিল এক শূন্যের মধ্যে। এই চরম নেতিটি যথাসাধ্য বুঝে নিতে হবে। এই পথটিকেও ধরলে তিনটি ধারাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তিনি অনন্ত, তিনি জগন্ময়। তিনি জগদতীত হয়েও জগৎ তাতেই পূর্ণ করে রেখেছেন। আর একটি ধারায় জগৎ ছাড়িয়ে, জগদতীত অবস্থায় জগৎ বা সৃষ্টির ব্যাপার আর কিছু থাকে না। শেষ পর্যন্ত তিনি অসৎ। ভক্তির ও জ্ঞানের দিক থেকে দুভাবে দেখলে তাঁকে নিয়েই জগৎ, এই হল বিশিষ্টাদ্বৈত। কিন্তু তিনি জগৎ বা সব ছাপিয়ে নির্বিশেষ মাত্র, এও বাঁচি। রামকৃষ্ণদেব বেলের উপমা দিয়ে বলতেন যে, খোসা বীচি শাঁস সবটা নিয়েই বেল, না হলে ওজনে কম পড়ে। তাঁর নির্গুণ নির্বিশেষ অনাদি অনন্ত ভাব, আর সগুণ সবিশেষ কল্যাণগুণের আশ্রয়ী ভাব, একই সঙ্গে মনের সাহায্যে ধরা অসম্ভব। কল্পনার আশ্রয়ে তাকে ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাই সেই পরম ভাব বা পরম প্রভু যে যজ্ঞেশ্বর, তাঁকে পাওয়ার ধারাতেও তিনটি ভাবনার প্রবলতা দেখা যায়। তিনভাবে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্ক প্রতিভাত, সেই তিন রকমের যুগনদ্ধ বিভঙ্গগুলি হল ব্রহ্মমায়া, পুরুষ প্রকৃতি এবং ঈশ্বর শক্তি।

ব্রহ্ম ও তাঁর মায়ার কথা আমরা একসঙ্গেই বরাবর শুনে এসেছি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগদতীত নির্বিশেষ অনন্ত প্রকাশস্বরূপ, নেতি নেতি করে সেই জ্ঞানে পৌঁছতে জগৎকে ছাপিয়ে যেতে হয়। জগতের প্রলয় ঘটে, নয়তো জগৎ মিথ্যা, এই বোধই পেয়ে বসে। তাই জগৎ বা ব্রহ্মের সৃষ্টিকে বলা হয় মায়া। জ্ঞানের এই চরম অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ তাই কিছু করেন না বা বলেন না, এইরকম নির্বিশেষ অনন্ত হয়ে যান। শান্তম্ শিব এব কেবলম্ অস্তীত্যুপলব্ধিমাত্রম্—এই হল তাঁর সংজ্ঞা। ব্রহ্মকে বলি অক্ষর, অমর অজর। এই ব্রহ্মকে জানা, যেন অনন্ত জ্ঞানের দিকে যাত্রা। এ থেকেই সাংখ্যভাবনা এসেছে। সাংখ্যের পুরুষ কেবল, নির্বিশেষ, সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ। সেই ভাবে শুধু চৈতন্যের পরিচয় পেলে জগৎ ছেড়ে যাবার দিকে ঝোঁক হয়। আঘাত পেলে মোক্ষবাসনা আসে, আর তখন মোক্ষের স্বরূপ বুঝি, এই জগৎ ছাড়ার তাগিদ। জগতে থাকাকে বলি ইতি ইতি। আর জগৎ ছাড়লে হয় নেতি নেতি। তাই যা-কিছু ইতি তাই মায়া, সব ছাড়ো। ওদিকে গিয়ে জগদতীত ব্রহ্মে লয় ঘটল। আমার জগৎ মুছে গেল, নয়তো স্বপ্নে রইল। কিন্তু জগৎ

তো আছে যেমন তেমনই। তার অস্তিত্বের বিলোপ হচ্ছে না। আবার চৈতন্যে লয় পেলেও সকলের চৈতন্যে তা প্রতিভাত। তাই পূর্ণযোগে জগৎকেও সেখানে তুলে নেবার দায় আছে। জগৎকে ছাপিয়ে গেলে, তবেই জগৎকে মুক্ত করার শক্তি জাগবে। না হলে ব্যষ্টির নির্বীজ সমাধিতে জগৎ যেমন, তেমনই থাকে। তাই ব্যাখানে বিপরীত দর্শন হয়, আর সংঘর্ষ লেগেই থাকে। সুপ্তিতে ও স্বপ্নে তেমন নির্বিশেষ ব্রহ্মে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু জাগ্রতে অন্য এক জগৎ—মায়া। এই অনুভূতির দুই কোটির বিরোধ নিয়ে অনেক দার্শনিক কূট তর্ক আছে। তবুও বিরোধ যে একটা আছে, তা অনস্বীকার্য। তাই ব্রহ্ম জগদতীত সত্তা, তা নির্বিশেষ এবং তুরীয় এবং তাতে পৌঁছে সেখানেই যে ভাবে হোক থাকতে পারার ঐকান্তিক এক আকর্ষণ আসে। তাই জগৎকে মায়া বলে, ভ্রান্তি বলে, তা থেকে দূরে থাকাই চরম সত্যের উপলব্ধি, এই প্রত্যয় হয়। কিন্তু তবুও বলতে হবে, এ বিরোধ তো আমারই চৈতন্যে, আমারই উপলব্ধির চরম এক কোটিতে। আমরা জাগলে ঘুমাইনা আবার ঘুমালে তো জেগে থাকি না, এই হল প্রাকৃত চৈতন্যের অবস্থা। কিন্তু যোগে যে জেগে থাকতে হয় সুষুপ্তির নিথরে, আর ঘুমিয়ে পড়তে হয় জাগ্রতের কোলাহলে। জাগরণ আর সুষুপ্তি একই চৈতন্যের দুই কোটি, কাজেই আমার চৈতন্যেই শুধু এই বিরোধ। অনন্ত চেতনার অনন্ত বৈচিত্র্য যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমন আমার বা ব্যষ্টিচেতনার এই দুই কোটিকেও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নির্বিশেষ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ প্রজ্ঞানঘন, সর্বেশ্বর সর্বযোনি, আবার তিনিই প্রভু, তিনিই দ্রষ্টা। তাঁরই মধ্যে হারিয়ে গিয়ে যদি হারানোটাকে সত্য বলি, সেটা হল ব্রহ্মের একদেশ দর্শন। কেননা সেখান থেকেই যে আবার সব বেরিয়ে আসছে, এটা তো ঠিক। না হলে ব্রহ্ম যুগপৎ সুষুপ্তিস্থান পুরুষ স্বপ্নস্থান পুরুষ ও জাগ্রৎস্থান হন কি করে? সুষুপ্তিতে লয় হয়ে ব্রহ্মেই যদি জেগে উঠতে পারি, তবেই পূর্ণযোগের দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হবে। এ দর্শন তো আর বললেই হবে না, হবে তাঁরই প্রসাদে। আগে যেমন বলা হয়েছে যে, স্রোতের চোরাটানে একেবারে তলিয়েই গেলাম এমন যদি হয়, তাহলে কেই বা দেখবে আর মায়াকেই বা কে বুঝবে? সেই যে শুনেছি, নুনের পুতুল সমুদ্রের জলে পড়ে গলে যায়—এও সেই রকম। আবার সেই নুন জমাট বেঁধে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন এক অদ্ভুত দর্শন হয়। সুষুপ্তিতেও দেখা যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি সেই নির্বিশেষ চৈতন্য তা থেকে বেরিয়ে আসছে এই জাগ্রত জগৎ ঠিক তুবড়ির মুখ থেকে অগ্নি শিখার মত, আর ঝিকমিক করছে তার স্বপ্নের অবস্থা। অনন্ত শয্যায় সর্বেশ্বর সর্বযোনি নারায়ণকে আমরা এ ভাবেও দেখেছি, যে তাঁর সুষুপ্তি গুটিয়ে আছে, আবার তিনি এমন এক বিদ্যুৎগর্ভ স্বপ্ন দেখছেন, যা জাগ্রতে ভর্গকুচিতে প্রতিভাত। এ তিন অবস্থা একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে রয়েছে, আবার তিনি এ তিনেরও অতীত তুরীয়। ব্রহ্মের মধ্যে যেমন

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি একই সঙ্গে থাকতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমন যুগপৎ সৃষ্টির অতীত থেকেও সৃষ্টিতে সব বিভঙ্গগুলির মধ্যে নেমে থাকতে পারেন। সুষুপ্তি যে শক্তির উৎস, এটা আমরা প্রাকৃত জীবনেও বুঝতে পারি। ঘুমের মধ্যেই শক্তি সঞ্চাত হয়। কাজেই যেটা সুষুপ্ত ও একদিকে শূন্য, সেটাই আবার শক্তিগর্ভ অবস্থা। এটা আমরা প্রাকৃত ভূমিতেই দেখতে পাই। তাই ওই নৈঃশব্দ্য যে বাকের উৎস এবং উৎস থেকে রাশ ঠেলে দিলে তা তুবড়ির মত বেরিয়ে আসে, এরকম দর্শন হয়। কেউ সুষুপ্তিতে গিয়ে আর ফিরলই না, আবার কেউ ওই তুবড়ির মুখের কাছে গিয়ে দর্শন করে আর কিছু বলে। আবার একদল প্রাজ্ঞ সাধক আছেন, তাঁরা তুরীয়ে বসে তিন অবস্থাই যুগপৎ দেখতে পান। তাই ব্রহ্ম থেকে মায়ার উৎপত্তি নিয়ে স্ববিরোধী যুক্তি থাকলেও, পূর্ণযোগীর অখণ্ড দর্শনে ব্রহ্ম তাঁর মায়াকে নিয়েই নিত্যবিরাজিত। ব্রহ্ম থাকলেই মায়া থাকে। কালাতীত চৈতন্যের উপলব্ধির চরম কোটিতে গেলে ব্রহ্মে মায়ার নির্বিশেষ নিমেষে জগৎভ্রান্তি ঘটে, এই তত্ত্বটি এখানে মুখ্য স্থান পেয়েছে। ব্রহ্ম আর মায়া আসলে যুগনদ্ধ সত্তা।

সাংখ্যসম্মত পুরুষপ্রকৃতির দর্শন ও সাধনা হল যুক্তিযুক্ত সাধনা। এই আমিকে নিয়েই আমার সাধনা। আমার কাছে সব চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ দর্শন হল আমার আমি। আমার কি আছে? ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই সব নিয়ে আমার প্রকৃতি, আর এ সবের অতিরিক্ত এক বস্তু প্রাণ ও চৈতন্য। দেখতে পাই, প্রাণ আমার চৈতন্যেই আছে। চৈতন্য নেই, এ তো কোনসময় হয় না বা হতে পারে না। অবিবিক্তভাবে চৈতন্য যেন সবের মধ্যে জড়ানো রয়েছে। বুদ্ধির দর্শন হল যান্ত্রিক। সকলে যে একভাবে দেখতে পায়, এক রকম কাজ করে, এটাই বুদ্ধির খেলা। জড়ের মধ্যে যান্ত্রিক আবর্তনের পথ ধরেই বুদ্ধিকে উল্লসিত হতে দেখা যায়। যেমন, আমরা এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কারে electronic brain পর্যন্ত গড়তে পারি: যান্ত্রিক নিয়ম থেকেই বুদ্ধিযুক্ত কর্মফল পেতে পারি। কিন্তু ওই electronic brain-রও একজন চালক ও কর্তা দরকার একজন যন্ত্রী মানব। ঠিক তেমনভাবেই আমরা সাংখ্যদৃষ্টিতে বলতে পারি, একজন পুরুষ রয়েছেন চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতি হতে বিবিক্ত। অথচ তাঁরই দৃষ্টিতে উদ্ভূত এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রকৃতির সব খেলা। পুরুষ যদি রসের লোভে প্রকৃতিতে ডুবে যায়, তাহলে জ্ঞান বা চৈতন্য হয় না। এই জন্য পুরুষকে প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। এই প্রকৃতির বিয়োগফলই হল বিবেকজ্ঞান বা শুদ্ধ বিচারের ক্ষমতা। রামকৃষ্ণদেবকে বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন যে, তিনি রসের সমুদ্রে ডুব না দিয়ে কিনারে বসে লেহন করে রস আস্বাদন করবেন, সেই হল সাংখ্যসম্মত বিবেক-জ্ঞানের সাধন। প্রকৃতির কাজ তার স্বভাব অনুযায়ী চলছে, তাতে একটা যন্ত্রের মত নিয়মও ফলিত হচ্ছে, এটা ছঁশে থেকে দেখে যেতে পারলে পরে প্রকৃতি আপনিই সংযত হয়ে আসে, এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম।

এইভাবে আপনাকে দেখতে শিখলে, ভিতরে যা যা ঘটে যায়, তারও দ্রষ্টা হওয়া যায়, আর স্বভাবের বৈষম্যও সুষম হয়ে আসে। তা থেকে তখন প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা (master of situation) হয়ে, প্রকৃতিকে বশে রাখার ক্ষমতা আসে। বিবেক-জ্ঞান ঠিক ঠিক হলে তবেই প্রকৃতিকে শাসনে রাখার কথা আসে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এ এক জটিল বিচারের পথ। ধরা যাক, আমি কেবল ঝামেলা নিয়েই উদ্বাস্ত, তা থেকে মুক্তি চাই। সাংখ্য বললেন, শুধু দ্রষ্টা হয়ে থাক। তাতেও যদি আন্দোলিত হই, তখন দ্রষ্টার ভূমিকা থেকে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব একেবারে কেটে ছেঁটে ফেলতে হবে, শুধু দেখে যাও। এ থেকে অকর্ম ও বৈরাগ্যবাদ আসে। এইভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির সাধনা চলে ক্রমশ বিয়োগের পথে। তাই বলা হয়ে থাকে, সাংখ্যযোগের প্রথম পদক্ষেপই হল প্রকৃতি থেকে বিয়োগ। এ ভাবের পরিপাকে কি পেয়ে থাকি? নরনীরারা উত্তর দেবেন, শেষ পর্যন্তও দ্রষ্টাস্বরূপে থেকে যেতে পারি। কর্তা ভোক্তা উপদ্রষ্টা মাত্র হয়েও প্রকৃতির লীলারস দেখেই যাই, প্রকৃতির বিলয় তো চাই না। বাহিরে তো নয়, আমার ঘরেই সব লীলারসের সাধন চলেছে। পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দ আবর্তিত। প্রকৃতিতে তিন গুণের খেলা চলে, সত্ত্ব রজ তম। অন্তরে এই খেলা দেখলে দেখি, জগতের পর জগৎ খুলে যায় প্রকৃতির নৃত্যচ্ছন্দে। সে প্রকৃতি চিন্ময়ী, আর সেই যে আমার স্বীয়া প্রকৃতি। সে আপন খুশীতে তার আপন ছন্দে খেলে বেড়ায়। আমি জেগে থাকি ঘুমাই আর নেশা করি, বা যাই করি না কেন, গুণময়ী প্রকৃতিই তার রাশ ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেন। আবার আমি কিছুই করব না, নিজে নৃত্য করব না, বুক পেতে দেব তোমার নৃত্যচ্ছন্দের অধিষ্ঠান হয়ে। দেখে যাই, তুমিই নাচো। এই হল শিবের বুকে নৃত্যকালী। আত্মভাব থেকে ব্রহ্মভাবনা। কঠোর সাংখ্যবাদীরা চৈতন্যের উদয়ে প্রকৃতিকে একেবারে ছেঁটে দেন। তাতে জগতের কোন অর্থ থাকে না। এই যে বৈরাগ্যবাদ, এই বৈরাগ্যেরই বা হেতু কি? গীতায় এর প্রতিপূরণ পাই—'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।" শ্রীঅরবিন্দ তাই বিবেক সাধনের পথ গোড়ায় ধরিয়ে দিয়ে এই শেষ পর্যন্ত নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কি ভাবে স্বীয়া প্রকৃতির পরিচয় মেলে। বাহির থেকে দেখা বা প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে দ্রষ্টার ভাব যত গাঢ় হবে, ততই প্রকৃতির ছন্দকৌশল ধরতে পারা যাবে, আর শেষ পর্যন্ত ভগবানের পরমা প্রকৃতিকে বুঝতে পারা যাবে। তাঁর সম্বন্ধে গীতায় তিনি বলেছেন—প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত থাকার শক্তি হল এই আত্মপ্রকৃতিরই চিন্ময়ী শক্তি। নিবৃত্তির শক্তি দিয়ে প্রবৃত্তিকে ছাঁটাই করে, তটস্থ হয়ে দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থানের ফলে, ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চার বস্তু উপচিত হতে থাকে। শক্তির এই ঐশ্বর্যগুলি উথলে উথলে পড়তে থাকে, কিন্তু সে বড় ভীষণ সংঘাত। পুরুষের শুধু একার জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সেও শক্তি। আত্মপ্রকৃতি সমাহিত অবস্থায় থাকেন; সে

ভাবে থেকেও তিনি পুরুষের ছন্দের পরিপূরক ও দোসর হয়ে, তাঁর নৃত্যকলার ছন্দে ঐশ্বর্য ফুটিয়ে চলেছেন। শিবতাণ্ডব তো আছে, তারই সঙ্গে গৌরীর লাস্য। এই রসসমুদ্রের হিল্লোল যদি আমার বাহিরে প্রযুক্ত হয়, তখন দেখতে পাব আমার ভিতরের ঐশ্বর্যই তো সেখানে সুরে ছন্দে তালে লয়ে উদ্বিভঙ্গে উচ্ছল। আমি তখন অনুনয়া। আবার আমি শান্ত ও সমাহিত আছি বলেই আমার প্রকৃতি শতচ্ছন্দা ও বহুচছন্দা, তাতে আমিই ভর্তা ও ভোক্তা। যে রসসমুদ্রের কিনারে উপদ্রষ্টা হয়ে ছিলাম, সেই দ্রষ্টা ও দর্শন অদ্বৈত একরস-নিবিড় হয়ে হয় মহেশ্বর। এই হল যথার্থ পৌরুষ। একদিকে জীবভাবে দ্রষ্টা পুরুষ তটস্থ, অপর দিকে তারই চিন্ময়ী শক্তিতে 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর' হতে পারলে তবেই দর্শন পরিপূর্ণ হয়। এ যেন দুটা জগৎ, অন্তর জগতে পুরুষপ্রকৃতির যুগনদ্ধতা, আর বাহিরের জগৎ-ব্যাপার ব্রহ্মের মায়া বা প্রকৃতির লীলা। এই দুই ভাবই একসঙ্গে আমাদের অখণ্ডদর্শনে সন্নিত করে দেখতে হবে। যতক্ষণ আমাদের অনুভবে ও দর্শনে না মেলাতে পারব, ততক্ষণ বিরোধ থাকবে। তন্ত্রের সাধনায় এই দুই ভাব বিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাই প্রকৃতি মায়া সেখানে যথার্থ শক্তি। সেই যে পুরুষ ওই আদিত্যে "অসৌ", আর আমার মধ্যে এই আত্মা "অয়ম্", সেই ও এই এক, তিনি ব্রহ্ম। এইভাবে আমার জীবন মন্থন করে, যেমন পেয়েছি প্রকৃতি ও পুরুষের যুগনদ্ধ সত্তা, ঠিক তেমনভাবে বিশ্বসৃষ্টির প্রাণসমুদ্র মন্থন করলে যাঁর দর্শন লাভ করি, তিনিই ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি। আদিত্যমণ্ডলে যিনি পুরুষ, যিনি আত্মচৈতন্য, এই ঈশ্বরের শক্তি হলেন তার ধাত্রী। এই শক্তিই মায়া, তাই তিনি মা। তন্ত্রদর্শনে শক্ত্যালিঙ্গিত পরমশিবকেই শক্তিমান্ ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্যক্ দর্শনে ঈশ্বর ও শক্তির যুগনদ্ধ ভাবের অখণ্ডবোধের পরেই ওই তিনটি বিতর্ককেই বিলিয়ে দিয়েছেন।

তিনটি ভাবনার ধারা বিশ্লেষণ করে করে আমরা পেয়েছি, ব্রহ্ম পুরুষ ও ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবত এই আদি অন্বয় জ্ঞানের ত্রিপুটিকে সূত্র করে শ্লোকে সুন্দর করে বলেছেন —"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে"। এই সংজ্ঞাগুলি নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও সেখানে করা হয়েছে এই বলে যে, ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানীর উপাস্য, আত্মবাদীর যোগীর উপাস্য হলেন পরমাত্মা, আর ভক্তের উপাস্য ভগবান। এই ভগবানকে না পেলে পাওয়াও তাই পরিপূর্ণ হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে ব্যাখ্যা ধরেছেন, তার নিহিতার্থও বড় সুন্দর। সূর্যের আলো যেমন জগতে ব্যাপ্ত জগন্ময়, তেমনি ব্রহ্মও ব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দময়—"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। এ হল অধিষ্ঠানতত্ত্ব, এই আলোতেই জগতের প্রকাশ। জগৎ প্রকাশিত না থাকলেও তাতেই আছে। এই আলোই প্রকাশ, এ আলো সবিতার সৃষ্টি। আবার কেউ হয়তো সূর্যের আলোর দিকে দেখল না, সহসা এই জলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে দর্শন করল।

তাতে হল পরমাত্মজ্ঞান ; পুঞ্জীভূত সূর্যবিম্ব হল পরমাত্মা, আবার তা থেকেই বেরিয়ে আসছে আত্মা। শুধু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান চৈতন্য নয়, অন্তর্যামী হয়ে সবের মধ্যে, সবার মধ্যে গভীরে অনুপ্রবিষ্ট এই আত্মা সর্বানুভূঃ, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, অধুনক জ্যোতি। এই আত্মজ্ঞানটিও চাই। সূর্যবিম্ব দেখে আবার মানুষরূপেও দেখাটা দরকার। সূর্যে থেকে দেখা বা কল্পনা নয়, বিগ্রহে তিনিই আছেন। পরমাত্মার প্রবিষ্ট ও সংহত হলে কল্যাণতম রূপটি যে দেখব, তাতো এই মানুষেরই আত্মা। সে হিরণ্ময় পুরুষ একহংস, আবার তারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, রূপে—এই মানুষী তনুতে। এই ভাবে জানার আর শেষ হয় না। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের ত্রিপুটিতে (Triple status of Supermind) এই অন্বয়জ্ঞানের ত্রিপুটিকে নানা ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই জানা গভীর থেকে ক্রমে গভীরতর হয়েই চলে, তুচ্ছ থেকেও তুচ্ছতর আর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ; যেটা কাম্য সেটাই পরমা গতি।

ব্রহ্ম আর মায়া অতিমানস ত্রিপুটির প্রথম পর্ব। এই অনুভূতি বা জানার আলো জমাট বাঁধতে থাকলে সবার মধ্যেই সেই আলোকে জানতে ও দেখতে পাওয়া যাবে সর্ব ভূতে আত্মা, আবার মায়া সর্বভূতাত্মা। একে বোধের দ্বিতীয় পর্বে নিতে পারি। সকলের মধ্যে সেই সূর্য জ্বলছে—'সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ'', এই বোধে জানা হল অতিশয় তুরীয় তত্ত্ব (Absolute) ভাবে তাঁকে জানাও পাওয়া। তাঁকেই পরম পুরুষরূপে, পরমাত্মারূপে জানতে ও বুঝতে শিখলে দেখব তিনিই আবার ভগবান ঈশ্বর, আমার যজ্ঞেশ্বর। তিনিই আমার পুরুষ, আমার পরম পুরুষ। তখনই যজ্ঞেশ্বরকে পরিপূর্ণ করে গভীর ভাবে জানা সম্ভব হবে। সেই যজ্ঞেশ্বরের কর্মই আবার জীবনযজ্ঞ, আবার তাঁতেই সেই যজ্ঞকর্মের নিবেদন উর্ধ্বায়ন ও পরিসমাপ্তি। এই যজ্ঞেশ্বরকে উৎসর্গ করতে হবে আমার যত কর্ম, যত ধর্ম, যত মর্ম, আর পরিশেষে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করে আপনাকে।

(ক্রমশ)

আত্মার মুক্তি ও প্রকৃতির রূপান্তর

অরবিন্দ বসু

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে, তাঁরাই জানেন যে এই যোগের লক্ষ্য সাধারণ প্রকৃতির রূপান্তর, শুধু মুক্তি নয়। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় রূপান্তর একটি বিশেষ অর্থযুক্ত পারিভাষিক শব্দ। রূপান্তর বলতে "প্রকৃতির মামুলি কিছু পরিবর্তন বোঝায় না, সাধুত্ব, নৈতিক উৎকর্ষ, যোগসিদ্ধি (যেমন তান্ত্রিকদের), তুরীয় বা চিন্ময় দেহ এর কোনটিই বোঝায় না। আমি রূপান্তর শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করি। রূপান্তর মানে চেতনার সেই আমূল সর্বাঙ্গীণ ও বিশেষ প্রকারের পরিবর্তন যা, যখন জড় ও প্রাণময় জীব-জগতে মনোময় জীবনের আবির্ভাব হয়, তখন সত্তার মধ্যে চেতনার যে বিকাশ হয়, তার চেয়েও বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, ব্যাপক ও পূর্ণতর আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে এক দৃঢ় ও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ।" *

আমরা আগেই বলেছি পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য প্রকৃতির রূপান্তর। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ওপরে-উদ্ধৃত চিঠিতে "সত্তার আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ" এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। এখানে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নেই। ঐ একই চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র সত্তার বিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। যার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রকৃতিও গণ্য। ভারতীয় দর্শনে প্রচলিত ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে পূর্ণযোগের কাজ শুধু আত্মা বা পুরুষকে নিয়ে নয়, মায়া বা প্রকৃতির দিকেও তার বিশেষ লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অবশ্য মায়ার বা প্রকৃতির একটি উচ্চতর স্বরূপ ও অবস্থা আছে। মায়া মূলে চিন্ময়ী দিব্যমায়া, প্রকৃতি বা পরাপ্রকৃতি হ'ল পরমপুরুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দ এই তিনের অখণ্ড সমষ্টি। পূর্ণযোগের প্রধান কথাই এই যে তা অপরাপ্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে চায় পরাপ্রকৃতির একটি বিশেষ ভাবের শান্তি, জ্ঞান, তপঃ ও আনন্দকে তার মধ্যে নামিয়ে এনে, শুধু একটি ব্যাপক প্রভাব হিসাবেই নয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কার্যকরী শক্তি হিসাবে। আত্মা বা পুরুষের উপলব্ধি এই রূপান্তরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "শুধু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা সমগ্র সত্তার কোন পরিবর্তনই হয় না। উপলব্ধির দ্বারা চেতনার শিখরে একটা উন্মীলন, উত্তরণ ও ব্যাপকতা আসতে পারে যার ফলে সত্তার প্রকৃতি-অংশে কোন আমূল পরিবর্তন না হয়ে শুধু পুরুষ-অংশে

* শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী—১ম পর্ব ১৯৫০, ২২-২৩ পৃষ্ঠা।

অনুভব মাত্র আসে। চেতনার উচ্চতর ভূমিতে উপলব্ধির কিছু আলো পাওয়া যেতে পারে কিন্তু নিম্নতর স্তরে কোন তারতম্য হয় না। এর বহু উদাহরণ আমার জানা আছে। শুধু মনের ক্ষেত্রে বা তার কোন কোন অংশে আলোর অবতরণ হলেই রূপান্তর হবে না। প্রকৃত রূপান্তরের জন্য সেই আলোর দেহে ও আরও নীচে অবতরণ হওয়া একান্ত দরকার। মনে আত্মার আলো অবতরণ করলে মনকে আত্মার ভাবে প্রভাবিত করতে পারে অথবা মনকে বা অংশবিশেষকে কিছুটা বদলাতে পারে। কিন্তু তা প্রাণের স্তরে যে কোন পরিবর্তন সাধন করবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রাণের ভূমিতে আলোর অবতরণের ফলে প্রাণের কিছুটা শুদ্ধি ও প্রসার লাভ হতে পারে বা প্রাণকে শান্ত ও নিস্তরঙ্গ করে দিতে পারে। কিন্তু তাতে দেহ ও শারীর চেতনার কোন বদল হয়না, এমন কি দেহ জড়বৎ থেকে যায় বা তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।"*

শ্রীঅরবিন্দ চৈত্যিক, আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক এই তিন প্রকার রূপান্তরের কথা বলেছেন। বিষয়টি বিশাল। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে পূর্ণযোগের সাহিত্যে এইটি প্রধান বিষয়। আমরা এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলব না কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় ভিন্ন। সংক্ষেপে এইটুকু বলব যে মানুষের মধ্যে যা ভগবানের বাস্তবিক দিব্য অংশ, সেই চৈত্যসত্তা যখন মানুষের মন, প্রাণ ও শরীর এই তিনটিকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যাতে তাদের মধ্যে এক গভীর পরিবর্তন আসে তখন তাকে চৈত্যিক রূপান্তর বলা হয়। আর যখন চৈত্যসত্তা আত্মাকে ও তার বিবিধ শক্তিকে মন, হৃদয় ও সংকল্পের মাধ্যমে শুধু উপলব্ধিই করেনা উপরন্তু তাকে নিজের মধ্যে ও সাধারণ চেতনার মধ্যে ধারণ করে, তখন হয় আধ্যাত্মিক রূপান্তর। "চৈত্যিক রূপান্তর মানে হল মনে সত্য দৃষ্টি ও জ্ঞান, প্রাণে সত্য প্রবেগ ও সংবেদন, শরীরে সত্য প্রক্রিয়া ও নিয়ম নামিয়ে এনে নিম্নপ্রকৃতির পরিবর্তন—সবই ভগবদভিমুখী, সব কিছুর ভিত্তি প্রেম, পূজা, ভক্তি ও চয়নে ভাগবতী মা-কে সব কিছুতে ও হৃদয়ে দেখা ও তাঁরই শক্তি সমগ্র সত্তায় ক্রিয়াশীল এই বোধ হওয়া এবং শ্রদ্ধা, উৎসর্গ ও সমর্পণ সিদ্ধ হওয়া। যখন উপর থেকে স্থায়ীভাবে শান্তি, জ্যোতি, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অবতরণ হয়, আত্মার, ভগবানের ও উচ্চতর বিশ্বচেতনার অনুভব হয় ও সমগ্র চেতনা তাতে পরিণত হয়, তখন হয় আধ্যাত্মিক রূপান্তর।"‡

এই দুই ধরনের রূপান্তরের দ্বারাও চেতনার ও প্রকৃতির সেই আমূল পরিবর্তন হবে না যা পূর্ণযোগের লক্ষ্য। তার প্রধান কারণ এই যে চৈত্যসত্তা বা মন, এই দুটির

---

* শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী—১ম পর্ব ২৩-২৪ পৃষ্ঠা

‡ শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী—১ম পর্ব, ১৪৬-১৪৭পৃষ্ঠা

কোনটিই জগতের মূল উৎস নয়। সেই জন্যই প্রকৃতির রূপান্তরের ব্যাপারেও এদের শক্তি সীমিত। মানসিক চেতনার দ্বারা উপলব্ধি ও তার মাধ্যমে সত্তায় আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণের ফলে আধ্যাত্মিক রূপান্তর সম্ভব হয়, কিন্তু সে শক্তি আত্মার সর্বোত্তম দিব্যজ্ঞান, তপঃ, প্রেম ও আনন্দ নয়। এ ক্ষেত্রে কার্যকরী শক্তি হল আধ্যাত্মিক-মানসিক। অর্থাৎ মনের ভূমিতে মানসিক চেতনা ও প্রকৃতির দ্বারা সীমায়িত সে শক্তি।

উপরের উক্তি থেকে বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ যাকে আধ্যাত্মিক রূপান্তর বলে তার চেয়েও মহত্তর যোগসিদ্ধি সম্ভব। এ কথা মনে রাখা দরকার যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর শুধু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অপেক্ষা পূর্ণতর সিদ্ধি। কেন না ঐ উপলব্ধি হলে আমাদের সত্তার ভিতরেও গভীরতর অংশে আলোকপাত হয় বটে কিন্তু তার বাইরের অংশগুলি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। আধ্যাত্মিক রূপান্তর বলতে আত্মার উচ্চতর শক্তির দ্বারা সমগ্র সত্তার ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন বোঝায় না। তা হল বাস্তবিক উদ্দিষ্ট রূপান্তরের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা। যে শক্তির দ্বারা সে রূপান্তর সাধিত হ'তে পারে তা হল উপনিষদের ভাষায় বিজ্ঞান, শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায় অতিমানস। এই পরমা চিৎশক্তিই নিজের বিভাবের সম্ভূতির প্রেরণায় স্তরপরম্পরায় জড়ে অবরোহণ ও পরে অন্ন, প্রাণ, মন ও চৈত্যসত্তার মধ্য দিয়ে আরোহণক্রমে নিজেকে উত্তরণের পথে নিয়ে চলেছেন। অতিমানস যেমন পরমাণুর অন্তরতম ধাতু ও শক্তি, তেমনি তা হল প্রাণে প্রবেগ, হৃদয়ে প্রেম ও মনে চিন্তা। মানুষী চেতনার ভগবানের দিকে সম্পূর্ণ এষণা তার স্বভাবের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ও চরম পরাবর্তনের জন্য ও আমাদের সাধারণ প্রকৃতির প্রক্রিয়ার সচেতনতা ও যান্ত্রিক নিয়মন থেকে নিরবশেষ মুক্তি লাভ করতে হলে ঋতচিৎ অতিমানসের সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বিরাট আদর্শ উপলব্ধি করতে হলে চাই পূর্ণ জ্ঞান যার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রক্রিয়া তার শক্তিনিচয় ও রূপান্তরের জন্যে তা কতটা প্রস্তুত তা অভেদ বোধের দ্বারা জানা যায়। আরও চাই সেই শক্তি যা মন, প্রাণ ও জড়ের দ্বারা খর্ব নয়, তার নিজের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারলে ফল হয় অমোঘ। এই পূর্ণ অভেদজ্ঞান ও অপরাজেয় শক্তিই হল বিজ্ঞান বা অতিমানস।

এখন আমাদের জানতে হবে শ্রীঅরবিন্দের যোগে মুক্তির স্থান কি, রূপান্তরের জন্য তার প্রয়োজন কতখানি? এই যোগে মুক্তির চিরাচরিত অর্থ থেকে অন্যতর বা ব্যাপকতর ব্যঞ্জনা আছে কি না? চার্বাক সম্প্রদায় দেহাতিরিক্ত কোন তত্ত্বই স্বীকার করেনা। তাদের পক্ষে দৈহিক মৃত্যুই মুক্তি। অন্য সব ভারতীয়দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে মুক্তির স্বরূপ হল আত্মা শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি ও অহংকার এই ভ্রান্ত জ্ঞানের নিরসন। আত্মা অজ্ঞানবশে নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে শরীর ইত্যাদি অনাত্ম

ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে। কিন্তু এইটুকু মতের মিল ছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুক্তির কল্পনায় অনেক প্রভেদ আছে। ন্যায়বৈশেষিকরা আত্মা যে চিৎস্বরূপ তাও মানেন না। আমরা এখানে তাঁদের মত আলোচনা না করে যাঁরা আত্মাকে চিৎ বলে মানেন তাঁদের কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

বিভিন্ন দার্শনিকরা তাঁদের পরমতত্ত্বের ও ব্যষ্টি আত্মার পৃথক পৃথক মত অনুযায়ী মুক্তির নানা রকম ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য ও যোগ উভয় দর্শনেই অচিৎপ্রকৃতি থেকে চিৎএর বা পুরুষের বিচ্ছেদই মুক্তি। বহু পুরুষ স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্বন্ধবিহীন, পরন তত্ত্ব-ও কিছু নাই যার সঙ্গে মুক্ত পুরুষদের কোনোরকম সম্বন্ধ হতে পারে। যোগদর্শন ঈশ্বর মানেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলনের কোন প্রশ্ন নাই। শঙ্কর ও রামানুজের ব্রহ্ম সম্বন্ধে মতের বিশেষ পার্থক্য আছে ও সেইজন্যে তাঁদের ব্যষ্টিআত্মার ধারণাতেও প্রভেদ বর্তমান। অতএব মুক্তি সম্বন্ধে তাঁদের মত এক হতে পারে না। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিঃশক্তি. ও নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ওনির্বিশেষ। ব্যষ্টি আত্মা ব্রহ্মই, কিন্তু মায়াবশে ব্যষ্টি বলে প্রতিভাত, তার ব্যষ্টিত্ব সত্য নয়। মুক্তি তাঁর মতে সেই অসত্য ব্যষ্টি আত্মার চেতনা থেকে অজ্ঞানের আবরণ বা ব্রহ্মের সঙ্গে তার ভেদ-বুদ্ধির অপসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অজ্ঞানের আবরণ সরে গেলেই ব্যষ্টির ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ অনুভূতি হয় ও জগৎ যে ব্রহ্মের ওপর মরুভূমির ওপরে মরীচিকার মত অধ্যস্ত, অতএব মিথ্যা, এই বোধও হয়। রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অশেষ কল্যাণগুণের আকর, সশক্তিক ও সবিশেষ। চিৎ অর্থাৎ ব্যষ্টি আত্মা, অচিৎ অর্থাৎ মায়া ও ঈশ্বর এই তিনটিই নিত্যতত্ত্ব। ঈশ্বর চিদচিদ্‌বিশিষ্ট। ব্যষ্টি আত্মা ও মায়া তাঁর অঙ্গীভূত। ব্যষ্টি আত্মা ব্রহ্মের ন্যায় চিৎ স্বরূপ ও নিত্য হলেও অপৃথকসিদ্ধ, অর্থাৎ তা ব্রহ্মের ওপর নির্ভর করেই থাকে, তা ঈশ্বরের ধার্য, নিয়ান্য ও তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্যেই তাঁর অস্তিত্ব। জগৎ-ও অসত্য নয় এই দর্শনে। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে তাই মুক্তি অর্থ শরীরাদি মায়া সৃষ্ট তত্ত্বের থেকে আত্মা যে আলাদা তা জানা, ও তা যে ঈশ্বরের ধার্য ইত্যাদি তাও জানা। উপরন্তু আত্মা যে ঈশ্বরের কিঙ্কর বা সেবক সে জ্ঞানও মুক্তিতে আত্মজ্ঞানের মধ্যেই থাকে। মধ্ব চেতন বা জীবের তিনরকম শ্রেণী আছে বলেছেন। আমাদের বিশদ করে এই বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। মুক্তিতে "মুক্তিযোগ্য" চেতন বা জীব স্বতন্ত্র ব্রহ্মে বা বিষ্ণুতে বাস করে ও অমরত্ব লাভ করে, বিষ্ণুর আনন্দময়ত্ব ভোগ করে ও আনন্দময়ও হয়ে যায়। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে চেতনের ভেদ থেকেই যায়, কারণ তা নিত্য। নিম্বার্কের দর্শনেও ব্রহ্ম ও জীব বিভিন্ন তত্ত্ব ও মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে, তাঁর স্বভাব ও অনেক গুণাবলীও প্রাপ্ত হয়।

বলাই বেশী, যে মুক্ত অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপ ভাবও লাভ করে। বল্লভ ব্রহ্মের তিন অবস্থার কথা বলেছেন—পুরুষোত্তম বা পর, অক্ষর ও অন্তর্যামী। পুরুষোত্তমই উচ্চতম অবস্থা। জীব অক্ষর ব্রহ্মের থেকে স্ফুলিঙ্গের মত প্রকট হয়। মুক্তিতে জীব অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্য বা অভেদ লাভ করতে পারে। কিন্তু মোক্ষের একটি উচ্চতর অবস্থাও আছে। ভাস্কর বলেন যে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ ঔপাধিক মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্বের উপলব্ধি হয়। তবে ভাস্করের এই মতও পাওয়া যায় যে জীব ব্রহ্মের নিয়াম্য। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সাধনা করলে পূর্ণ পুরুষোত্তমের সঙ্গে জীবের একত্ব লাভ হয়। বলদেবের দার্শনিক মতবাদে জীব নিত্য ও মুক্তিতেও তার ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে। সালোক্য, সামীপ্য, সাদৃশ্য ও সার্ষ্টি, এমন কি সাযুজ্য মুক্তিও জীব লাভ করতে পারে। কিন্তু জীবের চাওয়া উচিত নিত্য প্রেম, শ্রীভগবানকে অহেতুক ভালবাসাই তার আধ্যাত্মিক জীবনের পরাকাষ্ঠা। উপনিষদে এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের একটি চমৎকার সমন্বয় পাওয়াযায়। পরমতত্ত্ব সেখানে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক, নিঃশক্তিক ও সশক্তিক, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক নিগুণোগুণী। ব্যষ্টি আত্মা স্বরূপতঃ পরাৎপর ব্রহ্ম হলেও, তাঁরই একটি ব্যক্তিরূপ। মুক্তিতে তাই ব্যষ্টি আত্মার নানা অবস্থা লাভ করতে পারে। ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভেদত্ব, ঈশ্বরের সঙ্গে একীভাব ও দুইয়ের যুগপৎ উপলব্ধি-ও সম্ভব। তান্ত্রিক দর্শনগুলিতে আমরা দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত দৃষ্টিকোণ পাই। এগুলির মধ্যে আমরা দুইটির উল্লেখ করব। দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তে জীব ও শিব ভিন্ন তত্ত্ব। মুক্তিতে জীব অধ্যাত্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, চিৎ-স্বরূপকে, শিবকে আপন সত্তায় প্রতিফলন করতে সমর্থ হয় ও আত্মসমর্পণের ফলে শিবের সঙ্গে মিলিত হয়। কাশ্মীরী শৈব দর্শনে বা ঈশ্বরাদ্বয়বাদে সিদ্ধান্ত এই যে পরম শিবই আপন চিৎ-শক্তির একটি বিশেষ কৃত্যের দ্বারা—নিগ্রহের দ্বারা—জীব হন ও অণুত্ব প্রাপ্ত হন। মুক্তিতে জীবের অণুত্ব কেটে যায়, সে চিৎস্বরূপ তা জানতে পারে ও অচিৎ মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু এই রূপে মোক্ষ লাভ ছাড়াও জীবের শিবত্ব-যোজন হতে পারে চিৎশক্তির বিকাশের ফলে। জীব পরমশিবত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। তখন চিৎশক্তির বা বিমর্শের পূর্ণ প্রকাশের ফলে শিবত্বপ্রাপ্ত জীব বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গেই নিজের তাদাত্ম্য অনুভব করে। এখানে মুক্তির সঙ্গে ভুক্তিও থাকে, স্বকীয় চিৎশক্তির বিকাশ ও মহিমার ভোগও এই দর্শনের লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন অনুধাবনযোগ্য। যেমন মুক্ত আত্মা কি জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়, আনন্দ উপভোগ করে? মুক্ত অবস্থাতে আত্মা যদি জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয় তাহলে দেহেরও প্রয়োজন থাকবে? মুক্ত আত্মা কি এই অশুদ্ধ পঞ্চভূতের দেহত্যাগের পর শুদ্ধ বস্তুর দ্বারা গঠিত অন্য কোন শরীর লাভ করে? জীবিত অবস্থায় মোক্ষ লাভ সম্ভব কি? এই প্রশ্নগুলির বিভিন্ন সমাধান আছে। শঙ্কর ও তাঁর অনুবর্তীরা মুক্ত আত্মা

জ্ঞান বা শক্তি বা আনন্দ লাভ করে বা কোন অতিপ্রাকৃত দেহের অধিকারী হয়, তা স্বীকার করেন না। তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীরা জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কাশ্মীরীয় শৈব দর্শনে ছাড়া অন্য দর্শনে তা স্বীকৃত নয়। বৈষ্ণব বেদান্তীরা প্রায় সকলেই বলেন যে মুক্ত আত্মা জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও পরম সুখ উপভোগ করে যদিও তার সৃষ্টির শক্তি হয় না।

মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত কি? উল্লিখিত মতগুলির কোনটার সঙ্গেই তা সম্পূর্ণ মেলে না। ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি আত্মার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত অন্য সব দার্শনিকদের মতের থেকে ভিন্ন এবং অনেক ব্যাপক। তিনি ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি আত্মার পূর্ণ অভেদ ও তাদাত্ম্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু মায়াবাদীর মত ব্যষ্টি আত্মার অসত্যতা স্বীকার করেন না। আবার রামানুজ ইত্যাদির মত ব্যষ্টি আত্মা ব্রহ্মের থেকে স্বরূপতঃই ভিন্ন সে মতও গ্রহণ করেন না। ব্যষ্টি আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্মই নিজেকে বহু আত্মা হিসাবে প্রকট করেন। ব্যষ্টি আত্মা পরমাত্মার স্বয়ং প্রকটিত ব্যষ্টি রূপ। ভগবান যুগপৎ এক ও বহু। ব্যষ্টি আত্মা ভগবানের 'বহু' দিকের একটি অংশ। আর চৈত্যসত্তা হল তারই একটি স্ফুলিঙ্গ যা ব্যষ্টি আত্মা এই পার্থিব প্রকৃতির ক্ষেত্রে পাঠিয়েছে ক্রম বিকাশের জন্যে। ব্যষ্টি আত্মা যে ব্রহ্ম এক হয়েও বহু তার সঙ্গে অভেদ উপলব্ধি করতে পারে। সে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এ একেবারে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিতে পারে—এই হল অদ্বৈতের লয়। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে আবার যে বহু বস্তুতঃ এক, তার অংশ হিসাবে ভগবানকে আস্বাদনও করতে পারে, তা হল দ্বৈতাদ্বৈতের মুক্তি। অথবা আত্মা 'বহু'র ওপরে জোর দিতে পারে ও ভগবানের দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকতে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত মুক্তি এইরকম। অথবা চিৎকণ জীব নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করতে পারে যা হল দ্বৈত মুক্তির আদর্শ। আবার মুক্ত হয়েও ব্যষ্টি আত্মা লীলায় বা এই বিশ্বে থাকতে পারে বা বর্তমান ইচ্ছা তাতে নেমে আসতে পারে। ভগবান মানুষের দর্শনের দ্বারা সীমিত নন, তিনি তাঁর লীলায় ও স্বরূপে মুক্ত ও স্বতন্ত্র।*

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, "যোগ মানে ভগবানের সঙ্গে মিলন। এ মিলন বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক বা ব্যক্তিগত অথবা, যেমন এই যোগে, একসঙ্গে তিনরকমেরই হতে পারে। কিম্বা যোগ হল এমন একটি চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা যেখানে সাধক অহং ও ব্যক্তিগত মন, প্রাণ ও দেহ দ্বারা বদ্ধ না থেকে পরমাত্মার সঙ্গে বা বিশ্বগত চেতনার বা নিজেরই সত্তার মধ্যে কোন গভীরতর চেতনার সঙ্গে মিলিত হয় ও নিজের চৈত্যপুরুষ অন্তরসত্তা ও বিশ্বের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে অবহিত হয়।"◆ এই অতিব্যাপক উপলব্ধি লাভ করা পূর্ণযোগের সাধকের

---

* শ্রীঅরবিন্দ—'যোগের পথে আলো' ১৯৪৮ ৩০-৩১ পৃষ্ঠা

◆ ঐ পৃঃ ১৬

পক্ষে শুধু সম্ভবই নয়, বিশেষ প্রয়োজনও বটে। কারণ এই তিন অবস্থাই অতিমানসের তিনটি বিভাব। দ্বিতীয়তঃ ব্যষ্টি আত্মা যদি নিজের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং ব্রহ্মে সম্পূর্ণ লীন না হয়ে যেতে চায়, তাহলেও পরমের শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী হবে। যে অর্থেই ধরা যাক না কেন, জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করা যায়। এও ঠিক যে, কোন কোন মুক্ত আত্মা বিশ্বের ভগবানের যন্ত্রও হতে পারে, কর্মযোগীরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করতে পারে।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে পূর্ণযোগের সাধক মূলতঃ নিজে আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য মুক্তি চান না। অজ্ঞান-আবৃত অন্যান্য জীবদের মুক্ত হতে সাহায্য করার জন্যেই তিনি মুক্তি-সাধক। মুক্ত না হলে অন্যকে মুক্তিলাভে সাহায্য করা সম্ভব নয়। বদ্ধ থাকলে জগতে ভগবানের কাজে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না পূর্ণযোগী। অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে থাকা মানে নিজের মধ্যে, অন্যের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে ভগবানকে অস্বীকার করা, তাঁকে চিনতে না পারা, বিভেদাত্মক অহঙ্কারে বদ্ধ হয়ে থাকা।

কিন্তু মুক্তির মূল্য যতই হোক না কেন, তা পূর্ণযোগের প্রধান লক্ষ্য নয় বা হল বহিঃ-প্রকৃতির রূপান্তর। যে-প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে হবে সেই প্রকৃতি থেকেই মুক্ত হওয়া প্রথম প্রয়োজন সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। এ কথা স্বতোবিরোধী বলে মনে হতে পারে আপাতঃ দৃষ্টিতে। কিন্তু যে কোন সাধনা, যার সাধ্য মুক্তি, তাতে নিম্ন প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার থেকে অন্তরাত্মা একেবারে ভিন্ন এই জ্ঞান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন যোগগুলিতে আন্তরচেতনাতেই এই জ্ঞান লাভ করা যথেষ্ট ছিল। শুদ্ধ বা আন্তর চেতনাকে বিচলিত বা বিপর্যস্ত না করতে পারে তার যতখানি শান্ত হওয়া দরকার বাইরের প্রকৃতি ততটুকুই সংযত হত, তার ক্রিয়াকলাপ ততটুকুই প্রভাবিত হত। কিভাবে পরাপ্রকৃতি অপরাপ্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কেন ও কি ভাবে প্রথমে নিম্ন প্রকৃতির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' তারপর তার গতিবিধি সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় তা আবিষ্কার করা পূর্ণযোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। পূর্ণযোগের সাধককে শরীর ও শারীর প্রাণ থেকে, তাদের জড়তা ও যান্ত্রিক অভ্যাস থেকে, নিত্য নূতন ও বিরামহীন বাসনা থেকে ও চিরচঞ্চল প্রবৃত্তি থেকে, মনের অজ্ঞতা, সংস্কার, একদেশদর্শিতা ও জটিলতা থেকে, তার সত্যকে স্বীকার করার অক্ষমতা থেকে, হৃদয়ের গ্রন্থি, উচ্ছ্বাসপ্রধান অশান্ততা, অশুদ্ধি ও ভাবপ্রবণ পছন্দ-অপছন্দ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। এগুলির কোনটির প্রতিই যদি পূর্ণযোগীর কণামাত্র আকর্ষণ থাকে, তাহলে তার পক্ষে অতিমানস জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও প্রেম লাভ করা সম্ভব হবে না, তাতে অবাধ অধিকার হওয়া ও বিজ্ঞান ভূমিতে বাস করার তো কথাই নেই। আর সে সিদ্ধি লাভ না করলে, বিজ্ঞানের বা অতিমানসের নিম্ন প্রকৃতির অবতরণে ও জড়, প্রাণ ও মনে অবলুপ্ত বিজ্ঞানের জাগরণ ও উত্তরণে

পূর্ণযোগী কোনই সাহায্য করতে পারবে না যা না হলে রূপান্তর কল্পনা মাত্র। সুতরাং তার চৈত্যপুরুষ ও আত্মাই মুক্ত হলেই হবে না, তার মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহকে সমস্ত ভগবদ্বিরোধী গতিবিধি থেকে মুক্ত হতে হবে। সর্বদা তাকে সতর্ক থেকে নিম্ন প্রকৃতির আবেগের সব রকম প্রকাশকে ত্যাগ করতে হবে। যখন এগুলি সম্পূর্ণ বর্জিত হবে, সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতি যখন নির্মল হবে, তখনিই অপরাপ্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে অতিমানস-মায়ার জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের ছন্দ বাজবে। বলা যায় যে প্রাচীন যোগগুলির যেমন, পূর্ণযোগেরও মুক্তিই লক্ষ্য। কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয় মোক্ষ শুধু অবিদ্যা-মায়া থেকে আত্মার মুক্তিই নয়, তা মায়ারও মুক্তি, অবিদ্যা-মায়ার বিদ্যা-মায়ার রূপান্তর নিশ্চেতনার পর্দা থেকে, আধ-আলো আধ-ছায়া জ্ঞান-অজ্ঞান থেকে পূর্ণচিন্ময়ী ও দিব্যপ্রকৃতির স্বর্ণময় দিবসে তার নবজন্ম।

পূর্ণযোগের সাধককে এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে অপরাপ্রকৃতির বর্তমান গঠন ও বিন্যাস অপরিবর্তনীয় নয়। বস্তুতঃ সাধককে এই ভ্রান্ত ধারণার থেকে মুক্ত হয়ে নিম্নপ্রকৃতির মধ্যে যে বিবর্তনশীল আত্মা রয়েছে তাকে বিজ্ঞানময় উচ্চতর চেতনায় উন্নীত করতে হবে ও তার স্বকীয় প্রকৃতিকে নামিয়ে আনতে হবে সাধারণ সত্তার মধ্যে। সেই গূঢ়তম বিজ্ঞানময় আত্মাই হবে তার সম্রাট ও আপন অখণ্ড জ্ঞান, অমোঘ ইচ্ছাশক্তি ও সর্বজয়ী প্রেম দিয়ে তার আধিপত্য বিস্তার করবে প্রকৃতির ক্ষেত্রে। কিন্তু এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করতে হলে নিম্ন প্রকৃতির প্রভুত্ব থেকে তার সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে, স্বাধীন হতে হবে নিয়তি থেকে যাতে সে সেই প্রকৃতির রূপান্তর করতে পারে, সেই নিয়তির স্থলে নামিয়ে আনতে পারে ও কার্যকরী করতে পারে স্বতন্ত্র পরাপ্রকৃতির জ্ঞানেচ্ছাশক্তিকে। শুধু প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাকে অপরিবর্তিত রেখে দিলে তার সাধনার সিদ্ধি হবে না, তাকে রূপান্তরিত করাই তার বৃহৎ সাফল্য। কিন্তু আগে যেমন বলেছি, সত্তার সবগুলি স্তরে ও সমস্ত অংশে পরাপ্রকৃতির বিজ্ঞানময় প্রক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে না পারলে এই রূপান্তরের কথা কল্পনাও করা যায় না। অপরাপ্রকৃতির পোষ্য মানুষকে পরাপ্রকৃতির শিশু হয়ে জন্ম নিতে হবে, তার শক্তির দ্বারা পুষ্ট হতে হবে। তবেই মানুষ দুই প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করতে পারবে সেই ভগবতী জননীকে যিনি অদিব্য প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করেছেন তার মধ্যে গূঢ় দিব্য প্রকৃতিকে প্রকট করে, তার জ্ঞান শক্তি ও প্রেমকে জগতে রূপায়িত করে।

অনুবাদ—নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

(পুনরাবৃত্তি)

ম্যানচেষ্টার—৩ অক্টোবর, ১৯৫৫

প্রথম সন্দর্শন—উইলিয়ম ড্রুয়েটের যে গৃহে শ্রীঅরবিন্দ বাল্যাবস্থায় ছিলেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত।

সেন্ট পলের রেজিষ্টারে রেভারেণ্ড ড্রুয়েটের নাম পেলাম। এইমাত্র জানা গেল যে তিনি কংগ্রিগেশন সম্প্রদায়ের পাদরি ছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের রেফারেন্স লাইব্রেরিতে গিয়ে কংগ্রিগেশনের চার্চের পুরণো নথিপত্র ঘেঁটে এক জায়গাতে পেলাম যে তিনি স্টকফোর্ড রোড চার্চের পাদরি ছিলেন। ঠিকানা ৮৪ নং শেক্‌স্‌পিয়র ষ্ট্রীট।

প্রশ্ন হলো, কত কাল তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে ছিলেন? জানা গেলনা।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন" পত্রিকার পুরনো ফাইল খুঁজে দেখলাম যে ১৮৮১ মার্চে তিনি কাজে ইস্তাফা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ১৮৮২তে সেখানে ছিলেন না।

ইংলণ্ড ত্যাগ ক'রে অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে তিনি পাদরির কাজ করেছেন কিনা—শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেছিলাম তাঁর অষ্ট্রেলিয়া যাবার কথা—সে কথা জানবার জন্য ১৮৮২ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়ার চার্চের সমস্ত রিপোর্ট অনুসন্ধান করলাম; তাঁর নাম কোথাও পেলাম না।

মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়ে খোঁজ করলাম ১৮৮০ সালের পর শেক্‌সপিয়র ষ্ট্রীটের কোনো অদলবদল হয়েছে কিনা, সঠিক জবাব পেলাম না। তখন সন্ধ্যার সময় নিজেই গিয়ে দেখলাম রয়েল ইনফার্মারি বরাবর বেরিয়েছে নেল্‌সন ষ্ট্রীট, সেটাই পরে হয়েছে শেক্‌স্‌পিয়র ষ্ট্রীট। ৮৪ নং বাড়িটি দেখলাম ভাঙাচোরা অবস্থায়, জমিটাও ভাঙা। দরজায় বহুক্ষণ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়েও কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। আশপাশের সকল বাড়িতেই সুস্পষ্ট দারিদ্র্যের ছাপ। কাছেই ৭৯ নং-এর বাড়ি, সেটি একটি মেডিক্যাল ষ্টোর, একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিল। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে ৩৬ বছর আগে সে ঐ বাড়িটি কিনেছে, এর মধ্যে ঐ রাস্তার কোনো অদল বদল হয়নি। সে বললে যে প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের আগে এখানে বর্ধিষ্ণু লোকেরা

বাস করত। কিন্তু এখন শ্রমিকেরা এসে রয়েছে। ৮০ এবং ৭৮ নং-এর বাড়ি নেই কেন জিজ্ঞাসা করাতে বলেন, ও-দু'টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, খালি জায়গা পড়ে আছে।

*

ম্যাঞ্চেষ্টারের বি, বি, সি-তে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে ধর্ম প্রসঙ্গেও সম্প্রচার করা হয়, টেলিভিসনেও পাদরিদের বলতে নিয়মিত ডাকা হয়। ইংলণ্ডেও ধর্ম কথা প্রচারের জন্য রেডিওতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। বি, বি, সি-তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্যও ব্যবস্থা আছে। ভারতে এ ব্যবস্থা অনুসরণ করা কেন হয়না জানিনা।

৮৪ নং-এর বাড়িটির আমি একটি ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিন জন ফটোগ্রাফারের মধ্যে কেউই তা পারলেনা, বাইরের ছবি নেবার কোনো ব্যবস্থাই তাদের নেই। বোল্টনে গিয়ে ভারতীয় কোনো ছাত্রের সাহায্য পেতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতেও বিফল হলাম।

৫ অক্টোবর, ১৯৫৫

ম্যাঞ্চেষ্টারের ডক্‌গুলি দেখলাম, প্রকৃতির উপর মানুষের কৃতিত্বের নিদর্শন। সমুদ্র থেকে ৩৫ মাইল দূরে এই সব ডক্‌ নির্মিত। খালের মত একটি নদীকে এমন গভীর ক'রে চওড়া ক'রে কাটা হয়েছে যাতে জাহাজগুলি তার ভিতর দিয়ে ডকে আসতে পারে, সে-ডক্‌ চারিদিকে উচচ জমি দিয়ে ঘেরা। ইংলণ্ডের সকল বড়ো বড়ো শহরেই জার্মান বোমা বিধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান, ম্যাঞ্চেষ্টারের ডক্‌গুলিও যথেষ্ট বিধ্বস্ত।

৯ নভেম্বর, ১৯৫৫

প্রথম বারে ৩ নভেম্বর তারিখে গিয়ে ৮৪ নং শেক্‌স্‌পিয়র ষ্ট্রীট-বাড়িটির ফটো নিতে পারিনি বলে তার জন্য আবার ম্যাঞ্চেষ্টারে যেতে হলো। ভাগ্যক্রমে এবার উইলি লভগ্রোভ তার গাড়িতে আমাকে হ্যাম্পটন-ইন এডেন-থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারে নিয়ে গেল। ম্যাঞ্চেষ্টারের বি, বি, সি, কন্ট্রোলার মিষ্টার কেভ-ব্রাউন-কেভের সঙ্গে এই ব্যবস্থা ছিল যে পিকাডিলিতে তাঁর অফিসে কয়েকজন নিবন্ধিত ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। এসেক্স হোটেলে থেকে আমি সহকারী ডিরেক্টর মিষ্টার মিলারকে বলেছিলাম কোনো সংবাদপত্রের অফিসে ফোটোগ্রাফারের খোঁজ করতে। শুনলাম একজন হোটেলে আসবে ৩।।টার সময়।

এসেক্স হোটেল থেকে শেক্‌স্‌পিয়র ষ্ট্রীট সৌভাগ্যক্রমে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু মেঘ করেছিল, বৃষ্টি পড়ছিল। ফটোগ্রাফার সঙ্গে ফ্ল্যাশ্‌ লাইট এনেছিল, তিনখানি ছবি তোলাই উঠেছিল। ঐ সময়ে সৈনিকের মতো একটি লোক ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ঐ বাড়ির বর্তমান মালিকের নাম লিখে নিলাম। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে শুনলাম যে এটর্নির অফিস থেকে বাড়ির ভাড়া আদায় করা হয় আর বাড়ির মালিক সেটি বেচতে চায়। রেজারেণ্ড ড্রুয়েটের অথবা ঐ মালিকের আর কোনো সন্ধান আমি পেলাম না।

শ্রীঅরবিন্দের সময়ের একজন মাত্র ব্যক্তি জীবিত আছেন ডক্টর সিরিল বেইলি, যিনি নওন সেন্ট পল্‌স্‌ স্কুলে ঐ সময়ে পড়তেন। আমি ৮ই অক্টোবর তারিখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম ওয়ান্টেজে, বার্কশায়ারে। ইনি ছিলেন অক্সফোর্ড দর্শনের অধ্যাপক ১৮৯৮-১৯২৬ পর্যন্ত। আবার গত যুদ্ধের সময় তিনি অক্সফোর্ডে বেলিয়ল কলেজে ছিলেন। গত ৫০ বছর যাবৎ ইনি সেন্ট পল্‌স্‌ স্কুলের গভর্ণর। নির্দেশিত সময় অনুযায়ী বেলা ৩।।টায় আমি তাঁর "মাল্‌বেরিজ্‌" নামক বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম।

বাড়িটি ছোট, সাদাসিধা ও নিস্তব্ধ। দরজার শব্দ করতে একজন এসে দোর খুলে দিলে। বাইরের ঘরে ওভারকোট রেখে ফিরে দেখলাম ৮৪ বছরের একজন খর্ব ও শীর্ণকায় ও চোখে বিজ্ঞদৃষ্টি-সম্পন্ন বৃদ্ধ আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। আমি ভারতীয় কায়দায় তাঁকে নমস্কার জানালাম।

তিনি বললেন "এই বয়সে আমি বাইরে কোথাও যাইনা এবং বেশি কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করিনা। সেন্ট পল্‌স্‌ স্কুলের জন্য আমি অনেক বছর কাজ করছি। এবার ছেড়ে দিতে চাই। বোধ হয় এই বছর ছাড়া পাবো।"

আমি শ্রীঅরবিন্দের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর বাল্যকালের দুটি ছবি দেখালাম। তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটি ছবি দেখে বললেন, "হাঁ, এটি আমি চিনতে পারছি, কিন্তু অপর ছবিটাতে তাঁকে চেনা যাচ্ছে না।"

আমি তাঁর মনকে ৭০ বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম যখন তিনি সেন্ট পল্‌স্‌এর ছাত্র ছিলেন। তিনি তখনকার হাই-মাষ্টার ডক্টর ওয়াকারের বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণনা শুনে মনে পড়ল চেষ্টারটনের উক্তি: "হ্যাভানা তামাকের সুগন্ধের আবহাওয়ার মধ্যে একজন ব্যক্তি যাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অনস্বীকার্য প্রভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অল্প কয়েকটি ক্লাসই তিনি নিতেন। সব চেয়ে ছোটো ছাত্রদের নিয়ে তাদের শেখাতেন যে বিষয়গুলিতে তারা কাঁচা।" শ্রীঅরবিন্দ আমাদের যা বলেছিলেন তার সঙ্গে এ বর্ণনা মিলে গেল। ডক্টর বেইলি বললেন: "এক সময় ডক্টর ওয়াকার

আমাদের গ্রীক শিক্ষার ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি ক্লাসের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কখনো বা কোনো ছাত্রের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন আমি পিছন থেকে শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, 'কবির সোনা চুরি কোরোনা।' আমি হকচকিয়ে উঠলাম, কই আমি তো কিছু চুরি করিনি! আবার দ্বিতীয়বার তিনি সেই এক কথাই বললেন। তখন বুঝলাম যে তিনি ঐ কথাটি গ্রীক ভাষাতে তর্জমা করতে বলছেন।"

অতঃপর প্রসঙ্গান্তরের কথা হলো, মানব বুদ্ধির সংকীর্ণতা নিয়ে। ডক্টর বেইলি বললেন, "বুদ্ধি পশুদেরও আছে যা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে কাজ করে; কিন্তু সেও একরকম জ্ঞান—যদিও তার মধ্যে কোনো যুক্তিতর্ক থাকে না।"

শ্রীঅরবিন্দের কথায় আমি তাঁর আলিপুর জেলের অভিজ্ঞতার কথা, তাঁর রাজনৈতিক ভারত সংগ্রামের কথা, তাঁর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অপূর্ব সংশ্লেষণের কথা বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন অক্সফোর্ডের বিগত দার্শনিক আলোচনার সম্বন্ধে। আমি বললাম যে উপস্থিত দার্শনিকেরা কেবল "বিশ্লেষণ" ও "পুনর্গঠন" সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। শুনে তিনি খুশি হলেন না।

অতঃপর তিনি বললেন যে সেন্ট পল্‌স্-এ তিনি শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা মনোমোহন ঘোষকেই বেশি চিনতেন। "ছেলেদের ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত বয়সটা এমন যখন তারা পরস্পরের সম্বন্ধে তেমন কিছু খোঁজই রাখেনা, সে বিষয়ে মোটে গ্রাহ্যই করে না।" কথাটা ঠিকই শ্রীঅরবিন্দ সেখানে ছাত্রাবস্থায় সমস্ত প্রাইজগুলি পেয়েছিলেন, কেম্‌ব্রিজে কিংস কলেজে পড়বার জন্য ওখান থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন, অথচ সিরিল বেইলি সমসাময়িক ছাত্র হয়েও তা কিছুই জানেনা। তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর একতলা কোঠা দেখালেন, সামনে চমৎকার একটি লন ও কয়েকটি আপেল গাছ। জল গরম করা হয় একটি হৌজের নীচে আগুন দিয়ে, সেই জলে দিনের বেলা হাত ধোওয়া, বাসন ধোওয়া প্রভৃতি হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক আছে কিন্তু জলের পাইপ নেই, ড্রেনের ব্যবস্থা নেই। কাচের দরজা দিয়ে ঘেরা একটি নার্সারি উদ্যান আছে। শ্রীমতী বেইলি বিকেল ৫টায় এসে চা খাওয়ালেন, চমৎকার সুস্বাদু ঘরে-তৈরি কেক খাওয়ালেন। তিনি গিয়েছিলেন স্থানীয় পল্লীসঙ্গীতে ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে। ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের এইরূপ সমষ্টিগত জীবনধারা সম্বন্ধে দুজনেই উৎসাহী।

ডক্টর বেইলি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে দিবাকরজীর "মহাযোগী" পড়তে ইচ্ছুক জেনে লণ্ডন থেকে আমি পাঠিয়েছিলাম। তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের সম্বন্ধে যে কঠিন মন্তব্য করা হয়েছে তা পড়ে তিনি খুশি হননি।

বইখানি পেয়ে তিনি আমাকে এই চিঠি লিখেছিলেন—

দি মালবেরিজ্, ঈষ্ট হ্যাম্পি, ওয়ান্‌টেজ্
বার্কশায়ার

প্রিয় মিষ্টার পুরাণী, ২৬-১০-১৯৫৫

আপনার চিঠিখানি ও একখণ্ড "মহাযোগী"র জন্য অনেক ধন্যবাদ। বইটি পেয়ে খুশি হয়েছি, রসের সঙ্গে পড়ছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কথাই পেলাম যা জানতাম না— তাছাড়া ঐ সময়ের ইতিহাস ও ব্রিটিশ-রাজত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় মতামত এই প্রথম জানলাম। ব্রিটিশদের ক্রিয়াকলাপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে, দুঃখের বিষয়, এইভাবে যা অর্থ করা হয়েছিল তা অন্যায় নয়। কিন্তু ভারতের প্রতি ও ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি অনেক সিভিলিয়ান ব্রিটিশদের যে সত্যকার স্নেহপ্রীতিও ছিল সে বিষয়ে লেখক সুবিচার করে কিছু লেখেননি। সকলেই যে "দোহন" নীতিতে চলত এ কথা ঠিক নয়। অরবিন্দ ছিলেন অতি উন্নতমনা ও উচ্চশিক্ষিত। এখন মনে হচ্ছে বাল্যকালে যদি তাঁকে আমি ভালো করে চিনতাম তাহ'লে ভালোই হতো। মনোমোহনের প্রতি আমার মধ্যে একটা প্রীতি রয়ে গেছে, তাঁর ভাই সম্বন্ধেও তাই হতে পারত যদি তাঁকেও এমনিভাবে চিনতাম।

মিসেস্ বেইলি আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানালানে। আমারও শুভেচ্ছা রইল।

বিনীত—
সিরিল বেইলি

আমি তার জবাবে লিখলাম—

প্রিয় মিষ্টার বেইলি, ৫ নভেম্বর, ১৯৫৫

আমাকে ডারহামে যেতে হয়েছিল, আজই ফিরেছি।

আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত যে ঐ ধরনের একচোখোমি একদেশদর্শীতা কেবল এই বইখানিতেই নয়, জাতীয়তাবাদী তরুণ ভারতীয়দের লেখা আরো অনেক বইতেই দেখা যাবে। সেটা স্বাভাবিক এই হিসাবে যে স্বাধীনতা অনেকেরই কাছে একটা নতুন অনুভূতি। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাজ্যাধিকারের মধ্যেও যে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে এটা বুঝতে সময় লাগবে। তবে আশা করি ভারতীয় সংস্কৃতি অতি প্রাচীন ও সুপক্ক হওয়ার দরুন অল্প সময়ের মধ্যেই এ অবস্থা পার হয়ে যাবে। আমরা এই প্রত্যাশা করি যে পরস্পরের সংস্কৃতি বিনিময়ের যুগ আসবে এবং তখন প্রকৃতই উচ্চমানব সংস্কৃতির পথ বাঁধা হবে।

পরস্পরের মানবীয় সান্নিধ্য যে ঘটেছিল সেটা তুচ্ছ করবার জিনিস নয়, রাজনৈতিক মতের পার্থক্য ও বিরোধ সত্ত্বেও সে সংস্পর্শ অতীতে বজায় ছিল, অতঃপর দুই জাতির দুই সংস্কৃতির মিলনে দুই পক্ষেরই সুবিধা হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ হলেন ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে, আরো বিশেষ ক'রে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে মিলন-সেতুস্বরূপ। তাঁর মনের প্রসার হলো বিশ্বজনীন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সর্বব্যাপক, তিনি পক্ষপাতশূন্য এবং সর্বোপরি মানবজাতির সকল সমস্যার বিষয়ে তাঁর নিরাসক্ত অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিপূর্ণ অভিব্যক্তির গুণে তিনি ভবিষ্যৎ মানবের অন্যতম স্রষ্টারূপে গণ্য।

এ কথা অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ কেবল আমার নিজের ধারণা ও মনোভাব থেকেই বলছি না, সকল দিক দেখেশুনে এই বিশ্বাস আমার হয়েছে। তাঁর দুখানি বই আমি পাঠাব "The Human Cycle" ও "The Ideal of Human Unity" যাতে সামাজিক পুনর্গঠন ও মানবজাতির রাজনৈতিক ঐক্যবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

মিসেস্ বেইলিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। বিনীত

এ, বি, পুরাণী

ডক্টর বেইলি লিখেছিলেন বিশ্বার কোহেনকে—

ডিসেম্বর ৯, ১৯৫৫

আমি নিশ্চয় যাব সোমবার ১৫ তারিখে শ্রী পুরাণীর ভাষণ শুনতে। দুঃখের বিষয় তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হবেনা, কিন্তু আমি আগে যেমন ভাবতাম তার চাইতে শ্রীঅরবিন্দ যে কতো বড়ো তা এখন বুঝতে পেরেছি। খুব আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর জীবনী পড়লাম। আমার মনে হয় যে ইংরেজদের মনের পক্ষে ঐ ধরনের অধ্যাত্মবাদ mysticism হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কথা নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় অনেক বেড়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। বিনীত

সিরিল বেইলি

ডক্টর বেইলি যে অধ্যাত্মবাদ (mysticism) বুঝতে পারার অক্ষমতার কথা বলেছেন তা নিজের সম্বন্ধে নয়, সাধারণ ইংরেজের মন সম্বন্ধে। সেটা কেবল ইংলণ্ডের নয় কিন্তু সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে। যোগ করবার প্রবৃত্তি স্বভাবতই ইংরেজের মনে জাগেনা। এখানকার যে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের দিক দিয়ে, তাতে ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

অ্যালেন কোহেন যে শেষ চিঠিখানি পেয়েছিলেন ডক্টর বেইলির কাছ থেকে, যখন তাঁকে জানানো হলো লণ্ডনে শ্রীঅরবিন্দ হাউজ-সার্কল স্থাপনের কথা, সেটিই এখানে উদ্ধৃত করছি—

আমাদের দেশে যে একদল লোক শ্রীঅরবিন্দের যোগ পন্থা নিতে চাইছে তা জেনে আমি আগ্রহান্বিত। কিন্তু আমার পক্ষে তা চলবে না ; প্রথমত, ৮৫ বছর বয়সে আমি অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, আর বিশেষ করে আমি একজন বিশ্বাসী ক্রিশ্চান, আমার যতটা যা হওয়া উচিত তার পক্ষে এইই যথেষ্ট। যোগের সম্বন্ধে আমার সহানুভূতি অবশ্যই আছে, কিন্তু তার বেশি নয়—আমার পক্ষে তা খুবই নিষ্টিক।

বিনীত
সিরিল বেইলি

এই চিঠিগুলি আমি ইচ্ছা করেই উদ্ধৃত করলাম দেখাবার জন্য যে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কেমন মনোভাব। তার কারণ স্পষ্টই বোঝা যায় :

ইউরোপে যে ভাবে ক্রিশ্চান ধর্মের অনুসরণ করা হয় তাতে কোনো বাস্তব রকমের আধ্যাত্মিক অনুভূতি মেলেনা—কেবল রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যে ছাড়া। যোগ বা কোনোরকম মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াস করবার কথা ইংরেজের মনে সাড়া জাগায় না, এটা বোঝাই যায়। তারা ভাবে ওর চেয়ে অতীতকাল থেকে মানুষ যে-সব সুবুদ্ধিমূলক বা নৈতিক আদর্শের নির্দেশ পেয়েছে সেই গুলিকেই জীবনের আদর্শ করে নিয়ে চলিনা কেন? আসল কথা, মানুষ তার সাধারণ প্রকৃতি অনুসারেই ধর্মপালন করবে ; আর ধর্মপালন মানে তার অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলিকে মেনে চলা, সেখানে পরমাত্মার আভ্যন্তরীণ অনুভূতির কোনো প্রশ্ন নেই। তাতে যদিও কতকটা বিশ্বাস, ভক্তি ও এমন কি আধ্যাত্মিকতাও (mysticism) আসতে পারে, কিন্তু তাতে মানবীয় দুর্বলতাই প্রশ্রয় পায়। ইউরোপে এমন ক্রিশ্চান খুব কমই আছে যারা ক্রিশ্চান ধর্মের নৈতিক আদর্শের চেয়ে উপরে যেতে পারা সম্ভব বলে মনে করে। অবশ্য যারা "বিশুদ্ধ ক্রিশ্চান" তারা অধিকাংশই সর্ব মানবের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে ; তারা পরহিতৈষিতা, পরসেবা ও দানশীলতার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে। কিন্তু ধর্মানুশীলনের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও চেতনার রূপান্তর ঘটতে পারে এটা তারা মানেনা।

খৃষ্ট যে বলেছিলেন, "আমি আর আমার পিতা অভিন্ন", অর্থাৎ মানব আত্মা ও মূল ভগবৎ সত্তা যে অভিন্ন, এ কথা ভারতীয় মনের পক্ষে বোঝা সহজ। কিন্তু যারা ক্রিশ্চান তারা এর অর্থ সংকীর্ণ করে ধরে নিয়েছে যে মানবরূপী খৃষ্ট হলেন সেই ভগবান। সৃষ্টিছাড়া স্রষ্টা ভগবান এ ধারণা সম্ভবত আগেকার ইহুদিদের কাছ থেকে

এসেছে। আর এই মহৎ শিক্ষা "নিজেকে যেমন ভালোবাস প্রতিবেশীকে তেমন ভালোবাসবে", এটা নিশ্চয় এসেছে আমার একত্ব সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পটভূমি থেকে। কিন্তু এ আদর্শ ক্রিশ্চানরা কবেই অনুসরণ করেছে। বহুকাল ধরে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি ও নীতি লঙ্ঘন ক'রে অক্রিশ্চান জাতিগুলির উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও শোষণ চালিয়ে এসেছে, এবং রাজশক্তি চার্চকে মেনেছে অথবা চার্চ রাজশক্তিকে মেনেছে। প্রধান কাজ ছিল ধর্মান্তরিত করা। রেনেসাঁসের (নব অভ্যুদয়) পরে ইউরোপে দেখা দিল যুক্তির ও বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করলে এই মহা সত্যকে যে বস্তু বা বস্তুশক্তি এক ও অভিন্ন। এখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক বা আধুনিক মন বস্তুর বা শক্তির অভাবনীয় সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রাণশক্তির বা মনের বা আত্মার অসীম শক্তিগর্ভতার কথা তারা মানতে চায়না। কারণ তার মধ্যে এসে পড়ে নিষ্টিসিজ্‌মের, কুসংস্কারের, দুর্বলমস্তিষ্কের, ঐতিহ্যবাদের গন্ধ।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়েও ক্রিশ্চান ধর্মের সব চেয়ে যা বড়ো কাজ তা কেবল ইচ্ছুকদের মধ্যে ধর্মান্তর আনা, জনগণের সেবা করা, শিক্ষার প্রসার করা ও অন্যান্য জন হিতৈষণার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আধুনিক জগতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও যুক্তিবুদ্ধির ক্রিয়াকে বাদ দিতে পারা খুবই কঠিন। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের যথেষ্ট নির্ভরতা ছিল ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তার জীবন্ত প্রভাব এসে পড়ায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাট ঘুচে গেল, আর ধর্মের উপর নির্জলা বুদ্ধির প্রভাবও রইলনা। যখন বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইউরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করলে তখন সংস্কৃতির ধারা হয়ে উঠল বস্তুতান্ত্রিক, বাহ্যবাদী ও সুবিধাবাদী। সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনার ফলে পাশ্চাত্য জাতিরা ধরে নিলে যে তাদের সংস্কৃতিই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ, আর তাদের সাফল্য দেখে অন্যান্য জাতিরাও তাই মেনে নিলে। ডক্টর বেইলির মতো "বিশুদ্ধ ক্রিশ্চান" ইউরোপে সেই সপ্তদশ শতাব্দীর সংস্কৃতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধরে রেখেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে শীঘ্র বা বিলম্বে একদিন ইউরোপের সংস্কৃতির এ মনোভাব বদলে যাবে।

বি, বি, সিতে ভাষণ দান

ইংলণ্ডে অন্যান্য কাজের মধ্যে আমাকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি জিনিস করতে হয়েছিল, বি বি, সি-তে লণ্ডনের তৃতীয় প্রোগ্রামের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে ভাষণ দান। ইংলণ্ডে রেডিওতে এই তৃতীয় প্রোগ্রাম থাকে জ্ঞানী শ্রোতাদের জন্য। বি, বি, সি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও তা গভর্ণমেন্টের নীতি অনুসরণ করে।

সেখানে ইংলণ্ডের কথাই সর্বপ্রথম স্থান পায়, তার পরে রাশিয়া আমেরিকা সুতরাং প্রভৃতি অন্যান্য দেশের কথা। এসিয়া ও আফ্রিকার কথা থাকে সাগরপারের সম্প্রচারে।

ইংলণ্ডে পৌঁছবার পর থেকেই আমি বি. বি. সি. ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করছিলাম। লণ্ডনে থাকতে আমি সাগরপার সম্প্রচারের ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাঁর কাছে যথেষ্ট সহানুভূতি পাই। তাঁর কাছে শুনলাম যে তৃতীয় প্রোগ্রামের অফিস স্বতন্ত্র, খুবই কাছে। ফোনে খবর নিয়ে জানলাম যে ওখানকার ডিরেক্টর এখন সুইজারল্যাণ্ডে, দুই তিন সপ্তাহ বাদে ফিরবেন। আমারও অনেক কাজ ছিল, লণ্ডন থেকে নিত্যই বাইরে যেতে হচ্ছিল। যখনই লণ্ডনে আসতাম তখনই চেষ্টা করতাম সাক্ষাতের জন্য। ওখানকার সেক্রেটারী ও তার সহকারী জানতে চাইলে যে আমার কি প্রয়োজন। কিন্তু আমি স্বয়ং ডিরেক্টর ছাড়া অন্য কাউকে তা বলতে চাইনা। সেখান থেকে প্রত্যাখ্যাত যদি হই তাও ভালো, নিম্নতরদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চেয়ে। অতএব সাক্ষাৎ পেতে অনেক বিলম্ব হলো। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ডে তাঁর সহায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অবশেষে ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দিন স্থির হলো ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৫। আমি শ্রীঅরবিন্দের সাত আটখানি বই ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম, সেদিন কন্‌কনে শীতের সকালে তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর পূর্বোক্ত সহায়ক ভদ্রলোকটি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই আমি এই বলে কথা শুরু করলাম যে স্বাধীনতা পাবার পরে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির ও সহযোগিতা আদান-প্রদানের সূচনা হওয়া দরকার। আমি আরো বললাম যে তাতে ইংলণ্ডই লাভবান হবে। তার পরে আমি ইংলণ্ডে ও ভারতে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কথা বললাম, তাঁর বিরাট সংশ্লেষণের কথা, তাঁর দুটি মহাকাব্য ('Savitri' এবং 'Ilion') রচনার কথা বললাম এবং প্রস্তাব করলাম যে তাঁদের তৃতীয় প্রোগ্রামে যেন শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু সম্প্রচার করা হয়।

ডিরেক্টর সব কথাই শুনলেন; আমি তখন তাঁকে বইগুলি দেখালাম, যেগুলি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুখানা বই টেবিলে রাখার পরে দেখলাম যে তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। তখন আমি অন্যগুলি না দেখিয়ে চেয়ারে বসলাম।

তখন তিনি আমাকে "দিব্যজীবন" (Life Divine) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। এই সুযোগ পেয়ে আমি ঝাড়া ১৫ মিনিট ধরে একবারও না থেমে ঐটুকু সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে তাঁর ১১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ দিব্যজীবন তত্ত্বটি বিবৃত করলাম। বোধ হলো

কথাগুলো তাঁর মনে লাগল, সেটা আমার ঐভাবে বলবার ভঙ্গীতে অথবা ভাষাতে তা বলতে পারিনা। তিনি আমাকে তখন শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। "সাবিত্রীর" উল্লেখ ক'রে আমি বললাম, "সংস্কৃতির তরফ থেকে এটা খুব দুঃখের কথা যে আমি একজন ভারতীয় হয়ে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে আপনাকে আপনাদেরই ভাষাতে লেখা এক মহাপুরুষের মহাকাব্যের কথা জানাচ্ছি। আর গদ্য রচনার বেলাতেও ক'জন লেখক এমন আছেন যাঁদের তাঁর মতো বিশুদ্ধ রচনাশৈলীতে বরাবর অমন উচচ চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষমতা থাকতে পারে তা জানিনা। তাঁর রচনার দ্বারা তিনি কেবল যে ইংরেজী ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছেন তা নয়, তিনি নতুন নতুন শব্দেরও যোজনা করেছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এমন কোনো শব্দ কি স্মরণ করতে পারেন?"

আমি বললাম: "পারি। 'bar dexter' কথাটার অর্থ জানেন কি?"

তিনি কেম্ব্রিজের একজন এম্, এ,—এক মিনিট চেষ্টা করে বললেন যে না, তিনি ওর অর্থ জানেন না।

আমি বললাম: "'bar sinister' কথাটার অর্থ জানেন তো?"

তিনি বললেন, হাঁ। আমি তখন বললাম যে ওর মানে যেমন পরিবারের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তর মিশে যাওয়া, তেমনি 'bar dexter' মানে নিচুর মধ্যে উচচ স্তরের জন্ম।

শেষকালে আমি বললাম, "এই বইগুলি আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি; আপনি ও আপনার সহকারী ও সহায়ক এগুলি পড়ে দেখুন এবং ইচ্ছা করলে আরো তাঁর লেখা পড়ুন। এই সমস্ত পড়ে যদি আপনাদের মনে হয় যে মানবজাতির মূলগত সমস্যাগুলির কোনো মীমাংসা এর মধ্যে আছে এবং এর চিন্তাধারার মধ্যে কিছু নতুন কথা আছে, তাহলে এ সম্বন্ধে আপনারা নিজেরাই সম্প্রচার করুন। আমি নিজে তা করতে চাইছি না। ভারতে আমি বহুবারই তা করেছি। কিন্তু যদি আদৌ এখানে সম্প্রচার করা না হয়, তাতেও আমি দুঃখিত হবোনা শ্রীঅরবিন্দের কারণে, কিন্তু দুঃখিত হবো ইংলণ্ডের জন্য।"

তিনি বললেন, আমার অনুরোধের কথা তিনি নিশ্চয়ই যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখবেন। আরো একবার তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন, তার তারিখ ধার্য হলো ২২ অক্টোবর। সেদিন আমাকে প্রায় ত্রিশটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল, প্রশ্নগুলি রচনা করেছিলেন তাঁর সহকারী ও সহায়ক। আমি অল্পেশে প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিলাম। অত:পর কথাবার্তার ধারা হালকা হয়ে এলো। সহায়ক গ্রেগরী আমাকে বললে: "ডিরেক্টর কেন যে শ্রীঅরবিন্দের কিংস কলেজে পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন তা আপনি জানেন কি?" আমি বললাম: "না, জানিনা।" গ্রেগরী বললে: "তার কারণ উনি নিজেও কিংস কলেজে পড়েছেন।" আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত বাড়িয়ে বললাম: "তাহলে করমর্দন করুন, শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে এই জন বরিস পর্যন্ত সকল মহৎ ব্যক্তিই কিংস

কলেজের আমদানি।" ডিরেক্টর এই শুনে বললেন "আপনার কূটনৈতিক কাজে যোগ দেওয়া উচিত ছিল।" তারপর তাঁর সহায়ককে দেখিয়ে বললেন: "আপনি জানেন কি যে ইনি জন্মেছিলেন ভারতে?" আমি বললাম "জানিনা।" তারপর গ্রেগরীর দিকে ফিরে বললাম, "এ কথা আপনি লুকিয়েছেন। ভারতে কোথায় জন্মেছিলেন?" তিনি বললেন: "বেনারস, আমার বাবা ছিলেন মিশনারী।"

আমি বললাম: "তুমি তবে একজন পুণ্যাত্মা গ্রেগরী, বেনারস হলো পুণ্যভূমি।"

এ কথা বলার পরে ডিরেক্টর বললেন "যাক্ ঠিক আছে, সম্প্রচারের পক্ষে আপনিই সব চেয়ে উপযুক্ত, আমরা আপনাকে পুরো কুড়ি মিনিটই সময় দেবো।"

রাত্রির পর রাত্রি আমি উৎকণ্ঠায় কাটালাম—কারণ সেই সময়েই আমার কোন কাজ থাকত না। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সব কিছু বলবার কথা আমাকে প্রায় তিন হাজার শব্দের মধ্যে সংক্ষেপ করে আনতে হবে আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে তা বলা শেষ করতে হবে, এটা আমার কাছে অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে মনে হলো। তা ছাড়া সম্প্রচার করতে হবে এমন সব ব্রিটিশ শ্রোতাদের জন্য যাদের সংস্কৃতির পটভূমি ভারতের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। কিন্তু এ তো আমার একার কাজ নয়, তাঁরই আলো হলো আমার সহায়ক। দুই তিন দিন রাত জেগে লেখাটা আমার শেষ করলাম। কবে সেটা শোনানো হবে তার দিন স্থির হলো। গ্রেগরীর সঙ্গে বন্ধুত্বও জমে উঠেছিল, আমি তাকে দেখিয়ে তার কাছে পরামর্শ চাইলাম। আমার পাণ্ডুলিপির শেষটাতে আমি "সাবিত্রী" কাব্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। গ্রেগরী খোলাখুলিভাবে আমাকে বললে "সাবিত্রী" থেকে তোমার ঐ উদ্ধৃতিটা দিতে যদি তোমার খুব ইচ্ছা থাকে তো দাও। কিন্তু আমি তো ব্রিটিশ জনগণের কথা জানি, আমার মত যদি চাও তো বলব যে সম্প্রচারের শেষকালে কোনো উদ্ধৃতি না দেওয়াই ভালো।"

সেই দিনই রাত্রে আমি আমার লেখার শেষ অংশটা বদ্‌লে ফেললাম। তার পর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম যাতে কুড়ি মিনিটের মধ্যে সবটা পড়া হয়ে যায়। এটা করা খুবই দরকার ছিল, কারণ প্রায়ই সময়ের গোলমাল হয়ে থাকে, হয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পড়া শেষ হয়ে যায় অথবা সময় পার হয়ে গেলেও সবটা পড়া হয়ে ওঠেনা।

অবশেষে ১৬ নভেম্বর আমার ভাষণ দেওয়া হলো। খুব আনন্দের সঙ্গে দেখলাম যে ভাষণ দেওয়া ভালোই হয়েছিল আর তা শেষ হলো ঠিক কাঁটায় কাঁটায় কুড়ির শেষ মিনিটে, ৬০তম সেকেণ্ডে পৌঁছে।

গ্রেগরী সেখানে উপস্থিত ছিল, সে আমার হাত ধরে নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বললে: "এমন জিনিস খুব কমই হয়, ভাষণগুলি হয়তো ১৮ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় কিংবা ২২ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে তখন আমাদের বাধ্য হয়ে ২০ মিনিটেই কেটে দিতে হয়।"

আমি তার জবাবে বললাম: "তাঁর কাজে সব এমনিই হয়ে থাকে।"

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

এপ্রিল ২৯, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মা, আপনি যে বলেছেন, সচেতন ইচ্ছার সাহায্যে আমাদের স্বপ্নের ধারাকেও বদ্‌লে দেওয়া যায়?

উত্তর : নিশ্চয়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা দুঃখ দিচ্ছে (যেমন কেউ তেড়ে এসে বলছে যে তোমাকে খুন করবে), তখন তুমি জোর করে বলবে, "ও সব চলবেনা, এ স্বপ্ন আমি চাইনা," তার ফলে তুমি স্বপ্নের ক্রিয়াধারা ও তার পরিণাম পাল্‌টে দিতে পারবে। ইচ্ছা করলে আপন স্বপ্নকে তুমি নিয়ন্ত্রিত করতে পারো, তাকে শুধরে গুছিয়ে নিতে পারো। কিন্তু তার জন্য তুমি স্বপ্ন দেখছ এ বিষয়ে চেতন থাকা চাই, তা যে স্বপ্ন এ জ্ঞান থাকা চাই।

প্রশ্ন : কিন্তু অবশ্য স্বপ্ন জিনিসটার তেমন কিছু গুরুত্ব নেই।

উত্তর : হাঁ, আছে বৈকি কিছু গুরুত্ব, আর তখন ব্যাপারটা কি হচ্ছে সে বিষয়ে চেতন থাকতে হয়। মনে করো তুমি প্রাণময় জগতে ঘুরতে গেছ। সেখানে যে সব সত্তার সামনে গিয়ে পড়লে তারা তোমাকে আক্রমণ করতে এলো (এটা প্রায়ই হয়ে থাকে), তখন যদি তুমি জানো যে এটি স্বপ্ন, তাহলে নিজের প্রাণশক্তিকে সংহত ক'রে সেখানে তুমি জয়ী হতে পারো। এটা খুব ঠিক কথা, একটা সুনিশ্চিত মনোভাব নিয়ে নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট বাক্যের প্রয়োগে তুমি এমন কিছু করতে পারো যা সাধারণভাবে স্বপ্নের মধ্যে করা যায়না।

প্রশ্ন : স্বপ্নের মধ্যে কেউ যদি মেরেই ফেলে, তাতেই বা ক্ষতি কি হয়, সে তো স্বপ্ন ছাড়া সত্য কিছু নয়?

উত্তর : মাপ করতে হচ্ছে; কারণ তার পরের দিন বা কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। ও একটা বিপদের সংকেত। আমি একজনকে জানি, স্বপ্নে তার চোখ আক্রান্ত হয়েছিল, কিছুকাল পরে বাস্তবিকই তার চোখটি নষ্ট হয়ে গেল। আরেকও ঐরকম কিছু হয়েছিল, স্বপ্নে দেখলাম যে মুখের ওপর কেউ ঘুষি মারছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে মুখের সেই জায়গাতে, কপালে, গলায় লাল লাল দাগ হয়ে আছে...তার মানে প্রাণসত্তায় কোনো আঘাত লাগলে তা দেহেও প্রতিফলিত হতে পারে।

প্রশ্ন কিন্তু তা কেমন করে হয়? কিসের আঘাতে?

উত্তর আঘাত লেগেছিল প্রাণসত্তায়। সেটা ভিতর থেকে বাইরে চলে এলো। বাইরে কেউ আমাকে স্পর্শই করেনি। যা হয়েছিল তা ভিতরে। ভিতরকার সত্তা আঘাত পেলে বাইরের সত্তা তার ফলভোগ করে। অসুখবিসুখ যা হয়ে থাকে তার প্রায় অর্ধেক-গুলোই হয় এমনি ভিতরের আঘাতের দ্বারা, যদিও তা কেউ জানে না। লোকে তাদের প্রাণসত্তার সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাই তারা জানে না যে তাদের রোগের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হয় প্রাণসত্তার তরফ থেকে আঘাত, বিরোধ, সংঘর্ষ, অশুভ ইচ্ছা—এইগুলোই অসুস্থতায় প্রকাশ পায়। স্থূলদেহে এর প্রতিক্রিয়া করবার উপায় যদি জানা থাকে, তাহলে বাইরে রোগের মূলে গিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজেকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারো।

প্রশ্ন : বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, জাতি ও ধর্ম অনুযায়ী স্বপ্নের প্রতীকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় কেমন ক'রে?

উত্তর : তার কারণ স্বপ্ন যা আকার পায় তা মনের দ্বারা। তোমার যদি আগের থেকে জানা থাকে যে পরিচিত কোনো পৌরাণিক ব্যক্তির চেহারা কতকটা এমনতরো হবে, তাহলে সেইরূপ আকৃতি স্বপ্নে দেখলেই বলবে "এই সেই"। তোমার বস্তিষ্কের মধ্যে বিশেষ কিছু ধারণার সঙ্গে বিশেষ রকম আকৃতির অনুষঙ্গ হয়ে আছে, সেটাই স্বপ্নের মধ্যে কাজ করে। স্বপ্নের যখন রূপান্তর ক'রে নাও তখন সেই পূর্বধারণা ও পূর্বশিক্ষা অনুযায়ী তার অর্থদান করো, তোমার বস্তিষ্কে যেটা জানা আছে তাই চলে আসে তোমার মনের ছবিতে। এ ছাড়া জান দার্কের অন্তর্দর্শন (vision) সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে কি লিখেছিলাম শোনো

(কথাবার্তা থেকে পড়ে শোনালেন) "যে সকল সত্তারা পুনঃপুনঃ দেখা দিয়ে জান দার্কের সঙ্গে কথা বলত, কোনো ভারতীয়ের কাছে এলে সে তখন তাদের দেখত সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে : কারণ যে দেখে সে তার আপন মনেরই ভিতরকার মূর্তিকে প্রতিফলিত ক'রে দেখে...ভারতে যে মাতৃমূর্তিকে তোমরা বলো মা ভগবতী, ক্যাথলিকরা তাকেই বলবে ভার্জিন মেরী, জাপানীরা বলবে কোয়ানুন, করুণাদাত্রী দেবী, আবার অন্যেরা দেবে অন্যরকম নাম। শক্তি সেই একই, তার তেজ-ক্রিয়া সেই একই, কেবল বিভিন্ন ধর্মে তার বিভিন্ন চেহারা।"

এখন বুঝলে? কিন্তু কই তোমরা আজ তো কিছু বলছ না। এই কি সব হয়ে গেল?

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে প্রত্যেকেরই স্বপ্নরাজ্যে নিজেদের স্বপ্নছবির স্বতন্ত্র ধরন আছে ?

উত্তর প্রত্যেকেরই নিজের প্রকাশভঙ্গি, চিন্তাভঙ্গি, কথা বলার, অনুভব করার, বোঝবার ধরন স্বতন্ত্র। এগুলিকে একত্রে জুড়ে নিয়েই তার ব্যক্তিত্ব। তাই প্রত্যেকেই তার প্রকৃতি অনুসারে দেখে এবং বোঝে। যতদিন তুমি আপন প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ততদিন কেবল আপন চেতনার প্রকৃতি অনুসারেই সব-কিছু বুঝবে। সবই নির্ভর করবে সেই প্রকৃতির ব্যাপ্তি ও উচ্চতার উপর। তোমার জগৎ তোমার চেতনার মাপেই সীমাবদ্ধ। চেতনা যদি নেহাৎই ছোটো হয় তাহলে বুঝবেও তুমি কেবল অল্প কিছুই। চেতনা যদি বৃহৎ, উদার ও বিশ্বব্যাপী হয় তাহলে বুঝবে সমগ্র জগৎকেই। আর চেতনা কেবল যদি ক্ষুদ্র অহংটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে নিজের অহংএর বিষয় ছাড়া অন্য সব-কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। কারো কারো মস্তিষ্ক ও চেতনা একটা বাদামের চেয়েও ছোট হয়। তোমরা জানো যে বাদাম জিনিসটা কতক মস্তিষ্কের মতো দেখতে ; যাদের চেতনা এমন ছোটো হয় তারা দেখতে পেলেও কিছু বুঝতে পারেনা, কেবল তাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়চেতনা যতটুকু বলে ততটুকুই তারা বোঝে। জিভে যা আস্বাদ করে, চোখে যা দেখে, কানে যা শোনে, হাতে যা স্পর্শ করে, তাই তাদের কাছে বাস্তব, বাকী সব-কিছুর অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই, তারা বলবে যে আমরা যা-কিছুই বলে থাকি সে কেবল আমাদের কল্পনা। তারা বলে, "যা ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসেনা তার কোনো অস্তিত্ব নেই।" তাদের জবাবে শুধু এই কথাই বলা যায়, "তোমার কাছে নেই বলে যে আর কারো কাছে নেই তা বলতে পারোনা।" তবে সেই সব লোকের কাছে এ কথাও বলতে গিয়ে কোনো লাভ নেই, জেনো যে তারা যতই ছোটো হবে ততই তাদের নিজেদের জিদ্ হবে দুর্বার।

যার যত বেশি অজ্ঞান তার তত বেশি আত্মপ্রত্যয় ; যে যত বেশি অজ্ঞান সে নিজের সম্বন্ধে তত বেশি দৃঢ়নিশ্চিত। যে সব চেয়ে নির্বোধ সেই হয় সব চেয়ে দাম্ভিক। দম্ভের মাপ হয় নির্বুদ্ধিতার মাপে। জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে...এমন একটা সময় আসে যখন তুমি নিঃসন্দেহে জানতে পারো যে কিছুই তুমি জানোনা। জগতে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন নতুন কিছু জানলে না, কারণ জগৎ চলেছে নিত্যই অগ্রগামী। চেতন হয়ে থাকলে সর্বদাই নতুন কিছু শিখতে পরবে। কিন্তু তেমন চেতনা ক্রমশই আসে। অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতা যত বেশি আঁকড়ে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে তোমার আত্মপ্রত্যয়ও আঁকড়ে থাকে।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানীদের চেতনা কি তাহলে খুব ছোটো ?

উত্তর : তা কেন ? বিজ্ঞানী মাত্রেই তেমন নয়। কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাছে যাও, সে তোমাকে বলবে : "আমরা আসলে জানিনা কিছু। আজ যেটা জানি, আগামী কালের জানার তুলনায় তা কিছুই নয়। আগামী বছরের আবিষ্কার এই বছরের আবিষ্কারকে অনেক ছাপিয়ে যাবে।" প্রকৃত যে বোদ্ধা হয় সে ভালোরকমই জানে যে অনেক কিছুই সে জানে না। মানব কৃতিত্বের সকল বিভাগেই এই কথা। এমন কোনো যথার্থ পণ্ডিত আমি দেখিনি যার মধ্যে দম্ভ আছে। তেমন কেউই কখনো আমাকে বলেনি যে, "আমি সব-কিছু জানি।" যাদের দেখেছি তারা সকলেই বলেছে, "আসল কথা বলতে গেলে কিছুই আমরা জানিনা। তারা যা-কিছু করতে পেরেছে, যা-কিছু তাদের কৃতির, সমস্তই জানিয়ে দিয়ে শেষকালে নম্রভাবে বলেছে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানবার মতো কিছুই আমি জানি না।"

প্রশ্ন : এমন অনেক লোক থাকে যারা বিনয় ক'রে মুখে বলে যে তারা কিছুই নয়, কিন্তু ভিতরে সে কথা ভাবে না।

উত্তর : কপট মানুষ তেমন আছে বৈকি, জগতে ভণ্ড লোক অনেকই আছে। তাতে তাদেরই ক্ষতি। উন্নতির দরজা তারা এঁটে রাখে। এই আর কি।

প্রশ্ন : তাহলে আমরা যারা আপনার ক্লাসে আসছি, আমাদের পক্ষে যত বইগুলো পড়া তো বিপজ্জনক হতে পারে ?

উত্তর : না, বরং তার ঠিক উল্টো। ভালোরকমভাবে যত বেশি পড়বে তত বেশি চেতনার স্ফুরণ হবে, ভিতরে এখনো কত অভাব রয়েছে তা জানা যাবে।

একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে, সে অল্প কিছু জ্ঞানলাভ করার পরে আমাকে বললে "আপনার কাছে শেখার আগে আমি সকলকেই বিশ্বাস করেছি, মনের সুখেই ছিলাম। কিন্তু এখন জ্ঞান পেয়ে চোখ খুলে গিয়ে সে-সব আবার ঘুচে গেছে। জ্ঞানলাভ করা তো বিপদের কথা।"

তাহলে কি করতে হবে ? আরো বেশি চেতনালাভ করতে হবে। সামান্য একটু জানা খুবই খারাপ। আরো বেশি শিক্ষা পেতে একটা সময় আসবে যখন দেখবে যে কিছুই তুমি জানোনা। আমি বলেছি একজন শিক্ষানবীশের কথা, সে যা-কিছু শিখতো তাই অপরকে শেখাতো—শেষে একদিন দেখলে যে শেখাবার মতো কিছুই তার নেই। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষাগুলির ভিত্তি হয়ে থাকে এইরকম। অল্প একটু

জ্ঞান নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করা (প্রায়ই সেগুলি সুন্দরভাবে রচিত), যা মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়ে জানিয়ে দেয় "এটাই সত্য"। বইতে পড়লেই সেই সত্য জানা হয়ে যাবে, কত সুবিধার কথা। প্রত্যেক ধর্মেই এমন সব বই আছে—ধর্মশাস্ত্রে, হিন্দুশাস্ত্রে, কোরানে, অন্যান্য ধর্মপুস্তকে—সেগুলি তুমি মুখস্তই করে ফেললে। জানলে যে খাঁটি সত্য জেনে নিয়েছি, তাতেই বেশ খুশি হয়ে থাকলে। কত সুবিধার কথা, আর কিছু শেখার দরকার নেই। যারা তোমার মতো জানতে পারলে না তারা মিথ্যার অন্ধকারেই রয়ে গেল, এমন কি যারা এই "সত্যের" বাইরে পড়ে রইল তাদের সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনাও করা হয়। সকল ধর্মেই এ ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু আবার সকল ধর্মেই এমন কেউ কেউ আছে যারা অমন কথা বলে না, তারা ওর চেয়েও কিছু বেশিরকম জানে। ক্যাথলিক ধর্মের এমনি একজনকে আমি দেখেছিলাম, খুব নামজাদা একজন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম "তোমরা এমন ভাবে লোকের অজ্ঞতা বাড়িয়ে দাও কেন?" সে তখন বললে: "এটা হলো শান্তিরক্ষার উপায়। এমন ব্যবস্থা না করলে লোকে আমাদের কথা শুনবেই না। এই হলো ধর্মশিক্ষা দেবার ভিতরকার রহস্য।" লোকটি আরো বললে, "আমাদের ধর্মে আর অন্যান্য প্রাচীন ধর্মেও এমন লোক আছে যারা প্রকৃত কথাই জানে। এমন সংস্থাও আছে যেখানে প্রাচীন সত্য জ্ঞান শেখানো হয়। কিন্তু সে কথা বলা নিষেধ। আর এগুলো যা শেখানো হয় তা হলো আসল জিনিসের প্রতিভূর মতো, কিন্তু আসল জিনিস বাইরে শেখানো হয় না।"

এর যা কারণ তা হলো জনগণের প্রতি উদারতা ও সহানুভূতি (তাদের মতে): "মস্তিষ্ক যাদের ছোটো—অধিকাংশেরই তাই—তাদের কাছে যদি খুব উঁচু ও বৃহৎ রকমের কথা বলি, তাতে তারা অসুখী ও অস্থির হয়ে উঠবে। কখনই সে কথা তারা বুঝবে না। অনর্থক তাদের কষ্ট দেওয়া হবে। সত্যকে বোঝবার মতো ক্ষমতাই তাদের নেই। কিন্তু যদি বলি ভগবানে বিশ্বাস রাখো তাহলে স্বর্গলাভ হবে, সে কথা তারা সন্তুষ্ট হয়ে মানবে।"

তাই এই রকম সুবিধা। এতেই সব বেঁচে আছে, নতুবা কোনো ধর্মই টিঁকত না।

এটা বা ওটা কোনো ধর্মকে সমর্থনের জন্য আমি এ কথা বলছি না। কিন্তু একেই উদার পদ্ধতি বলে মনে করা হয়।...নতুবা কোনো ধর্মই টেঁকে না; এর থেকেই গুরু শিষ্যের ব্যাপারটা এসে পড়ে, অসাধারণ রকমের অনুভূতি যারা পেয়েছে তারা উচ্চস্তরের শিক্ষাগুরু হয়। এতে খুবই ভালো কাজ হয়। কিন্তু শিক্ষাদাতা যখন চলে যায় তখন তার দেওয়া জ্ঞানটি রূপান্তরিত হয় ধর্মে। নির্দিষ্ট একটা ধর্মমত গড়ে ওঠে, হুকুকাটা বিধিবদ্ধ আইনকানুন তৈরী হয়, তার কাছে সকলে মাথা নোয়ায়। যদিও আগে এসব কিছু ছিল না, তথাপি তখন বলা হয়: "এই হলো সত্য, অন্য কথা মিথ্যা, গুরু তাই বলেছেন।"···· কিছুকাল পরে গুরু হয়ে যান ভগবান, তখন—"ভগবান এই বলেছেন।"

মনে রেখো, তোমরা সকলে ধর্মের বন্ধনমুক্ত জেনেই একথা তোমাদের বললাম। এখানে কেউ ধর্মবিশ্বাসী থাকলে তাকে বলতাম "বেশ কথা, তোমার ধর্মকে মেনেই চালিয়ে যাও।" সুখের বিষয় যে তেমন গোঁড়ামি তোমাদের নেই এবং থাকবেও না, কারণ ওতে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

মে ৬, ১৯৫৩

কথাবার্তা থেকে—"এই সব স্তরে ব্যক্তিসত্তারা পরস্পরে মিলিত হয় পৃথিবীতে সাক্ষাতের আগেই। সেখানে তারা পরস্পরে আলাপাদিও করে, আর পৃথিবীর মতো সম্পর্কও স্থাপিত হয়। সে সম্পর্কের কথা কেউ-বা জানে, কেউবা জানে না। আভ্যন্তরীণ সত্তা ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিষয়ে অধিকাংশই থাকে অচেতন, অথচ বাহ্যজগতে যখন একজন অন্য-জনের প্রথম সাক্ষাৎ পায়, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে খুব চেনা বলে বোধ হতে থাকে, যেন অনেকদিনের জানাশোনা।"

উত্তর : হাঁ, এর অনেকটাই নির্ভর করে তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনার মাত্রার উপরে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে থাকে কেবল মন প্রাণ দেহের স্তরের মিশ্রণ ; তারা জানতেই পারেনা, যে কোথায় কি হচ্ছে। কেউ কেউ কতক জানতে পারে, তখন তাদের কাছে এ কথা উল্লেখ করলে তারা সচেতন হয়ে বলে : "হাঁ, তাইতেই তোমাকে আমার খুব অন্তরঙ্গ বলে বোধ হয়েছিল, সে কথা এখন অস্পষ্টভাবে স্মরণ হচ্ছে।" তবে খুব কম লোকই বলতে পারে "আমি অমুক অমুক অবস্থাতে তোমাকে দেখেছি।" অথচ বাস্তবিকই তেমন কিছু ঘটেছিল।

এ ছাড়া অনেকে আছে যারা অল্প কিছু শিখেছে, গুহ্যতত্ত্বের সম্পর্কে অল্পবিস্তর জেনেছে, পুনর্জন্মে বিশ্বাস তাদের নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো, তারা এ সম্বন্ধে ভাবে যেন ক্ষুদ্র একজন ব্যক্তি একটার পর একটা দেহাবরণ বদল ক'রে চলেছে—যেমন ভাবে পুতুল-খেলাতে একটার পর একটা পোষাক বদলানো হয়। যেমন আমরা এক কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরি, সেইরকম তারা ভাবে। এমন কি এই নিয়ে কেউ কেউ বই লিখেছে আর নিঃসংকোচে বিস্তারিত ভাবে বলেছে, কেমন ক'রে বিভিন্ন জন্মে তারা বাঁদর থেকে ক্রমশ মানুষ হয়ে এসেছে। এ নিতান্তই ছেলেমানুষী কথা। কারণ হাজারের মধ্যে নয়শো নিরা-নব্বুই ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরে কেবল কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্র চৈত্যসত্তাটুকুই টিঁকে থাকে, বাকী সব কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে এখানে ওখানে মিলিয়ে যায়, ব্যক্তিত্বের কিছুই থাকে না। বস্তুত স্থূল

দৈহিক জীবনে যা-কিছু করা হয় তার মধ্যে কেন্দ্রস্থ চৈত্যসত্তা চেতনভাবে কতটুকু অংশ গ্রহণ করে?...যারা রীতিমত যোগ করে তাদের কথা বলছি না। আমি বলছি গড়পড়তা লোকের কথা, যাদের এমন একটু চৈত্যশক্তি এসেছে যার দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—কারণ এমন হওয়া ছাড়াও অনেকের বছরের পর বছর কেটে যায়। এরা সব এসে বলে যে আগের বারে কোন দেশে তারা জন্মেছিল, বাপ মা কেমন ছিল, সেখানে গির্জার ছাদটা কেমন ও পাশের বনজঙ্গল কেমন ছিল, কি কি তুচ্ছ ঘটনা সে-জীবনে ঘটেছিল। এগুলো নিতান্ত নির্বোধের মতো কথা, কারণ প্রকৃতপক্ষে সব-কিছুই বেনালুন মুছে যায়, কিছুই স্মৃতিতে থাকেনা। কেবল থাকে কোনো বিশিষ্ট "মর্মমুহূর্তের" স্মৃতি, যাতে মূল চৈত্যেরই হঠাৎ অংশগ্রহণ ঘটেছিল, হয়তো কোনো জোর আভ্যন্তরীণ তাগিদে বা আত্যন্তিক কোনো প্রয়োজনে—সেইটুকু জিনিসই চৈত্যের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে যায়। সেই চৈত্যস্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকে জীবনের সেই বিশেষ কালের ঘটনাগুলো, বিশেষত তখনকার সময়ের চেতনার অবস্থা ও মনোভাব। কিছু অনুষঙ্গ নিয়ে সেই জিনিসটাই এখনকার চেতনাতে চলে আসতে পারে হয়তো কোনো বলা কথা বা শোনা কথা। আর বিশেষ ক'রে তখনকার সেই আন্তিক অবস্থা, সেটাই থাকে স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে। এগুলি হলো চৈত্য জীবনের ধাপের মতো, যা চৈত্যকে পরিণতি দেবার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং যার দাগ পড়ে গভীরভাবে। তাই যখন তুমি চৈত্যকে ফিরে পাও এবং সর্বদা তার সুস্পষ্ট সান্নিধ্যে থাকো তখন ঐগুলি তোমার স্মরণে জাগে। কয়েকটি মাত্র হলেও ঐগুলি জীবনে জ্যোতিদানের মতো। এমন কথা তুমি বলতে পারোনা যে: "আমি অমুক অমুককে দেখেছিলাম, অমুক কাজ করেছিলাম, এইরকম আমার নাম ছিল ও এইরকম তখন হয়েছিল।" বরং এমন বোধ হতে পারে যে সেই মুহূর্তে এইরূপ ঘটনাসংস্থান হয়েছিল (যা খুবই বিরল), তখনকার স্থান কাল ও বয়সের কথাও বলা যায়। এটা হতে পারে।

স্বভাবতই চৈত্যসত্তা উত্তরোত্তর যত বেশি অংশগ্রহণ করতে থাকে ততই স্মৃতির মাত্রাও উত্তরোত্তর বাড়ে। আর সেই অনুযায়ী জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু তার সকল বৃত্তান্তে নয়। কখনো কখনো এতদূর বলা যায় যে এইরূপ হয়েছিল বা "আমি এই ছিলাম।" সে জীবনের কয়েকটা জরুরী মুহূর্ত মাত্র অর্থাৎ আপন চৈত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে তাকেই ঘিরে সকল ব্যাপারে তাকেই কেন্দ্র ক'রে থাকবে সমগ্র সত্তা,—এক অভেদ সত্তারূপে তা থাকবে ভগবৎ অভিমুখী হয়ে; এমন হলে তখন দেহপাতের পরেও সে-জিনিস টিঁকে থাকে। কারণ সে তখন এক পূর্ণপরিণত চেতন সত্তা এবং পূর্ব জীবনের সব কথা সে স্মরণ করতে পারে। এমন কি সে চেতনভাবে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে চলে যেতেও পারে। কিন্তু পৃথিবীতে তেমন ক'জনই বা আছে যে ঐরূপ অবস্থাতে পৌঁছতে পেরেছে?...বোধ করি বেশি নয়। আর সাধারণত তারা ও-সব কথা বলেও না।

প্রশ্ন : কেউ কেউ অন্যের জীবনের কথা বলে দিতে পারে।

উত্তর : হাঁ, তা জানি। অনেক কিছুই জানি, অনেক কিছু শুনেছি। তারা গল্পের পর গল্প বলে যায়।...তোমার দিকে চেয়ে বলে, "তুমি অমুক জন্মে অমুক ব্যক্তি ছিলে, এই সব কাণ্ড করেছিলে।" নিশ্চয় তা সত্য নয়। আমি কিন্তু জানি যে কেমন ক'রে জানতে হয়—এই লোকটিকে কোথায় দেখেছি বা সে কেমন মানুষ ছিল আর এখন কেমন— কিন্তু তা বইতে লেখার মতো গল্প নয়। যখন কাউকে দেখতে শুনতে পাবে তার গভীর অন্তরলোকে, যখন চৈত্যসত্তা সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট জ্ঞান আসবে যাতে জানা যাবে যে ওর চৈত্য কোথায় কি অবস্থায় ছিল, তখন হঠাৎ ভেসে উঠবে একটা দৃশ্য, একটা ছবি, একটা মূর্তি, একটা কথা। এমন একটা মিল থেকে যায় যাতে সেই ব্যক্তির বর্তমান অবস্থাতেও জানা যায় যে তার গত জীবনের আকর্ষণ ও অনুভূতি কিভাবে এই জীবনেও রয়ে গেছে। কিন্তু যেমন আমি বলছিলাম, সে কেবল জীবনের সেই বিশেষ বিশেষ "মুহূর্ত-গুলোই"। তাইই কেবল দেখা যায়, সমগ্র জীবনের কথা নয়।

বোধ করি এই ধরনের প্রসঙ্গ নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ একটা মজার কথা লিখেছিলেন, কিভাবে বড় বড় মহাত্মাদের আসার কথা, সীজার, নেপোলিয়ন, শেক্‌সপিয়র, আরো কত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা কত হবে? প্রায় শত শত। তারা এসে বলে যায় : "আমি অমুক ছিলাম, তমুক ছিলাম, এত কিছু করেছিলাম", কিংবা সিঁয়া-সেতে এসে তথাকথিত আত্মারা এই সব বচন শোনায়। বহু লোকে এই সব "আত্মাদের" নিয়ে কত ছেলেখেলা করে, স্বতঃক্রিয় লেখার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওদিকে আবার বাচাল আত্মারাও আছে, তারা একই কালে বহু স্থানে গিয়ে বলে, আমি হচ্ছি নেপোলিয়ন (জানিনা কেন নেপোলিয়নের নামেই এত ঝোঁক), সর্বত্রই নেপোলিয়ন হাজির হয়ে শোনায় তার জীবনের উল্টোপাল্টা নানা অদ্ভুত ঘটনার কাহিনী ; সর্বত্রই প্রায় এক কালে। এরা খুবই সক্রিয়। তবে জিনিসটা হাস্যকর, অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে এরা সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা, অপূর্ণ কামনা নিয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে ঐরূপ অবস্থায় থাকে, নানারূপ কল্পনা জল্পনা হয়ে ঐভাবে পুনঃপ্রকাশ পেতে চায়। কতক বা এরা প্রাণময় জগতের ছোটো রকমের সত্তা, মতলব তাদের ভালো নয়। যেমনি দেখে যে জগতের লোকে এই সব আত্মাদের ডেকে আনার খেলা করছে, অমনি সেখানে জুটে যায়। তারা যে স্তরে থাকে সেখান থেকে মানুষের মনের ভিতরকার খবর জানতে পারা খুব সহজ, সুতরাং তোমাদের মাথার মধ্যে যা রয়েছে সে কথা তারা অনায়াসে বলে দেয়। তোমরা যেমন জবাব প্রত্যাশা করো তাই তারা বলে দেয়, এমন কি প্রশ্ন করবার আগেই তা জানিয়ে দেয়। সব কথাই তারা খুঁটিয়ে বলে, কোথায় কখন কি হয়েছিল, তোমাদের সংসারে কার কি ব্যাপার...সবগুই তারা জানে। মনের চিন্তা পড়তে তারা খুবই সুদক্ষ, তাতেই সহজে

বিশ্বাস এসে যায়, "আমার যে বিয়ে হয়েছে, তিন ছেলে, চার মেয়ে আছে, তা তো বলিনি, ও জানলে কেমন করে?" কিন্তু কথাগুলো তোমার মাথার মধ্যে ছিল বলেই জেনেছে।

চৈত্য-স্মৃতির একটা আলাদা লক্ষণ আছে, আশ্চর্য রকমে তা তীব্র। কিন্তু এভাবে তা বোঝানো যায় না।...জীবনের সেই সব মুহূর্ত হয় অবিস্মরণীয়, চেতনা তখন তীব্র-রূপে উদ্দীপ্ত, সক্রিয়, প্রবল শক্তিসম্পন্ন, হয়তো কখনো তা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে অন্য পথে। কিন্তু তাই বলে তুমি বলতে পারোনা যে তখন কেমন পোষাক পরা ছিল, কার সঙ্গে কথা বললে, কোথায় ছিলে বা প্রতিবেশী কে ছিল।

প্রশ্ন: আমাদের দেখা স্বপ্নগুলো আমরা ভুলে যাই কেন?

উত্তর: কারণ সর্বদা একই স্তরে তোমরা স্বপ্ন দেখনা, একই জায়গাতে ও সত্তার একই অংশ দিয়ে সব স্বপ্ন দেখা হয়না। যদি চেতন ও প্রত্যক্ষভাবে সর্বদা তোমার সত্তার সকল অংশের সঙ্গে সযোগ থাকে তাহলে সকল স্বপ্নই মনে থাকে। কিন্তু সাধারণত সংযোগ থাকে কেবল কয়েকটি অংশের সঙ্গেই।

যেমন, তুমি স্বপ্ন দেখলে সূক্ষ্মদেহে, যা স্থূলদেহের খুব কাছাকাছি। তেমন স্বপ্ন প্রায়ই হয় ভোরের দিকে, ঘুমের শেষ ভাগে ভোর চারটে পাচটার সময়। তখন ঘুম ভেঙে হঠাৎ নড়াচড়া না ক'রে স্থির হয়ে মনোযোগের সঙ্গে যদি শুয়ে থাকো—নিস্তব্ধ ও নিবিষ্ট-ভাবে, তাহলে স্বপ্নটা স্মরণ হয়ে যাবে, কারণ সূক্ষ্মের সঙ্গে স্থূলদেহের সংযোগ স্থাপিত হবে—সে-সংযোগ না হওয়া খুবই বিরল।

তবে স্বপ্ন প্রায়ই ভুলে যেতে হয়, কারণ এক অবস্থায় স্বপ্ন দেখার পরে তুমি আবার অন্য অবস্থায় চলে যাও। যেমন, প্রথম ঘুমে তোমার দেহ প্রাণ ঘুমায়, কিন্তু মন তখনও সক্রিয়। মনই তখন স্বপ্ন দেখা শুরু করে, অর্থাৎ তার কল্পনা সক্রিয় হওয়াতে তুমি অনেক কিছুই দেখতে থাকো, অনেক অসাধারণ ব্যাপারে অংশগ্রহণ করো। কিছুকাল পরে তা থেমে গিয়ে মনও ঝিমোতে শুরু করে। প্রাণসত্তা তখন জাগে, দেহ থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কত কিছু করতে থাকে, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কখনো বা লড়াই, তার পর যাওয়া। সবই সে করে। খুবই তার সাহসিকতা, সকল দিকে তার লক্ষ্য। বীরপুরুষের মতো বন্দীদের মুক্ত করতে ছোটে, শত্রুদের নাশ করে, কত অদ্ভুত আবিষ্কার করে। তখন মনের স্বপ্নকে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। সেগুলো তখন মুছে বিস্মৃত হয়ে গেছে, কিছুই তার স্মরণ থাকেনা, প্রাণের স্বপ্নই তখন চলছে। সেই সময়ে হঠাৎ জেগে উঠলে তা স্মরণ করতে পারবে। কিন্তু ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লে চলবে না, জেগে স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকলেই স্মরণ হবে।

প্রাণসত্তা যখন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন স্বপ্নের পরে ঠাণ্ডা হয়ে সেও বিশ্রাম নিতে শুরু করে। তখন অন্য কিছু জেগে ওঠে। মনে করো সূক্ষ্মদেহ তখন সজাগ হয়ে একটু বেরিয়ে আসতে চাইলে। তখন সেই ঘরগুলো সে দেখতে শুরু করে...যে ঘরে অপর একজন ছিল, সে সরে আসাতে ও গিয়ে ঢুকল, এইভাবে। নড়াচড়া না করে যদি তখন জাগো তখন এই কথাই মনে হবে। কিন্তু তখন সে প্রাণসত্তার আগেকার কাহিনীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। মুছে যাওয়াতে কিছুই তার স্মরণ হচ্ছে না। ঐ সময়ে জেগে তাড়াহুড়ো কোরোনা, বিছানাতেই শুয়ে থাকো, এমন কি চোখও খুলবে না, মাথাটা যেমন ছিল তেমনি থাক, নিজের ভেতরদিকে অনড় আয়নার মতো দেখতে থাকো। এতে স্বপ্নের শেষের দিকের লেজটা ধরে ফেলতে পারবে। তখন লেজটা ধরে আস্তে আস্তে টানতে থাকো তার আগার দিকটাকে, যার শেষটুকু তোমার নিলে গেছে। তখন ধীরে ধীরে গোটা স্বপ্নটাই এসে যাবে "হাঁ, এবার বুঝেছি, স্বপ্নটা কি ছিল।" বিশেষত কিন্তু সে সময়ে লাফিয়ে উঠোনা, নড়াচড়া কোরোনা ; স্বপ্নটাকে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকো—যতক্ষণ না খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেও নড়াচড়া না ক'রে আরো ভিতরে যেতে চেষ্টা করো,—তাতে হঠাৎ ওর আগেকার অন্য স্বপ্নটারও লেজ ধরে ফেলবে, যেটা ছিল আরো দূরের আরো অস্পষ্ট, তবুও তা ধরা পড়ে। তার লেজ ধরে টানতে থাকলে দেখবে যে সব-কিছুই পাল্টে যাচ্ছে, তুমি অন্যরকম জগতে গিয়ে পড়লে ; তা যেন আরো আশ্চর্য অ্যাড্‌ভেঞ্চার—আরো একটি স্বপ্নকে ঐভাবে পেয়ে গেলে। তাকে নিয়েও বার কয়েক পুনরাবৃত্তি করলে—তেমনি চুপচাপ শুয়ে থেকে। তখন দেখবে যে অনেক গভীরে গিয়ে পড়েছ, খুবই দূরে, খুবই দূরে ; হঠাৎ তখন মিলবে একটা অস্পষ্ট আকৃতি, এক বিচিত্র অনুভব...যেন বায়ুতরঙ্গের মতো, হাওয়া দেওয়ার মতো, নিঃশ্বাস ফেলার মতো ; বলে উঠবে, "তাইতো, তাইতো..." সেটা আবার স্পষ্টতর হয়ে তৃতীয় জিনিসটা এসে পড়বে। অবশ্য এতে অনেকটা সময়ের দরকার, ধৈর্যের দরকার, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, দেহ মনকে শান্ত রাখতে হবে, তাহলে সে রাত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কাহিনীই জানা যাবে।

এত বেশি পরিশ্রম না করেও যদি স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে চাও, শেষেরটি বা মাঝেরটি, যেটাই সত্তাতে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, তাহলে সকালে ঘুম ভাঙার পরে যা বললাম তাই করবে ; বালিশ থেকে মাথা না তুলে স্থিরভাবে শুয়ে থেকে স্বপ্নটিকে ফিরে আসবার সময় দেবে।

এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যেতে কারো কারো মাঝখানটাতে ফাঁক থেকে যায়, সেটা ডিঙিয়ে যেতে হয় ; চেতনার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবার কোনো বাঁধা রাস্তা নেই। আছে কেবল গভীর অন্ধকার একটা গর্ত যার কথা স্মরণ করা যাবে না ;

যেন পর্বতপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চেতনাকে লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দিতে হবে। এমন ক'রে সেতু তৈরি করতে অনেক সময়ের দরকার, বাস্তবের সেতু গড়ার চেয়েও বেশি সময় লাগে...আর খুব কম লোকেই তা করতে জানে বা করতে চায়। যদিও হয়তো তার মধ্যে অনেক কাণ্ডই হয়েছে, কিন্তু তা মনে পড়েনা, কেবল মনে পড়ে শেষের বা কাছের ঘটনাটি এবং তা এলোমেলো ক্রিয়ার সঙ্গে, কারণ স্বপ্নের কোনো মাথামুণ্ড নেই।

কিন্তু দিনের ব্যাপারেও যেমন বৈচিত্র্য থাকে, তেমনি রাতের ও ঘুমের ব্যাপারেও অনেক বৈচিত্র্য থাকে। দিনগুলো একই রকম হয়না, প্রত্যেক দিনটা হয় স্বতন্ত্র রকমের। তেমনি রাত্রিগুলোও একরকম হয় না। তুমি আর তোমার বন্ধুরা যখন একই কাজ করছ, তবুও তখন প্রত্যেকেই তা করছে আলাদা আলাদাভাবে। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র প্রণালী।

প্রশ্ন : দুটো স্বপ্ন কখনো এক রকমের হয় না কেন?

উত্তর : তার কারণ সব-কিছুই যে বিভিন্ন। বিশ্বজগতে দুটি মিনিটও এক রকমের নয়, এ বিশ্ব যতকাল থাকবে ততকালই তাই হবে, দুটি জিনিস কখনো এক রকমের হবে না। আর মানুষ এখানে চায় জোর করে নিয়ম বাঁধতে। এটা করো, ওটা কোরোনা...তবে মানুষকে তো খেলতেও দিতে হবে।

একটা চমৎকার প্রশ্ন তুমি আমাকে করতে পারো "আজ আমার চৌদ্দ বছর বয়স কেন হলো?" বুদ্ধিওয়ালা বলবে: "যেহেতু তোমার জন্মবার পরে চৌদ্দটা বছর পার হয়ে গেছে।" যারা নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে তারাই এমনি জবাব দেবে। কিন্তু ও ছাড়া আরো একটা কারণ আছে, তা চুপিচুপি তোমাকে বলব।...এই তো বেশ ক'রে ডুবিয়ে দিলাম। এবার সাঁতার দিয়ে উঠতে শিখে নাও।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, যদি সব-কিছুর ভিতরের সত্যটা জানতে পারি, তার মানে তাতেই কি ভগবানকে জানা হলো?

উত্তর : নিশ্চয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাই, এই হলো একমাত্র উপায়। এমন কোনো কিছুই নেই যার মধ্যে শাশ্বত সত্যটি নেই, কারণ তা ছাড়া কোনো-কিছু থাকতেই পারেনা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগ সময়ের জন্যও টিঁকে থাকতে পারত না যদি এর মধ্যে সত্য না থাকত।

প্রশ্ন : ভগবানের স্পর্শ পেলে তার ফল কি হবে?

উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল। কারণ একটা কথা ঠিকই এই বিশ্বটা যে রয়েছে, অন্ততপক্ষে এই পৃথিবী যে রয়েছে, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই,

কোনো তর্ক নেই, তা মানো নিশ্চয়?···কিন্তু কখনো কি প্রশ্ন করেছ যে পৃথিবী কেন আছে? করোনি। বুদ্ধির ব্যাপার বলেই করোনি। তোমাদের বলেছিলাম—একজন গুহ্য গুণীর কথা, লোকে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতো

প্রথমত, এই বিশ্ব কেন আছে? উত্তর: তাতে তোমার কি?

দ্বিতীয়ত, তবে জগৎটা এমন কেন? উত্তর: এমন বলেই এমন। তাতে তোমার কি আসে যায়?

তৃতীয়ত, আমি এতে সুখী হচ্ছি না।

এই হলো আসল কথা। বাস্তবেতে এসে পড়ে। যারা সুখী নয় তাদের আমি বলি তাহলে তুমি এক কাজ করো, একে বদলাতে চেষ্টা করো, যাতে ভালো হয়ে ওঠে। এখন যা আছে তা আছে। কেন এমনতরো হলো?...কেউ হয়তো সে কথা জানে, ঠিক বলা যায় না। যেমন করেই হোক হয়েছে। তবে বিশেষ কথা এই যে তুমি যদি খুব ঐকান্তিক হও তাহলে জানতে পারবে যে কেন ও কেমন করে এই হলো। এর কারণ এর আদি ও পদ্ধতি। জিনিসটা কেবল একই। তাকে আমরা বলি সত্য, যা সব-কিছুর মূলে, যা না থাকলে কিছুই থাকে না। সেই সত্যকে যদি জানো, তার মূল যদি জানো, তাহলে একে বদলাবার উপায়ও তুমি জানবে—কেন হয়েছে, কেমন করে হয়েছে, কেমন ক'রে বদলাবে। ভগবানের স্পর্শ পেলে তখন সব-কিছুর চাবিকাঠিও তোমার মিলে যাবে। কেন হোল জানলে, কিভাবে হলো জানলে, বদলানোর উপায়ও জানবে।

করবারও কিছু আছে; কিছু কাজ, যা খুবই মনোরম। কতকটা বস্তুকে একত্রে ঘনীভূত ক'রে তুমি হয়েছ। ভিতরে ঢুকে যাও, চাবি খুঁজে বের করো। শুধু ভিতরে ঢোকাই দরকার। বলা চলবে না "এ ভারি শক্ত কাজ, আমার সাধ্যাতীত।" ক্ষুদ্র তুমি তোমারই মধ্যে ঢুকে যাও, দরজা খোলার চাবি মিলবে।

*

মে ১৩, ১৯৫৩

প্রশ্ন: কথাবার্তা থেকে—"কেউ কেউ ধ্যানে বসে এমন অবস্থায় গিয়ে পড়ে যে তারা বলে সে-অবস্থা খুবই চমৎকার ও মনোরম।"

সে কেমন অবস্থা হয়?

উত্তর: তা যেমনই হোক, তাদের পক্ষে তা খুবই চমৎকার ও মনোরম হয়। আর এই নিয়ে তারা নিজেদেরকে খুব বড় ক'রে দেখে, যেহেতু তারা নীরব নিথর হয়ে ধ্যানে

বলতে পারে ; আর চিন্তাকেও যদি থামিয়ে দিতে পারে, তাই মনে করে খুব উল্লেখযোগ্য জিনিস। কিন্তু সাধারণত তাদের মাথার মধ্যে চলে বিচিত্র-মুক্ত ক্যালিডোস্কোপের কাজ, সে তারা জানেই না। কেবল কিছুক্ষণের জন্য যদি না নড়ে না চিন্তা করে থাকতে পারে, তাকে তারা অসাধারণ বলে ভাবে। কিন্তু কেউ যদি তাতে বাধা ঘটায়, দরজায় টোকা দিয়ে বলে, "তোমাকে একজন ডাকছে," কিংবা বলে "তোমার ছেলেটা কাঁদছে," অমনি তারা খাপ্পা হয়ে বলে, "এঃ ধ্যানটা আবার ভেঙে দিলে, সব নষ্ট ক'রে দিলে।" আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বলছি। বেশ গম্ভীরভাবে তারা ধ্যান করে, কোনোরকম বাধা দেওয়া মোটে পছন্দ করেনা, দারুণ রেগে ওঠে। অবশ্য এ যে খুব আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ তা নয়। এদের ধ্যানের তৃপ্তিতে কোনো বিঘ্ন এলে সকলের উপরেই চটে উঠত।

অবশ্য কেউ কেউ জানে প্রকৃত ধ্যান করতে, কোনো ভাব নিয়ে নয়, কেবল নিস্তব্ধ এক আভ্যন্তরীণ নিবিষ্টতায়, তারা বলে এতে ভগবানের সঙ্গে মিলনের অবস্থাতে নিয়ে যায় ; সেটা ঠিকই হয়। আবার কয়েকজন একটা ভাবকে অনুসরণ করতে থাকে আর দেখে যে তার অর্থ কি হয় ; এটিও ঠিক জিনিস। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকে ধ্যানে বসে একাগ্রতা আনবার চেষ্টা করতে করতে আধঘুমন্ত হয়ে পড়ে, তা একটা তামসিক অবস্থা। ওতে জড়তা আসে, মনের জড়তা, বোধশক্তির অসাড়তা, দেহ অবশ। এমন অবস্থায় তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারে, কারণ জড়তার মতো দীর্ঘস্থায়ী আর কিছুই নেই। তোমাদের এ কথা বললাম, যাদের এমন হয় তারাই বলেছে। ধ্যান ছেড়ে এসে তারা মনে করে যে বাস্তবিকই কিছু বিশেষ রকমের কাজ হলো। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা জড়তা ও অজ্ঞানতার মধ্যেই অবস্থান করছিল। প্রকৃত ধ্যান করতে খুব কম লোকই জানে। তৎসত্ত্বেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে অনেক বছর চেষ্টা ও প্রয়াসের দ্বারা তুমি ধ্যান করতে সফল হয়ে চেতনভাবে ভগবৎ উপস্থিতির সান্নিধ্য পেলে এবং তার ফল এই দাঁড়াল বটে, কিন্তু সে ফল তোমার চরিত্রে এবং জীবনেও প্রতিফলিত হওয়া চাই। কিন্তু তা হয় বিভিন্ন ব্যক্তির বেলাতে বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এমন সুস্পষ্ট দুভাগে ভাগ হয়ে যায় যে—ধ্যানের সময়টিতে তারা ভগবৎ সংস্পর্শে এসে চূড়ান্তভাবে একাত্মবোধ করতে থাকে, কিন্তু যেমনি ধ্যান থেকে সাধারণ জীবনে ফিরে আসে অমনি নিতান্ত সাধারণের মতোই মামুলী রকমের সব-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। তার মধ্যে এমন লোককে আমি জানি যারা নিতান্ত অনুচিত কাজও ক'রে থাকে—যেমন অনর্থক বাজে গল্পে ব্যাপৃত থাকা, নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, ক্ষুদ্র সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ঝোঁক দেওয়া নিজেরটি ছাড়া পরের কথা তারা আদৌ ভাবে না, কখনো কারো উপকার করেনা, কোনো বড়ো আদর্শ তাদের থাকে না। অথচ ধ্যানের সময় তারা ভগবৎ সংস্পর্শ পেয়ে থাকে। তাই যারা দেখে যে দৈহিকের সঙ্গে জড়ানো এই বাহ্য প্রকৃতিকে বদলাতে পারা ও নিজেকে

উত্তরণ করতে পারা বড়ই কঠিন, তারা বলতে বাধ্য হয় : "ওটা করা সম্ভব নয়, চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, জগতে এসেছি মাটির দেহ নিয়ে, একে ফেলে যাবার জন্যে তৈরি হওয়া দরকার, জগৎ পড়ে থাক যেমন আছে ; এখান থেকে যত শীঘ্র সরতে পারি ততই ভালো ; সবাই যদি এমনি করে চলে যেতে পারে তাহলে এই জগৎটাও আর থাকবে না, এর কোনো দুঃখ কষ্টও থাকবে না।" যেন তাদের ইচ্ছাতেই সব-কিছু হচ্ছে, যদিও জগৎ তৈরির বেলাতে তাদের কোনো অংশই ছিল না।' কেমন করে জগৎ-ব্যাপারকে তারা বন্ধ করতে পারে ? অন্ততপক্ষে এর সৃষ্টির কাজে যদি তাদের হাত থাকত, তবু তাদের জানা থাকত যে কিভাবে একে গড়া হয়েছে আর কিভাবে একে ভাঙা যায় (যদিও গড়া যত সহজ ভাঙা তত সহজ নয়), কিন্তু এতে তাদের কোনো হাতই নেই, কেমন করে হয়েছে না জেনেই বলে ভেঙে ফেলার কথা, যেহেতু মনে করছে যে নিজেরা তারা পালিয়ে যেতে পারে। সেটাও সম্ভব বলে আমি মনে করি না। চেষ্টা করলেও তুমি পালাতে পারোনা। তবে তা হলো অন্য প্রসঙ্গের কথা। যাই হোক, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, (যা খুবই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, আমি এই ৫৩ বছর দেখছি যারা যোগ করে, এখানে ওখানে পৃথিবীর সর্বত্রই অনেক কিছু দেখেছি)—যে ধ্যান করলেই রূপান্তর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বরং তার বিপরীত হয় বলেই আমার বিশ্বাস।

তোমার কর্তব্য কাজগুলো করতে থেকে যদি তুমি ভগবানকে না ভোলো—তা যেমন কাজই হোক—তোমার কাজকে আর নিজেকেও যদি তুমি তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে দাও এমনভাবে যাতে তিনি তোমার প্রতিক্রিয়াগুলিকে পাল্টে দিতে পারেন,—যদি নিতান্ত স্বার্থপর, হীন, নুচ ও অজ্ঞান থাকার বদলে তিনি তোমাকে কিছুটা উদ্দীপ্ত ও উদার করে তোলেন তাহলে এমনি পথেই তোমার উন্নতি আসবে। শুধু তাই নয়, সাধারণ উন্নতির পথেও তুমি সহায়ক হবে। আমি এমন কখনো দেখিনি যে কেউ সমস্ত পরিত্যাগ করে অল্পবিস্তর শূন্য ভাবের ধ্যানে বসে (কারণ তা অল্পবিস্তর শূন্যই হয়।) কোনো উন্নতি করতে পেরেছে, অন্তত যদিও কিছু করে থাকে তা খুব সামান্য। কিন্তু আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা যোগ করছি বলে কোনোরূপ আস্ফালন না ক'রে উদ্যমের সঙ্গে এই আকিঞ্চন করতে থাকে যে জগতের উন্নতি হোক, জগতে ভগবানের অবতরণ ঘটুক, হৃদয়ে এই ইচ্ছা রেখে নিজেদের কাজ ক'রে যায়, আর ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য স্বার্থপরের মতো কামনা না করে অকুণ্ঠভাবে ভগবানে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দেয়। এদের বেলাতে দেখেছি অভাবনীয় উন্নতি, অত্যাশ্চর্য রকমের উন্নতি। কখনো বা তা চমকপ্রদ। আমি সন্ন্যাসীদের অনেক দেখেছি, মঠের উদাসীদের দেখেছি, যারা যোগী বলে পরিচয় দেয় তাদের দেখেছি, এদের এক ডজনকেও পূর্বোক্তদের একজনের সমান বলে আমার মনে হয়নি (অর্থাৎ জগতের উন্নতি ও রূপান্তরের দিক থেকে আমরা যেটা চাই, যাতে জগৎ আর

এমনটা না থেকে ভগবৎ-ইচ্ছা ও দিব্য চেতনার প্রকৃত যন্ত্রস্বরূপ হয়)। পালিয়ে গিয়ে কিছু বদলানো যাবে না, নত হয়ে নম্র হয়ে এখানে কাজ ক'রে যেতে হবে, উদ্যানের আগুন হৃদয়ে জ্বেলে, যা বরাবর জ্বলতে থাকবে নিবেদিত হোমশিখার মতো।

প্রশ্ন : তাহলে ধ্যান ক'রে বিশেষ কোনো লাভ নেই ?

উত্তর : তা নয়, যেমন ধ্যান তোমার দরকার তা আপনা হতেই আসবে। আপনিই কোনো কিছুর প্রেরণায় তুমি স্থির হয়ে বসে যাবে, কোনো ভাব নিয়ে বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পেয়ে তুমি একাগ্র হয়ে উঠবে। সে অবস্থা পেয়ে বসলে তুমি তাতে কোনো বাধা দেবে না। এতে তোমার যা উন্নতি হবার তা হবে। সে সময়ে তুমি দেখবে কিছু, বুঝবে কিছু ; তার পরে নিজের কাজে লেগে যাবে, যেটুকু মিলেছে তার জন্য কোনো দম্ভ না রেখে। যারা ধ্যান করতে পারে বলে নিজেদের অসাধারণ ভাবে তাদের আমি ভয় করি। ওটা সব চেয়ে মারাত্মক কারণ তাদের আত্মশ্লাঘা এত বেশি হয় যে তাতে উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখে।...একটা কথা সর্বদাই বলা হয়ে থাকে কিন্তু সর্বদাই তাকে ভুল বোঝা হয়— তা হলো বিনম্রতার প্রয়োজনীয়তা। ভুল অর্থ ক'রে এর প্রযুক্তি ভুল হয়। বিনত হও, কিন্তু ঠিক পথে, ভুল পথে নয়, তাতে কিছু ফল নেই। কিন্তু এখানে একটা জিনিস : এই অহংকারের আগাছা যদি বীজসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারো তাহলে কিছু কাজের মতো কাজ হবে। কিন্তু তা যে কতই কঠিন সে তো জানো। একটি কোনো ঠিক কাজ, ঠিক চিন্তা, একটু কিছু উন্নতি তুমি করতেই পারোনা নিজের মধ্যে ফেঁপে না উঠে, নিজেকে সে কথা না শুনিয়ে আর অহংকারে গর্বিত না হয়ে। ও জিনিসকে ভাঙতে হাতুড়িপেটা করতে হয়। আর তবুও তার ভাঙা টুকরো থেকে যায় যার থেকে আবার তা নতুন গজিয়ে ওঠে। ওকে উপড়ে ফেলবার চেষ্টায় সারা জীবনই লেগে থাকতে হয়, কারণ যারে যারে তা এমন চুপিসাড়ে গজায় যে কিছু জানা যায় না, তুমি ভাবো গেছে বুঝি, নম্রব হয়ে বলো "আমি তো কিছু করিনি, বোধকরি ভগবানই করেছেন, তিনি ছাড়া আমি কিছুই না", আর এমন কথা বললে ভেবেই আপনি খুশি হয়ে ওঠো।

প্রশ্ন : বিনত হবার ঠিক পথ আর ভুল পথ কি রকম ?

উত্তর : সেটা সোজা কথা, যখন বলি "বিনত হও" তখন লোকে ভাবে "অন্য লোকদের কাছে বিনত হও", এ হলো ভুল পথ। প্রকৃতপক্ষে বিনত হতে হবে ভগবানের কাছে, তার মানে নিখুঁত নির্দিষ্ট ও জীবন্ত রকমের বোধ যে তুমি কিছুই নও, কিছুই তুমি করতে পারোনা, কিছুই তুমি বোঝোনা ভগবানকে বাদ দিয়ে, আর যদিও তুমি খুব

বুদ্ধিমান ও করিতকর্মা হও তথাপি ভগবৎ চেতনার কাছে তা কিছুই নয়, আর এই ভাবটি নিত্য বজায় থাকবে এতে তোমার প্রকৃত একটা গ্রহিষ্ণুতা আসবে, এমন বিনম্র গ্রহিষ্ণুতা যে তাতে বিরোধী আত্মগর্ব একটুও থাকবে না।

প্রশ্ন : আপনি এখানে বলেছেন—"সমর্পণের পথ ধরলে ব্যক্তিগত প্রয়াস ছাড়তে হবে; তার মানে কিন্তু ইচ্ছার কাজ ত্যাগ করা নয়।"

কিন্তু একটা কিছু করতে হলেই ব্যক্তিগত প্রয়াস দরকার। তাই নয় কি? তাহলে এই ইচ্ছার কথাটা কি হলো?

উত্তর : ইচ্ছা আর চেষ্টাপ্রয়াসের মধ্যে একটা তফাৎ আছে, কারণ প্রয়াস মানেই হলো নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে নিজের প্রচেষ্টা; এতে বিলক্ষণ জোর লাগে, তা সময় সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে; কারণ তখন নিজের উপরেই একান্ত নির্ভর করতে হয়, মনে হয় যে একটা মিনিটও যদি চেষ্টাতে ঢিল দিয়ে ফেলি তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এরই নাম ব্যক্তিগত প্রয়াস।

কিন্তু ইচ্ছা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তার মানে ইচ্ছাটি মনে রেখে যা করছি তাতে একাগ্র হয়ে যথাসম্ভব ভালোভাবে তা করতে থাকলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না জানি যে কাজটা শেষ হলো। এ কথা তোমাদের বোঝানো কঠিন। মনে করো ঘটনাগতিকে কোনো কাজ তোমার হাতে এলো। ধরো, কোনো চিত্রকর প্রেরণা পেয়ে একটা ছবি আঁকার সংকল্প করলে। সে ভালোই জানে যে প্রেরণা ছাড়া, অর্থাৎ অন্য কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়া কেবল নিজের চেষ্টায় সে বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারবে না, তার ফল হবে একটা মামুলী জিনিস, ঠিক ভালো জিনিস নয়। এ কথা সে জানে। কিন্তু ছবিটা তাকে আঁকতেই হবে, যে কারণেই হোক। তখন সে যদি ব্যস্ত না হয়ে রং তুলি ক্যানভাস প্রভৃতি নিয়ে ভগবানকে ডেকে বলে, "তুমি এটা এঁকে দাও"। ভগবান অবশ্য তা করেন না। ঐ চিত্রকরকেই সব-কিছু করতে হবে; সে তখন আঁকার বিষয়টিতে একাগ্র হয়ে সব-কিছু সরঞ্জাম নিয়ে জিনিসটা যাতে অল্পবিস্তর গড়ে ওঠে এইভাবে তার সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে নিয়োগ করবে। ইচ্ছাটি তার সর্বদা জেগে থাকবে। অথচ মনের মধ্যে প্রেরণা পাবার জন্য নিজেকে সর্বদা উন্মীলিত রাখবে, একবারও ভুলবে না যে চিত্রবিদ্যা পুরোপুরি জানা সত্ত্বেও আর খুব হুঁশিয়ার হয়ে একটা আকার দিয়ে রং দিয়ে আঁকা সত্ত্বেও ভিতরে সমুচিত প্রেরণাটি যদি না পায় তাহলে তার ছবি হবে বাজারের লক্ষলক্ষ মামুলী ছবির মতো, বিশিষ্ট কিছু হবে না। সে একবারও ভুলবে না যে কি জিনিস সে প্রকাশ করতে চাইছে, আর কেবলই নিবিষ্ট থেকে অনুভব করবে যে কি ভাবে তা করা যায়। রং তুলি মডেল প্রভৃতি নিয়ে একটা কিছু নক্সা খাড়া ক'রে সে ভাবতে থাকে যে কি উপায়ে তাকে ফুটিয়ে তুলে প্রকৃত চিত্রে

বিকাশ করা যায় ; তখন সে প্রেরণার দ্বারস্থ হয়। কারো কারো অন্তর্দৃষ্টিতে তা স্পষ্টই এসে পড়ে। পরে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা সেই ইচ্ছাটি তার জেগে থাকে যাতে প্রথম প্রেরণাটি সে রূপ দিয়ে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। এখানে সে ভগবানের সহযোগিতা পেয়ে তাঁরই জন্য কাজটি করল, নিষ্ক্রিয় নয় কিন্তু সক্রিয় সমর্পণের দ্বারা তার কাজের মধ্যে ইচ্ছাক্রিয়াকে প্রয়োগ করে। এর ফল ভালোই হয়। চিত্রকরের দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এতে সে দেখতে পায় তাকে যা করতে হবে, এক দিব্যশক্তির প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে নিতে পারে, যা বর্ণনার অতীত। কবি লেখক ও অন্যান্য কৃতীদের বেলাতেও এই একই কথা।

(মা এর দু'দিন পরে তাঁর বুধবারের ক্লাশে পুনরায় এই প্রসঙ্গে বললেন)

শোনো আমার ছেলেমেয়েরা, যদি তোমরা নিজের থেকে বলো, "আমরা চাই যাতে জগতে ভগবৎ ইচ্ছা প্রকাশের যথাসম্ভব নিখুঁত রকমের যন্ত্র হয়ে উঠতে পারি", তাহলে তার জন্য কিছু শিক্ষা নিতে হবে, জ্ঞান পেতে হবে, উৎকর্ষ আনতে হবে। একখণ্ড নিরাকৃতি গোদা পাথরের মতো নিজের যন্ত্রটিকে ফেলে রাখলে চলবে না। পাথর দিয়ে কিছু গড়তে চাইলে তাকে কেটেকুটে আকার দিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হয়। অমার্জিত হীরকপিণ্ডকেও কেটে ছুলে দামী হীরাতে দাঁড় করাতে হয়। এও তাই। আপন মস্তিষ্ক ও দেহকে ভগবানের কাজের যন্ত্রে পরিণত করতে হলে তার তেমন উৎকর্ষ চাই, তাকে মার্জিত করে ধারালো করা চাই, ভিতরে যা অভাব আছে তার পূরণ করা চাই, তার পরিপূর্ণতা হওয়া চাই। এ সেই একই কথা। তোমার মস্তিষ্ক ও দেহকে যদি ভগবানের ভালো একটি যন্ত্র করতে চাও তাহলে তাকে শান দিয়ে ধারালো করতে হবে, শোধিত করতে হবে, অভাবগুলি পূরণ করে তাকে পাকা করতে হবে।

মনে করো নিজের ক্লাশে যাচ্ছ। যেতে ইচ্ছা না থাকলে বলো, "ওঃ। আবার সেই একঘেয়ে ক্লাশ,"—হয়তো প্রফেসর তোমাদের খুশি করতে জানেনা, ভালো প্রফেসর হলেও সকলে আনন্দ দিতে পারেনা, সেটা সহজ কথা নয়। আবার এমন দিন হয় যখন তাতেও ভালো লাগেনা। ক্লাশে না গিয়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা হয়। তবু যেতে হয় বলে যাও, কারণ খেয়াল মানতে গেলে সংযম থাকেনা, খেয়ালের বশেই চলতে হয়। তাই ক্লাশেই যাও। কিন্তু তখন, "ভালো লাগছেনা, আবার সেই অসহ্য ব্যাপার," ইত্যাদি কথা ভাবতে ভাবতে না গিয়ে যদি ভাবো, "জীবনে তো একটা মুহূর্ত বা একটা ঘটনাও বৃথা যায়না কোনো কিছু উন্নতি না দিয়ে, তাহলে আজকে কতটা কি হতে পারে? ক্ষুদ্র আমাকে আমি নিবেদন করছি। ভগবানের যন্ত্র হয়ে তাঁকে অভিব্যক্ত ক'রে যেন একদিন আমি রূপান্তরের উপযুক্ত হই। তাহলে কি করব? ক্লাশে যাচ্ছি কিন্তু উৎসাহ

নেই ; সে হয়তো আমার নিজেরই দোষ, মস্তিষ্ক-কোষে কিছু অভাব আছে। তা যদি হয় তো দেখতে হবে ; ক্লাশে অন্যমনস্ক না থেকে মন থেকে অসাড়তা ঘুচিয়ে মন দিয়ে শুনতে হবে। কেন আমার বিরক্ত লাগে ? উন্নতি নেই বলে। উন্নতির অভাবেই বিরক্তি আসে, ছেলে বুড়ো সকলেরই, কারণ উন্নতির জন্যেই জগতে আসা। তার অভাবেই একঘেয়ে লাগে, বেজার লাগে, ফূর্তি আসেনা। দেখা যাক ক্লাশে কি উন্নতি হতে পারে : যা জানিনা তা শিখে নেবো।"

শেখবার ইচ্ছা থাকলে প্রতি মিনিটেই শিখতে পারো। আমি নিজেও কত শিখি ছোটো ছেলেদের কথাবার্তা শুনে। প্রতি মিনিটেই কিছু না কিছু হতে পারে ; কেউ কিছু বলে ফেলতে পারে, এমন কি নির্বোধ লোকেও এমন কিছু বলে যায় থেকে তুমি উন্নতির ইঙ্গিত পেয়ে যাও। এ কথা জানা থাকলে জীবন কতই মনোরম হতে পারে। বিরক্তি আর থাকেনা, সবই সুন্দর ও আশ্চর্য মনে হয়, কারণ প্রতি মিনিটেই নতুন কিছু উন্নতি করতে পারো। যেমন, রাস্তায় যেতে যেতেও অন্যমনস্ক না থেকে তুমি চারদিকে লক্ষ্য রেখে চললে। আমার মনে আছে একবার আমি রাস্তায় চলেছি কোনো কাজে, হয়তো কারো কাছে যেতে বা কিছু কিনতে, যাই হোক। রাস্তায় চলা কিছু বিশেষ কথা নয়, কিন্তু যদি এটা লক্ষ্য করো যে, কে কেমনভাবে চলছে, কোথায় কেমন আলো পড়েছে, একটা গাছের ডাল কেমনভাবে এসে পরিবেশের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে, আলোতে কত কিছু ঝলমল্ করছে...এতেও প্রতি মিনিটে কিছু শেখা হবে ; শুধু শেখাই নয়, আমার মনে আছে সেদিন রাস্তায় এমনি যেতে যেতে হঠাৎ খুলে গেল একটা আলো, চোখের সামনে দেখি সুমুখ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটি মেয়ে, কী সুন্দর তার হাঁটা ! জানে বটে হাঁটতে, অপরূপ তার চলনভঙ্গী। তাই দেখে আমার তখনই মনে হলো গ্রীক সভ্যতার ভিতরকার উৎসের কথা, স্বর্গের সুন্দর যেন নিজেকে প্রকাশ করতে রূপ নিয়ে জগতে নেমে এসেছে—ঐ মেয়েটির হাঁটা দেখেই তার আভাস পাওয়া গেল। তবেই দেখ, এই সব সামান্য জিনিস থেকেও কতখানি লাভ হয়। সুতরাং অনর্থক স্কুলে যাচ্ছি না ভেবে (তোমরা যদিও কেউ হয়তো ভাবোনা, আমার ক্লাশে যারা আসে তারা কখনই নয়, হয়তো দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই তাদের ক্লাশে যার অন্য মতলব নিয়ে) যদি তার বদলে ভাবো যে কিছু উন্নতির জন্য যাচ্ছি, প্রত্যহই একটু নতুন কিছু উন্নতি—তাতে খুবই চমৎকার ফল হবে, এমন কি কিছুই আর একঘেয়ে থাকবেনা, হঠাৎ আবিষ্কার করবে যে প্রফেসরও একঘেয়ে নয়। এমনিই হয়। আর যদি জীবনকেও এইভাবে দেখ তবে জীবনও হয়ে ওঠে পরমাশ্চর্য। জীবনকে বিনোদী করবার পক্ষে এই হলো উপায়, কারণ বস্তুত পার্থিব জীবন উন্নতিরই ক্ষেত্র, সবচেয়ে ভালো উন্নতি করতে পারলে এ জীবনের সব চেয়ে বেশি সুফল পাবে। তাতেই মিলবে তৃপ্তি, কারণ যথাসাধ্য করতে পারলে তৃপ্তি তোমার আসবেই।

প্রশ্ন : তাহলে যদি বিরক্তি আসে, তার মানে কি উন্নতি কিছু আর হচ্ছেনা ?

উত্তর : হ্যাঁ, তখনকার পক্ষে তাই বটে, তাতে সন্দেহ নেই ; কেবল হচ্ছেনা নয়, উন্নতির সুযোগও তুমি হারাচ্ছ। এমন কিছু ঘটছে যা তোমার কাছে অবান্তর, অর্থহীন, বিরক্তিকর ঠেকছে, আর তার মধ্যেই তুমি রয়েছ ; তার মানে ঘটনাটা যত না বিরক্তিকর তার চেয়ে বেশি নিজেই তুমি বিরক্ত হয়েছিলে। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি উন্নতির মতো অবস্থায় ছিলেনা। এই যে বিরক্তির পর্ব আসে এর চেয়ে বেশি তোমার অস্তিত্বের হেতুর বিপরীত জিনিস আর কিছু নেই। ঐ সময়টাতে যদি নিজের মধ্যে চেষ্টা জাগিয়ে বলো "এতেও আমার শিখবার কি আছে ? এই অবস্থা আমাকে কি শিক্ষা দিতে পারে, কি উন্নতি এনে দেবে ? কোন দুর্বলতাকে এখানে জয় করতে হবে ? কোন জড়তাকে দূর করতে হবে ?" এমন ভাবতে শুরু করলে পরমুহূর্তেই দেখবে যে বিরক্তিটা আর নেই। তখনই উৎসাহী হয়ে উঠবে। এটি চেতনার সাধারণ কথা।

তারপর অনেকে বিরক্ত হবার ফলে এক ধাপ উপরে ওঠার বদলে এক ধাপ নীচে নেমে যায়। তখন নির্বোধের মতো, গোঁয়ারের মতো হীন ধরনের একটা কিছু ক'রে ফেলে নিজেকে আমোদ দিতে। মাতাল হয়ে নিজেকে আরো বিগিয়ে তোলে, স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে, মস্তিষ্কের অবনতি ক'রে আবোল তাবোল বকে। বিরক্তি থামাতে গিয়ে এতখানি অনিষ্ট করে। কিন্তু ওর বদলে যদি উপরে উঠতে চেষ্টা করতো তাহলে সেই ঘটনা থেকেই অনেক লাভ হতো। কিন্তু তা না হয়ে আরো নীচেই নেমে গেল। লোকে যখন কোনো বড়ো রকমের আঘাত পায়, কোনো দুর্ভাগ্য যখন আসে (অর্থাৎ লোকে যাকে "দুর্ভাগ্য" বলে, তেমন দর্ভাগ্য অনেকেরই হয়), তখন তারা প্রথমে সেটা ভুলতে চেষ্টা করে—যেন আপনা থেকেই শীঘ্র ভুলবে না। তখন ভোলবার জন্য তারা যা খুশি একটা ক'রে বসে। খুব কষ্টকর কিছু হলে মনকে অন্য দিকে ঘোরাতে যায়—এমন এক নির্বুদ্ধিতার কাজ ক'রে বসে যাতে চেতনা যায় নীচের দিকে নেমে, উপরের দিকে না গিয়ে।...খুবই দু:খের, খুবই কষ্টের ব্যাপার তোমার কিছু হয়েছে কি ? তাহলে পশুদের মতো তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে যেও না, নিশ্চেতনের মধ্যে ডুব দিও না ; তাকে ডিঙিয়ে তার পিছনে কি সত্য রয়েছে, কোন আলো শক্তি ও আনন্দ রয়েছে তাকে খুঁজে বের করো ; এর জন্য অবশ্য তোমাকে খুব কঠিন হতে হবে, নেমে যাওয়া কোনোমতে চলবে না। তবে এগুলো হলো পরের কথা, যখন তোমরা আরো বড়ো হবে তখনকার কথা।

প্রসঙ্গত

অগষ্ট ২৬, ১৯৬৭

কোনো ভক্ত প্রশ্ন করে—"মা, শোনা যায় যে ভালো হলে আর সত্যবান হলেই তার জয় হবে, কিন্তু জীবনে দেখি ঠিক তার উল্টো। যারা মন্দ তাদেরই হয় জয়, কোনো কষ্টই তারা পায়না।"

উত্তর (মা হাসলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন) দুটো জিনিসের মধ্যে লোকে সব সময়েই এমনি গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে।

"ভালো" বলতে লোকে যেমন বোঝে তার কথা ওখানে বলা হয় না, বিশ্বসত্য ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যা সত্য তারই জয় শেষ পর্যন্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জয় হবে ভগবানেরই। এই কথাই বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা সকলেই তাই বলেছেন—এই হলো আসল কথা। কিন্তু লোকে এ কথার অর্থ এমন করে যাতে তারা বলে : "আমি তো খুব ভালো ছেলে, যা সত্য বলে জানি তাই অনুসরণ ক'রে চলি, সুতরাং আমার সারা জীবনটাই নিবিঘ্নে কাটা উচিত।" (মা হাসলেন) প্রথমত, নিজের ভালো থাকা সম্বন্ধে নিজের যা ধারণা সেটা ঠিক কিনা সন্দেহজনক, তারপর বর্তমান জগতে সকল কিছুই মিশ্রিত ব্যাপার, অর্ধঅন্ধ মানব চেতনার কাছে প্রকৃত সত্যের বিধি সঠিক অভিব্যক্ত হতে পারে না—সে জিনিস তারা বুঝবে না। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, পরাৎপরের দৃষ্টি নিত্যই তার কাজ করছে, কিন্তু এই মিশ্রণে ভরাবাস্তবের জগতে মানুষের দৃষ্টি তাতে দেখতে পায়না যে ভালোর জয় হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের মতে যা ভালো এবং সত্য তা হচ্চেনা। কিন্তু (রহস্যচ্ছলে বলতে গেলে) ভগবান বেচারার তাতে কোনো দোষ নেই, দোষ মানুষেরই।

প্রশ্ন : সত্যের জগৎ যখন হবে তখন হয়তো এখনকার মতো সবই থাকবে, কেবল সব কিছু দেখাবে একটা স্বতন্ত্র রকম দৃষ্টিতে?

উত্তর : দুই রকমই থাকবে। পার্থক্য থাকবে। ভগবৎ ক্রিয়া যে বিকৃত রূপে দেখা যায় তা এখনকার জগতের অজ্ঞানতা ও অন্ধতারই জন্য ; এটাই স্বভাবত ঘুচতে শুরু হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পার্থক্য থেকেই যায়...যাতে তার অন্যরূপ অর্থ করা হয়—দুইই আছে জড়িয়ে (আঙুল জড়িয়ে দেখালেন)।

(নীরব থেকে)

সেই একই কথায় ফিরে আসতে হয় যে মানুষ করে ভুল বিচার—কারণ তার দেখাতেই থাকে ভুল, তার দেখা অপূর্ণ—তাই তার বিচারফলও ভুল।

জগৎ নিত্যই বদলাচ্ছে, চিরন্তন ভাবে, এক সেকেণ্ডও এক ভাবে নেই, আর একটা সাধারণ সঙ্গতির ধারা উত্তরোত্তর পূর্ণতর হয়ে উঠছে ; যদিও বাইরে তা দেখায় না কিন্তু কোনো কিছুই এক অবস্থায় থাকে না, সমগ্রভাবে সব কিছুই নিত্য এগিয়ে চলেছে, সঙ্গতি আরো বেশি সুসঙ্গত হচ্ছে, সত্য আরো বেশি সত্যরূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু তা দেখতে সামগ্রিক রকমের দৃষ্টি চাই, কিন্তু মানুষ কেবল...এমন কি সে এই মানব রাজ্যটাও দেখে না, সে দেখে কেবল নিজের টুকু, যা অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, আণুবীক্ষণিক আমিত্বের রাজ্য—তাই সে কিছু বুঝতে পারে না।

দুই জিনিসই জড়িয়ে সম্পূর্ণ হবে (আঙুল জড়িয়ে দেখালেন) একত্রে মিলে ; ভগবৎ অভিব্যক্তি যত চেতনতর ও পূর্ণতর ভাবে প্রকাশ পাবে ততই তা আরো বেশি সত্য হয়ে উঠবে। কিন্তু দুই জিনিসই চলবে একত্রে। (মা নীরব রইলেন)

এ কথা সেদিন স্পষ্টই দেখেছি যখন এই বিষয়ে জ্ঞানচেতনা এসেছিল : ভগবৎ অভিব্যক্তি যখন নিশ্চেতনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে, যার ফলে সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ উত্তরোত্তর বাতিল হয়ে যাবে, তখন নিশ্চেতনা আপনা হতেই বিলীন হবে, আর চেষ্টা ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে উন্নতি আসার পরিবর্তে তখন সঙ্গতির ভিতর দিয়েই তা হতে পারবে। ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে মানব-চেতনা এই জিনিসকেই দেখতে পায় নতুন দিব্যসৃষ্টির অভ্যুদয় বলে—তাতেও তা হবে কেবল একটা ধাপ মাত্র। কিন্তু এখনকার ধাপটি হলো এমন সঙ্গতি আসা যাতে বিশ্বোন্নতির ধারা (যা অবিরাম চলেছে) দুঃখ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চলার পরিবর্তে চলবে আনন্দ ও সঙ্গতির ভিতর দিয়ে...কিন্তু এই যে দেখছ অপরিণতির অবস্থা, কিছুই যেন পূর্ণ রকমের নয়, এটি অনেকদিন থাকবে যদি সময়ের হিসাবটা এই রকমই থাকে, তা বলতে পারিনা। কিন্তু সকল পরিবর্তনই তো সময়সাপেক্ষ, নয় কি ? এখন যেভাবে সময়ের হিসাব ধরে থাকি তা না ধরলেও, যা হবার তা সব-কিছুই তো পরে পরে হবে।

এই যত কিছু তথাকথিত সমস্যা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, মনের যত ধাঁধা (সবই অজ্ঞানতার ভিতরকার, নয় কি ?)—এ হলো মাটির তলাতে কেঁচোর সমস্যা। উপরে উঠে এলে তখন আর কোনো সমস্যাই থাকে না। বিরোধও আর থাকে না। দৃষ্টির অপূর্ণতা ও একত্রে সব দিক দেখার অক্ষমতা, এতেই আসে যত দ্বন্দ্ব বিরোধ।

কিন্তু পূর্ব প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, কোনো সাধু মহাপুরুষ কখনই বলেননি যে : ভালো হও, তাহলে পার্থিব জীবনে সবই তোমার ভালো হবে—কারণ তা হলো নির্বোধের মতো কথা। বিশৃঙ্খলার জগতে, অসত্যের জগতে তা আশা করাই অযৌক্তিক। তবে যদি তোমার সত্তার সকল অংশে যথার্থই ঐকান্তিক হও, তাহলে বাইরের ঘটনা যেমনই হোক, তোমার মিলবে আভ্যন্তরীণ আনন্দ, পূর্ণ সন্তোষ, কারো বা কোনো কিছুরই এমন শক্তি নেই যাতে তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারে।

শ্রীমা

পথের কথা

অগষ্ট ৩০, ১৯৬৭

গত কয়েক রাত্রিতে আমি প্রায় সারারাতই অনেক ঘন্টা ধরে এমন জায়গাতে কাটিয়েছি যাকে নিশ্চয় বলব সূক্ষ্মদেহের জগৎ, যেখান থেকে বাস্তব জীবনের সব কিছু ব্যবস্থা করা হয়। সে এক সুবিশাল রাজ্য—লোকসংখ্যা অগণিত, কিন্তু জনতার ভিড় নয়, সকলেরই আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ করতে হয়। প্রত্যেকের কাছেই কাগজপত্র ও লেখবার টেবিল, কিন্তু কোথাও দেয়াল টেয়াল কিছু নেই। সে ভারি এক অদ্ভুত জায়গা।

অনেকবারই ভেবেছি যে এ কি আমার নিজেরই বস্তুজগতের স্মৃতি থেকে এমন দেখাচ্ছে কিংবা প্রকৃতপক্ষে এটা এই রকমই জগৎ? ভালো করে দেখে অনেক সময় সন্দেহ দূর হয়েছে, আবার কখনো কখনো সন্দেহ জেগেছে নিজেরই স্মৃতির কাজ বলে। কিন্তু ঐ সময়ে আমি খুবই সচেতন হয়ে থাকি আর দেখি যে সমস্তই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বাধীন ব্যাপার; একই জিনিস যথাস্থানে বারে বারে দেখি, তার মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া, যা কাজের মধ্যে হতেই পারে। তবু সব দিকে মিলে যায়, অর্থাৎ এলোমেলো কল্পনার খেলা নয়। কিন্তু কতটা পর্যন্ত তা স্বাভাবিক, কিংবা আমি দেখছি তাই? এখন ঠিক করে বলা যায় না। যখন অধিমানসের রাজ্যে গিয়ে দেবতাদের দেখেছিলাম তখনও আমার এমনি মনে হয়েছিল; তখনও ইতস্তত করে ভেবেছি যে ওরা বাস্তবিক ঐরকম কিংবা পৃথিবীর অভ্যাসহেতু ঐরকম দেখছি। তখন একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, কিন্তু এখানকার বেলাতে বাস্তবের দিক থেকে...

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার যে কোথাও কোনো দরজা নেই, জানলা নেই, ছাদ নেই, মেঝে নেই, অথচ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে উড়িয়ে দিয়ে সব কিছু ঠিক ঠিক জায়গাতে রয়েছে, মাটির দিকে আকর্ষণ নেই, লেখবার সময় কাগজ কলম সব ঠিকই আছে, ফাইল বাঁধা কাগজের তাড়া রয়েছে—মনে হয় যে এ তো ঠিক জিনিস নয়, কিন্তু চেহারায় দেখতে প্রভেদ প্রায় কিছুই নেই। সেই সব দেখে শুনে এখনও মাঝে মাঝে ভাবি সত্যিই দেখছি না মস্তিষ্কের ক্রিয়াতে দেখছি?

প্রায় সকলকেই সেখানে দেখতে পাই। বলেছিলাম তাই যে তোমরাও সেখানে নিয়মিত যাও, সকলে মিলেই আমরা সেখানে কাজ করি। তবে তা তোমাদের স্মরণ থাকে না। কেউ কেউ কিছু স্মরণ রাখে, কিন্তু তাদের স্মৃতি একটু বেঁকে যায় (মা আঙুল বেঁকিয়ে দেখালেন), অর্থাৎ সেখানে যেমন দেখেছি তেমনটি থাকে না। তারা যখন বলতে যায় তখন তাদের মন হয়তো তেমনি বাঁকা প্রতিলিপি বানায়। ...বাস্তবের জগতে এসে যেমন একই জিনিসকে দশবার দেখি একই রকম, শুধু একটু স্বাভাবিক ব্যতিক্রম ছাড়া, এখানেও

ঠিক তাই ; আর লক্ষ্য করলে দেখবে যে বাস্তবের জগতেও দুজন মানুষ কোনো জিনিসকে এক দৃষ্টিতে দেখেনা। সেখানে হয়তো এটা আরো কিছু বেশি হয়, কিন্তু ব্যাপার একই। এর অর্থ সহজ হবে সেই চেতনাতে প্রবেশ করলে যেখানে বাস্তবই হয় মায়া, স্থূল বাস্তব থাকেনা। আভ্যন্তরীণ বাস্তবতাই বেশি সত্য। সুতরাং তা সহজ। কেবল মনই আমাদের বিস্মিত হয়ে ওঠে।

যেমন লেখার সম্বন্ধে। অত নিখুঁতভাবে লক্ষ্য না করলেও দেখেছি যে লেখার কাজ সেখানে অতি সহজেই হয় ; অল্প সময়েই কাগজের উপর লেখাগুলো হয়ে গেল, কিন্তু তা কি ঠিক কাগজই বটে ? ঠিক কাগজের মতোই দেখায়, আর লেখাগুলো তাতে সরাসরি হয়ে যায়।...একটা নিব আছে যেন, কলম বা পেনসিল নিয়েই লেখা হচ্ছে, যথার্থ কলম বা পেনসিল না হলেও অবিকল তারই মতো। কিভাবে বলা যায় ? বাস্তবেরই যা হুবহু সত্তা। অর্থাৎ এখনও যদি আমরা সেই আগেকার কালের কালিতে পালকের কলম ডুবিয়ে লেখার যুগে থাকতাম তাহলে তাও ঐরকমই দেখতাম। যা দেখি তা বাস্তবেরই স্মৃতির প্রতিরূপ, তার চুম্বকের মতো।

কিন্তু যা হয় তা সক্রিয়। বাস্তবের চেতনায় যখন ফিরে আসি তখনই সময়টা দেখে নিতে অভ্যাস করেছি (আমার বিছানার পাশে ঘড়ি থাকে তাই দেখি) সুতরাং ঠিক ঠিক সময় বলতে পারি—এটা ছিল একঘন্টা, ওটা ছিল দু'ঘন্টা ; সেখানে কিন্তু সময়ের হিসাব নেই যেমন এখানে আছে, কাজের পরিমাণ নিয়েই সেখানকার কথা, ঐ ঘন্টাগুলির মধ্যেই অনেক অনেক কাজ হয়ে যায়। সেখানে নিত্য নিয়মিত তোমাদের সকলকেই দেখি, আরো অনেককে দেখি, আর এককালেই অনেক স্থলে থাকি। কেউ যখন বলে "কাল রাত্রে তোমাকে এখানে দেখেছি, তুমি এই সব করছিলে", আবার অন্যখানেও তখন ছিলাম, তখন অতএব বলি : "হাঁ ঠিক বলেছ", কেবল একটু বাঁকা ধরণের বলা হলেও (আঙুল বেঁকিয়ে দেখালেন) আসল কথাটা কিন্তু একই।

এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে দৈহিকের খুব কাছাকাছি যেগুলি দেখা, সেগুলি হঠাৎ জেগে উঠলে তখনই সব মিলিয়ে যায়, বিশেষত নড়াচড়া করলে বা পাশ ফিরে শুলে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত না নড়ে চুপচাপ ভিতরের দিকে চুকে গেলে তখন ধীরে ধীরে সবই আবার ফিরে আসে। সুতরাং অনেকের যে স্মরণ থাকেনা এটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়। মনের প্রাণের অনুভূতি সহজে স্মরণ থাকে, কিন্তু যা দৈহিকের কাছাকাছি...

আর সে সব এমন ধরণের ব্যাপার যে তখন জাগরণের চেতনা যদি বজায় থাকে তাহলে নিজেকে পাগলের মত মনে হবে। দুদিন আগেই সেটা জেনেছি এবং তাতে অনেক কিছু শিখেছি—অনুধাবন ক'রে বুঝে নিয়েছি। অপরাহ্নের বিশ্রামের সময় (তখন ঘুমোই না, আভ্যন্তরীণ চেতনাতে চলে যাই) আমি স্থির করেই রাখলাম যে ঠিক অমুক সময়ে আমি জাগবো

অর্থাৎ উঠে বসবো ; সেই নির্দিষ্ট সময়টি যখন এলো তখন আমি ঐরূপ অবস্থার চেতনাক্রিয়ার মধ্যেই আছি, কিন্তু চোখ আমার তখন খুলে গেছে, তেমন অবস্থাতে আমি...''আমি'' বলা ঠিক হলোনা কারণ এই ''আমি'' তখন নেই, তখন আমি অনেক জন; কিন্তু তখনকার সেই ''আমি''র কাছে থাকে, একটি সোনার ঘড়ি (বাস্তব জগতে নয়, সেইখানে) কিন্তু সে ঘড়িটা তখন হাতে নেই, পরতে ভুলে গেছি ; তাই বলে ফেললাম ''আমার ঘড়ি কোথায় ? গেল কোথায় ? কেন এমন ভুল হয় ?'' তারপর জেগে দেখি দুই চেতনাই একত্রে চলছে, তাই বলার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম যে চেঁচিয়ে বলছি : ''ঘড়ি কোথায় ? ভুলে গেছি পরতে।'' (মা হাসলেন) তখন স্থির থেকে লক্ষ্য করলাম দুই চেতনা একত্রে চলছে (এক হাতের উপর অন্য হাত রাখলেন)।

এ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা। এতে অনেক কিছু প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। যেমন, যাদের উন্মাদ বলা হয় তারা অনেক স্থলেই এমনি সূক্ষ্ম ভবন অবস্থার মধ্যেই চলে যায় (হাতের উপর হাত রেখে), এবং তখন যা বলে তার এখানকার জগতে কোনো মানে হয়না, কিন্তু ওখানকার জগতে তার কিছু মানে আছে, চেতনা এই প্রকারে একত্রিত কাজ করছে (হাত মিলিয়ে দেখালেন), অনেক তথাকথিত উন্মাদোক্তির এই হলো অর্থ। আবার মিথ্যা খলতাও আছে, তাও এই ধরণের, কারণ চেতনা স্পষ্টই দেখছে যে ঐ দৈহিকের কাছাকাছি রাজ্যে যা দেখা যাচ্ছে তা একই জিনিস ও একই তার নাম, কিন্তু এখানে তাকে ''প্রাণিক বাস্তব'' বলা যায়না, কারণ মূল বাস্তবে ঠিক তাই নয়। সুতরাং মিথ্যা খলতা এসে পড়ে, দুরকম চেতনাধারা এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যায় যে বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ওঃ। সমগ্র রাজ্যই পরিষ্কার হয়ে গেল (আমার কাছে), শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাকে সারিয়ে দেবার ও রূপান্তরিত করবারও উপায়। আভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সব কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা মিলে গেল। এতে প্রকৃত মানসিক বৈকল্য বৈলক্ষণ্য ও মিথ্যাবাদিতার সংখ্যা অনেক কমে যায়—অর্থাৎ যেখানে জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক প্রকৃত কথার বিপরীত জিনিস বলা হয়, সেখানে তা আর ততটা হতে পারেনা। অনেকেই এমনি উড়ো উড়ো (হাত নেড়ে ওড়ার ভঙ্গি করলেন) বেঠিক কথা বলে, কিন্তু তার কারণ তারা অবাস্তবের রাজ্যে যা দেখেছে, এখানে ঘনভাবে মিশ্রণ হয়ে যাওয়াতে পার্থক্য বেছে নিতে পারেনা।...শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, ''খাঁটি অশুভ কামনা, খাঁটি বিরোধিতা, খাঁটি মিথ্যা জগতে খুবই বিরল, কারণ তা হতে গেলে হওয়া চাই পুরোপুরি সজ্ঞানে, সচেতনে ও পুরোপুরি ইচ্ছাতে—সেটা খুবই বিরল।'' আর অনেকেই বলা যায় বিরোধী সত্তা। কিন্তু বাকী সব-কিছু চেতনার একরূপ মরীচিকা—চেতনার কাটাকাটি (মা তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলি বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘর্ষণ করে দেখালেন) যেখানে দুরকম চেতনার বিভিন্নতার স্পষ্ট প্রভেদ করতে না পেরে একত্রে মিশে এমন হয় (পুনরায় আঙুল-ঘর্ষণ), পরস্পর কাটাকাটি।

(নীরব থেকে) এতে দেখা গেল যে এ সমস্যার মীমাংসা করে রূপান্তর আনা কি বিরাট ব্যাপার। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে অনেকটা সোজা কথা এবং তাড়াতাড়ির কাজ হতে পারে, কিন্তু (আপন দেহ দেখিয়ে) এই স্থূল জিনিসের বেলাতে, যা নাকি বস্তুপিণ্ড, ওঃ! এ একটা মস্ত জগৎ। এর যা এক একটি শিক্ষা নেনে, তা খুবই উল্লেখযোগ্য ; প্রত্যেক শিক্ষাটির মানে আছে, তার একটা পরিণাম আছে ; একদিন যায়, দুদিন যায়, সামান্য একটু আবিষ্কার আসে। তার কয়েক ঘন্টার ক্রিয়ার পরে দেখা যায় যে দেহচেতনাতে আলো এসেছে, আগের আলো পাল্টে গেছে, তার প্রতিক্রিয়া আর একই রকম নেই, কিন্তু...(মা নীরব ভঙ্গীতে বোঝালেন যে বিস্তর ব্যাপার সেখানে)।

এর পরে ভগবৎ-উপস্থিতির কথা, তা উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর হয়ে ওঠে, কোনো কোনো সময় বৃহৎ হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে (হাত দিয়ে স্ফীতি দেখালেন), মনে হয় একদম পাকা, পরে আবার ঢাকা পড়ে যায় (হাত দিয়ে ঢাকলেন), তখন অন্য চেতনা এসে পড়ে, আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে হয়।

খুবই চমৎকার ব্যাপার।

এতে দেখা হয় অনেক...বড়ো দরের কথা, মনোভাব, অনুভূতি, সবই ভালো ওখানকার পক্ষে, কিন্তু এখানে...তেমন বড়ো কিছুনা—সবই শান্ত, পিষ্ট, ধোয়া মোছা।

আর তাই হলো উন্নতির পথ, রূপান্তর আসার পথ।

এই পর্যন্ত, বুঝলে বাছা ?*

শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S. A. I. C. E-থেকে। অনুবাদক—পঙ্কপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

বিমানবাহিনীর গল্পের রস সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার গল্পের রসের সাথে মেলে না। বিমানবাহিনীর গল্পে দেখা যায় নায়ক ঠাট্টা-তামাসা ও দুর্জয় সাহসের সাথে অসম্ভব সমস্ত কাজ অবিচলিত চিত্তে সম্পন্ন করে বা সেই অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করিতে গিয়া তাহার জীবনের শেষ গল্প অদৃশ্য লিখনে সমাপ্ত করে। কাজ যদি সুসম্পন্ন হইল, তাহা হইলে শত্রু মিত্র সকলের নিকট বাহবা সে অর্জন করিল। আর যদি গল্প শেষ হইয়া গেল, তবে সেই গল্পের নায়কের জন্যে তাহার বন্ধু—দলীয় বা শত্রু সকলেই—আন্তরিক দুঃখে এক রাত্রি অতিবাহিত করিল। আন্তরিকতা যত গভীর, দুঃখ ভুলিবার প্রয়াস তত বেশিই। দুঃখ-ভোলার ঔষধ পান না করিলে দুঃখ ভোলা সম্ভব নয়। দুঃখ কিন্তু ভুলিতেই হইবে। কেননা পরম মিত্র যে কাজ আজ সম্পূর্ণ করিতে গিয়া জীবন দিল, আগামী কাল সে কাজ যে আমাকেই সুসম্পন্ন করিতে হইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকিলে হাসিয়া খেলিয়া অবহেলার ভান করিয়া অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করা ত সম্ভব হইবেই না, উপরন্তু হয় ভুল কাজ করার মাশুল হিসাবে জীবন দিতে হইবে নয়ত কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া আসার জন্য শত্রুমিত্র সকলের নিকট সাহসের অভাব বলিয়া দোষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। সেইজন্য সকল দেশের বিমান-বাহিনীর সব গল্পেই দুঃখ-ভোলা ঔষধের উল্লেখ এত বেশী। বিমানবাহিনীতে দুঃখ-ভোলা-ঔষধ পানে সত্য সত্যই কেহ নিজের উপর আয়ত্ত হারাইয়া মাতাল হইয়াছে এ পর্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু বহুবার দেখিয়াছি, সামান্য মাত্র দুঃখ ভুলিয়াই যাহাকে অপছন্দ তাহার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে, প্রথমে অবশ্যই মৌখিক এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শারীরিক। সাধারণের ভাষায় যাহাকে ভদ্রতা বলে, সেই মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া মধ্যযুগীয় বিচার-পন্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে সকলকেই দেখিয়াছি দুঃখ-ভোলা ঔষধ পানে নিজের উপর আয়ত্ত হারাইয়া মাতাল হওয়ার ভান করিতে। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর কঠিন তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও আমাদের স্কোয়াড্রনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম দিকে হয় নাই। কিন্তু প্রাত্যহিক অনুশীলনের ফলে স্কোয়াড্রনের সকলেই বুঝিতে পারিল, কি কঠিন কাজের জন্য আমরা মনোনীত হইয়াছি এবং সে কাজ সুসম্পন্ন করিতে হইলে সকলকেই এক মনোভাবে একযোগে কাজ করিতে হইবে। এ অবস্থায় অন্য কাহাকেও বিচার করা চলে না, চলে শুধু অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া তাহার সহিত সহযোগিতায়, একযোগে কাজ করার। কিছুদিনের মধ্যেই স্কোয়াড্রনের গঠনে সুশৃঙ্খলা দেখা যাইতে লাগিল।

এইবার আর একটা ঘটনার কথা বলা যাক। নিকটস্থ অন্য এক ছোট সহরে লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথি ছিলেন সিভিল সার্জন। তাঁহার পুত্র পাইলট অফিসার টিথি আমাদের স্কোয়াড্রনের বি ফ্লাইটের একজন পাইলট। লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথি তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসহ বাস করেন। এক রবিবার ছুটির দিন কয়েকজন বৈমানিক পাইলট অফিসাররা টিথির সহিত, লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথির বাড়ীতে গিয়া আদর আপ্যায়ন উপভোগ করিয়া আসিলেন। তাহার পর প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের মধ্যে কেহ না কেহ সেখানে যাইতেন এবং কয়েকঘন্টা সময় অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। উদ্দেশ্য সকলের বেলায় এক ছিল। লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথির বিদুষী ও সুন্দরী কন্যা রত্নটি। আমাদের স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের মধ্যে পাইলট অফিসার সর্দার সিংহই বোধ হয় সকলের তুলনায় বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যেকবার বিমান উড়াইবার মহড়া দেওয়ার সময় তিনি বিমান লইয়া লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথির সহরে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার বাঙ্গলোর উপর দিয়া বিমান উড়াইয়া লইয়া যাইতেন। এবং সময় ও সুবিধা থাকিলেই কখন কখন উড়িয়া যাওয়ার সময় বিমানের কায়দায় বাঙ্গলোর অধিবাসীদের সেলাম করিয়া যাইতেন। পাইলট অফিসার সর্দার সিংহের সাথে সার্জেন্ট ঘোষ ছিলেন একাধারে নেভিগেটর গোলন্দাজ এবং বেতারবার্তা পরিবেশনকারী।

একদিন পাইলট অফিসার সর্দার সিংহের পুলকের মাত্রা সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল। সেদিন তিনি লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথির বাঙ্গলোর প্রায় দশ হাজার ফিট উপরে আসিয়া ডাইভ বম্বিং ভঙ্গিতে একেবারে সোজা নামিয়া আসিলেন। প্রথমবার প্রায় হাজার দুয়েক ফিট মাটির উপরে থাকা কালে বিমানটিকে সোজা নামিয়া আসার ভঙ্গি হইতে ফিরাইয়া উপরে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার কিন্তু প্রথমবারের তুলনায় অনেক নীচে নামিয়া আসিলেন। সাথে অন্য কোন বিমান ছিল না। কাজেই তাঁহার এই দুঃসাহসিক কাজে বাধা দেওয়া বা না বলার জন্য কোন মিত্র নিকটে ছিলনা। এবারও বিমানের গতিমুখ পরিবর্ত্তন করাইয়া পুনরায় উঠিয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বিমান উড়াইয়া লইয়া গেলেন।

তৃতীয়বার কিন্তু অঘটন ঘটিয়া গেল। বিমান সোজা নামিয়া আসিল সত্যই, কিন্তু বিমানের গতির আর মোড় ফিরিল না। লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিথির গোয়াল ঘরের পাকা মেঝে ভেদ করিয়া বিমান সহ দুইজন বৈমানিক মাটির মধ্যে বিমানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত প্রোথিত হইয়া গেল। পাইলট অফিসার সর্দার সিংহ সোজা বিমান নামিয়া আসার ভঙ্গি হইতে উঠিয়া যাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা বা জ্ঞান-হীন অবস্থায় চালকের আসনে অবস্থিত ছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় রাখিয়া গেলেন না।

অবান্তর হইবে না বোধে একটা কথা এখানে বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বিমান প্রচণ্ড গতিবেগে উড়িয়া যাওয়ার সময় যদি বিমানের দিক হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা হয়

তবে সেই গতির দিক পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত শুধু বিমানের অংশগুলির উপরই চোট লাগে না, বিমানের আরোহীদের উপরেও এই-দিক পরিবর্ত্তনের জন্য প্রচণ্ড আঘাত আসে। বিশেষত সোজা নামিয়া আসার ভঙ্গি হইতে বিমানকে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেলে, চালক এবং অন্য আরোহীদের উপর আঘাত এত তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা যে, অনেক সময় চালক এবং অন্য বৈমানিকরা একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতে পারে। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই অবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে এবং বৈমানিকদের ভাষায় ইংরাজিতে বলা হয় "black out." পাইলট অফিসার সর্দার সিংহ ব্ল্যাক আউট হইয়া গিয়াছিলেন কিনা সেকথা জানিবার উপায় রাখিয়া গেলেন না।

পাইলট অফিসার সর্দার সিংহের বিমান-কসরৎ দেখান সুরু করার আরম্ভ হইতেই লেফ্‌-টেনান্ট কর্ণেল চিবি স্ত্রী ও কন্যা সহ তাঁহাদের বাঙ্গলোর উঠানে দাঁড়াইয়া সব কসরৎগুলি দেখিতেছিলেন। গোয়ালঘরের নধ্যে বিমান সহ দুইজন বৈমানিক প্রোথিত হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়া সব দেখিতেছিলেন। এবং প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের বিশ্বাস হয় নাই। সম্বিৎ ফিরিয়া আসা মাত্র লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল চিবি দৌড়াইয়া গোয়াল ঘরের দিকে গেলেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ বিমানের খোলে তখনও পেট্রলের বা তৈলের জন্য আগুন লাগে নাই। বিমানের মধ্যে গোঙানি শুনিয়া তিনি বাহির হইতে কুড়াল দিয়া বিমানের খোলের কিছুটা অংশ কাটিয়া ফেলেন এবং সার্জেন্ট ঘোষকে শারীরিক অক্ষত অবস্থায় বাহির করিয়া লন।

পাইলট অফিসার সর্দার সিংহের চেহারা দেখার পর তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া টেলিফোন যোগে আমাদের স্কোয়াড্রনে সংবাদ পাঠান। সংবাদ পাওয়া মাত্র স্কোয়াড্রন হইতে কয়েকজন বৈমানিককে পাঠান হয়।

এই দুর্ঘটনার প্রথম হইতে শেষ পর্ব পর্য্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি অংশগুলিই তাঁহাদের তিন-জনের মানস দৃষ্টিতে চিরকালের জন্য রহিয়া গেল।

সার্জেন্ট ঘোষকে পেশাবর ফৌজী হাসপাতালে পাঠান হয়। পাচ-ছয় মাসে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া তিনি পুনরায় আমাদের স্কোয়াড্রনে যোগ দেন। সার্জেন্ট ঘোষের গল্প এইখানেই শেষ নয়। যথাস্থানে তাঁহার গল্প পুনরায় বলিতে হইবে। বারে বারে সাত বার তিনি বিমানসহ ভূপতিত হন। সাতবারের বার তাঁহার জীবনের সব গল্প শেষ হয়। কিন্তু প্রত্যেক বার দুর্ঘটনার পর মনে হইত এইবারেই শেষ—কিন্তু কি দুর্জ্জয় সাহস যে তাঁহার ছিল তাহা বলা অসম্ভব। প্রত্যেক দুর্ঘটনায় তাহার শরীরের কোন না কোন অঙ্গ আঘাতে পঙ্গু হইত। কিন্তু তাঁহার মানসিক শক্তি এতই ছিল যে কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পরই পুনরায় তাঁহার শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত অংশ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া যাইত। এবং একদিন সকালে হাঁসপাতাল হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন,

ডাক্তাররা উড়িবার কাজে পূর্ণমাত্রার উপযুক্ত বলিয়া পুনরায় তাঁহাদের মত দিয়াছে। সকলের কথা, উপদেশ বা অনুরোধ না মানিয়া পুনরায় উড়িবার কাজেই যোগ দিতেন। সব সময়ই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। আমরা অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতাম ঘোষ এবং হাসি দুইয়ে মিলিয়া এক অভিন্ন ব্যক্তি।

গোয়ালঘরের সাথে একটি মুলতানী গাই বিনষ্ট হওয়ার দরুণ লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল টিমিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিমান বাহিনী আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তাঁহার কন্যার যে ক্ষতি হইল, সেই কথা বিবেচনা করিয়া তিনি ক্ষতিপূরণের কথা একেবারে নাকচ করিয়া দেন।

এই ঘটনার পর গ্রুপ হেড্ কোয়ার্টার পেশাবর হইতে কড়া হুকুম আসিল। বিমান উড়ানর শিক্ষার সময় কেহই লোকালয়ের উপর সোজা নামিয়া আসিলে কঠোর শাস্তি পাইবে। সোজা অবতরণের মহড়া দেওয়ার জন্য কতকগুলি জনমানবহীন এলাকা গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টার হইতে নির্দ্দিষ্ট হইল। এই নির্দ্দেশের সাথে আর একটা কথাও তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিলেন। বিমান উড়াইবার কৌশল প্রত্যেক বৈমানিক আয়ত্ত করিবে তাহার নিজের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য, বন্ধু বা বান্ধবীদের দেখাইবার জন্য নয়। যদি কোন বৈমানিক এই নির্দ্দেশের হুকুম অমান্য করিয়া তাহার বন্ধু বা বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে বিমানের খেলা প্রদর্শন করে তবে তাহাকেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

সব দেশের বিমান বাহিনীতেই এই প্রকার কঠোর শাসনের আইন ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় সব দেশের বৈমানিকরাই সময় কালে সংযম হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের বন্ধু-বান্ধব বা নিকট আত্মীয়দের তাহাদের অর্জিত বিমান উড়াইয়া খেলা দেখাইবার কৌশল প্রদর্শন করে এবং যখনই তাহার ক্ষমতার মাত্রা অতিক্রম করে তখনই অঘটন ঘটিয়া যায়। তাহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সবাই সাবধানে থাকে। পরে আবার সে সব কথা ভুলিয়া যায় এবং তাহার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য উৎসুক হয়।

আমাদের ছাউনির চতুর্দিকেই গমক্ষেত। শীত বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। গমক্ষেত গুলিও সেই সাথে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিমান হইতে গমক্ষেতগুলি অতি সুন্দর দেখাইত। বিশেষত সেই গমক্ষেতগুলি যদি হাওয়ায় আন্দোলিত হইত।

ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে?

ধানের পরিবর্তে গম বলিলেই হইল। আর বাতাস? গমক্ষেতকে পিছনে রাখিয়া বিমানের এঞ্জিন চালু করিলেই আর বাতাসের অভাব রহিল না। শুধু বাতাস উৎপাদন হইল কৃত্রিম উপায়ে প্রপেলারের ঘূর্ণনের তেজে। কৃত্রিম উপায়ে গম ক্ষেতের উপর বাতাস চলার সময়ে

আকাশ বনণে রত থাকিলে দৃশ্য আরও মনোরম বোধ হইত। কেননা চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গমক্ষেত। সেই বিস্তারের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিমিত গমক্ষেত হাওয়ায় আন্দোলিত হইয়া ঢেউয়ের মত চলিয়াছে। বস্তুতঃ গমক্ষেত চলিতেছে না—চলিতেছে ঢেউ কিন্তু মনে বিকার আনিয়া দিতেছে যেন গমক্ষেতগুলি ঢেউয়ের আকারে আন্দোলিত হইয়া একদিকে সরিয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য আরও মনোরম বোধ করিয়াছি অতি ভোরে বা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে, যখন সূর্যের আলো প্রখর হইয়া উঠে নাই অথবা আলোর প্রখরতা স্তিমিত হইয়াছে। আলোর তীব্রতা বোধহয় কোন দৃশ্যের সৌন্দর্য বিকাশের জন্য হানিকর। সৌন্দর্যে যদি কোন খুঁত থাকে তবে আলোর প্রখরতা সেই খুঁতকেই প্রকট করিয়া প্রকাশ করার প্রয়াস পায় আর স্তিমিত আলোয় খুঁত চারিদিকের আবছা অন্ধকারের সাথে মিলিয়া তার খুঁতরূপ প্রকাশ করিতে পারে না বরং আবছা আলো-অন্ধকারে একটা নূতনরূপে আবির্ভূত হইয়া মোহিত করে। এই কারণেই বোধ হয় সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে বিমানের এঞ্জিন চালাইয়া হাওয়ার ঝড়ে গমক্ষেতকে আন্দোলিত করিয়া গমশীষগুলিকে ঢেউয়ের আকারে দোলাইবার দৃশ্য এত ভাল লাগিত এবং এখনও মনে আছে।

শীত ক্রমে ক্রমে জমিয়া উঠিল। সূর্য্য ওঠার পূর্বে বিমানের নিকট গেলে চমৎকার দৃশ্য নজরে আসে। বিমানের ডানার উপর রাত্রে যে শিশিরপাত হইয়াছে, ভোরের ঠাণ্ডায় সে শিশিরকণাগুলি জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে; ডানার উপরভাগে পাতলা উড়ানির মত আর ডানার চালুর শেষে, যেখানে রাত্রে পড়া শিশিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি একত্র হইয়া শিশিরবিন্দুর আকার হইয়াছে, এইবার শিশিরবিন্দু অর্থাৎ জলবিন্দু ডানার চালু কিনারা হইতে ফোঁটার আকার হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, সেইখানে ভোরের শীতের স্পর্শে জলবিন্দু বরফবিন্দু হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, যেন দানা দানা মুক্তা বিমানের ডানার চালুর কিনারার তলায় কেহ পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এ যেন পুরাকালের গল্প, কাহার দর্শনে জীবন্ত-মানুষ পাথর-মানুষে পরিণত হইল; তেমনি জলবিন্দু মুক্তাবিন্দুতে রূপান্তরিত হইল।

স্কোয়াড্রনে বিমানের সংখ্যা তখনও পূর্ণ হয় নাই। প্রায়ই কেরী পাইলটরা একখানা করিয়া বিমান পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেছিল। নূতন বিমান আসামাত্র সার্ভিসিং বিভাগে বিমানের পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করা হইত এবং হয় স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার বা ফ্লাইট কমাণ্ডার দুইজনের একজনকে দিয়া টেষ্ট ফ্লাইট করান হইত। এঞ্জিন বা বিমানের কোন দোষ বা ত্রুটি থাকিলে, সে বিমান ফ্লাইটে পাঠান হইত না। টেষ্ট ফ্লাইটে দোষ বা ত্রুটিশূন্য হইলেই বিমান ফ্লাইটে পাঠান হইত।

একদিন বৈকালে কেরী পাইলট একখানা বিমান আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। দিন দুয়েকে বিমানের সম্পূর্ণ পরীক্ষার পর স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বৈকালে বিমান টেষ্ট ফ্লাইটে লইয়া যাইবেন স্থির হইল।

সাধারণতঃ নূতন বিমানের টেষ্ট ফ্লাইটে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করিতাম। কখন কখন বিমানে না যাইয়া বিমান বন্দরে কন্ট্রোল টাওয়ারে বসিয়া থাকিতাম। এদিন বৈকালে কোন কারণে স্কোয়াড্রনের ছুটি ছিল।

স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ফ্লাইং অফিসার সর্দ্দার সুরথ সিংকে সাথে করিয়া আনিলেন। সচরাচর সব সময় তিনি ফ্লাইং অফিসার সুরথ সিংকেই সঙ্গে লইতেন এবং অপারেশনাল ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতিতে তাঁহার সাথে উড়িবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। বিমানের সব কিছু দেখিয়া লওয়ার পর তাঁহারা দুইজন বিমানে উঠিয়া এঞ্জিন চালু করিয়া একেবারে উড়নপথের এক প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কন্ট্রোল টাওয়ারের নিকট বিমান টেষ্ট ফ্লাইটে যাবার জন্য অনুমতি লইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর, বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা বিমান লইয়া আকাশে যাত্রা করিলেন। এতক্ষণ পর্যান্ত কন্ট্রোল টাওয়ারের ঘরের মধ্যে বসিয়া বেতারে বিমানের সহিত কন্ট্রোল টাওয়ারের কথা শুনিতেছিলাম। বিমান উড়িয়া যাওয়ার পর ঘরের বাহিরে আসিয়া বিমানের দিকে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। বিমান তখনও পাঁচশত ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠে নাই। উড়নপথের সোজাসুজি উড়িয়া চলিয়াছে আর বিমানের দুইদিকে যেখানে বিমানের খোল ডানার সাথে সংযুক্ত, সেখানে আগুন জ্বলিতেছে। আগুন দুইপাশেই সমান তেজে জ্বলিতেছে। দৌড়াইয়া কন্ট্রোল টাওয়ারের বেতারবার্ত্তা পরিবেশনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে হুকুমের স্বরে বিমান তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসার জন্য বলিতে বলিলাম। বিমানের ডানা এবং খোলের সংযোগস্থলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিলাম সে কথা তখনও না জানাইতে বলিলাম। বিমান ঘুরাইয়া অবতরণপথের সোজাসুজি হইলে তখন অগ্নি প্রজ্বলনের কথা জানাইতে বলিলাম। বিমানে অগ্নি সংযোগ হওয়া কি সাংঘাতিক ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যদের পক্ষে চিন্তায় আনাও অসম্ভব। এদিকে বিমান ভূমি ত্যাগ করা মাত্র ফ্লাইং অফিসার সুরথ সিং বেতারবার্ত্তা-যন্ত্র বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়াছেন। আমরা যতই বেতারে ডাকাডাকি করিতেছি, তাঁরা কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বেতারযন্ত্র বন্ধ করেন নাই, কিন্তু কোথায় তখন গান হইতেছিল, তিনি তাহাতেই মশগুল হইয়া ছিলেন। যাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে বসিয়া, তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত আরামে, আর আমরা কয়েকজন যাহারা অগ্নিকাণ্ড হইতে বহুদূরে তাহারা এত শীতের মধ্যেও দুশ্চিন্তায় গলদঘর্ম। কি হয় কি হয়? মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফ্লাইং অফিসার সুরথ সিহ তাঁহার ককপিটে ভীষণ গরম বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন যে শীতের সময় বলিয়া বোধ হয় এঞ্জিনীয়াররা বিমানের খোল গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু গরম সমান না থাকিয়া ক্রমেই বেশিই হইতেছিল। সেই কথা জানাইবার জন্য তিনি বেতারযন্ত্র চালু করিলেন। চালু করিতেই ফিরিয়া আসার জন্য জরুরী হুকুম শুনিতে পাইলেন। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বিমান ঘুরাইয়া অবতরণপথে নামিলেন। আমরা জীপ গাড়ী লইয়া অবতরণপথের কিনারায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে অগ্নি-নির্বাপক-যান এবং ডাক্তার লইয়া হাঁসপাতাল-গাড়ী অবতরণ পথের পাশে অপেক্ষমান ছিল।

অবতরণ করামাত্র স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বিমানের এঞ্জিন বন্ধ করিলেন এবং ব্রেক ব্যবহার করিয়া বিমানের অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিলেন। বিমান থামা মাত্র তাঁহার কক্-পিট্ হইতে লাফাইয়া প্রথমে বিমানের ডানার উপরে ও সেখান হইতে দ্বিতীয় লাফে একেবারে মাটির উপর নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার সাথে সাথে ফ্লাইং অফিসার সুরথ সিংও মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িইয়া দূরে যাওয়ার জন্য উঠিলেন। ততক্ষণে আমরা জীপ গাড়ী লইয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছি। তাঁহাদের দুইজনকে জীপ গাড়ীতে উঠাইয়া অগ্নিকাণ্ডে বিমানের ক্ষতি কতটা হইল, দেখার জন্য বিমানের ডানার চালুর পশ্চাতে যাইয়া অগ্নি জলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইলাম। অল্পক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়াই অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ বোঝা গেল। পেট্রল রাখার জন্য বিমানের খোলের দুইপাশে দুই ডানার মধ্যে সারি করিয়া কয়েকটি ট্যাঙ্ক থাকে। ট্যাঙ্কগুলিতে পেট্রল ভর্ত্তি করার জন্য শুধু একটি রবারের তৈয়ারী নল। নলের মুখ শক্ত করিয়া বন্ধ করা হয় ইস্পাতের তৈয়ারী পাত দিয়া। রবারের নল ও ইস্পাতের পাতের মাঝখানে পেট্রলের চোয়ানি বন্ধ করার জন্য পাতলা নরম রবারের ওয়াশার দেওয়া হয়। দুই পাশেই এই পাতলা রবারের ওয়াশার ফাটিয়া যাওয়াতে ট্যাঙ্কের পেট্রল এই পথে ডানার উপর বাহির হইয়া পড়িতেছিল। আর এঞ্জিন হইতে নির্গত আগুনের মত গরম ধোঁয়া ট্যাঙ্ক হইতে নিষ্ক্রান্ত পেট্রলের উপর পতিত হওয়াতে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। এঞ্জিন বন্ধ করাতে গরম ধোঁয়া বাহির হওয়া বন্ধ হওয়ার জন্য অগ্নি আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত। কিন্তু যদি বেশিক্ষণ পর্য্যন্ত এইপ্রকার প্রজ্বলন চলিত, তবে পেট্রল ট্যাঙ্কের মধ্যে অগ্নি সংযোগ হইতে দেরী হইত না। তাহা হইলে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিত। বিমানের পেট্রল ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণে আরোহীদ্বয় সহ বিমান টুকরা টুকরা হইয়া ভূপতিত হইত। যেমন করিয়াই হউক "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে," সেই অদৃশ্য শক্তি দুইজন বৈমানিক ও একটি বিমান ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। ক্ষতির পরিমান সামান্যই। ডানা ও খোলের সংযোগ স্থল হইতে কিছুটা অ্যালুমিনিয়ম ধাতু গরমে গলিয়া পড়িয়া গেছে।

জীপে রওনা হওয়ার সময় স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আশ্বাস করিয়া বলিলেন, "আজ যত তাড়াতাড়ি বিমান নামিয়েছি এত তাড়াতাড়ি কখন করাই নাই বা করাইতে পারিবও না।"

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

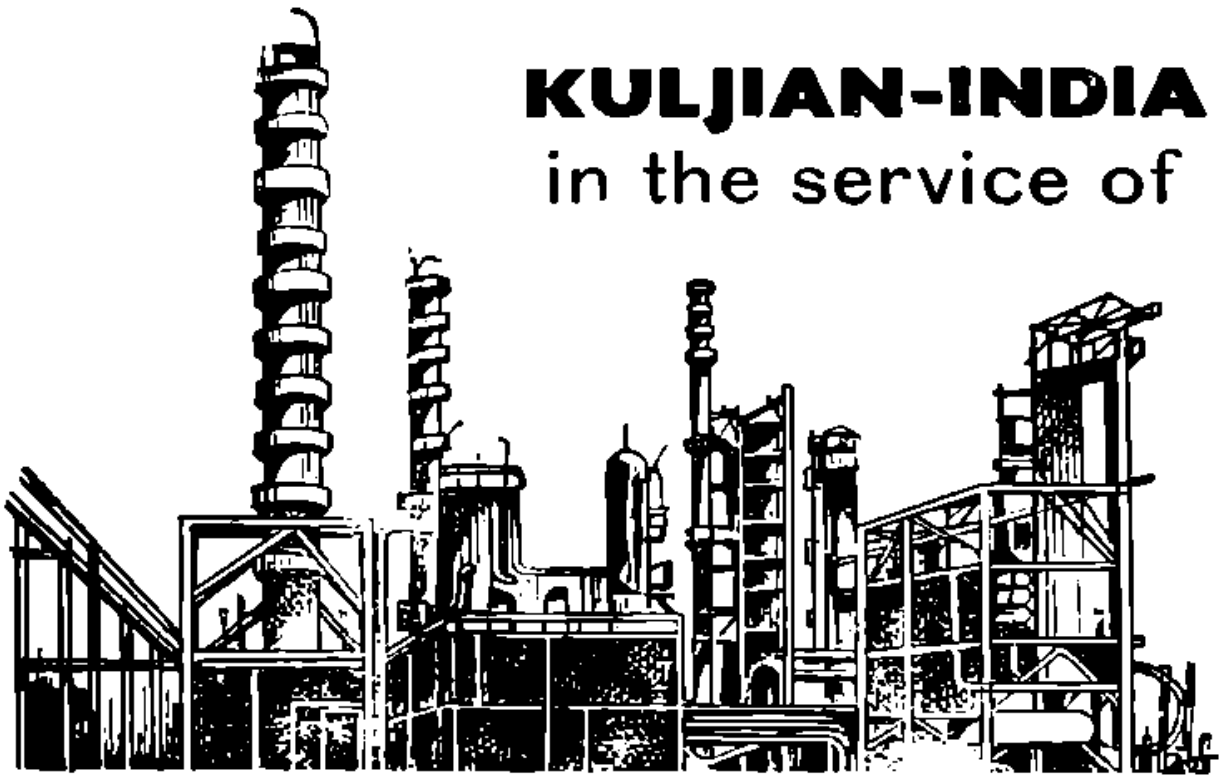

KULJIAN-INDIA
in the service of

CHEMICAL
INDUSTRY

Kuljian's Chemical Engineering Department is equipped to take charge of complete engineering work for chemical manufacturing facilities Kuljian can develop the selected process into a single-line flow diagram, prepare specifications for process equipment, handle the detail engineering, and undertake complete field engineering services Project engineering is performed in conjunct on with Kuljian's other engineering departments—mechanical, civil, electrical, architectural, and structural services. Equipment and material procurement, construction supervision, training of owner's personnel and start-up complete the picture

Kuljian-India serves the industry—serves the nation

The **Kuljian** *Corporation (India) Private Ltd.*

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16.

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

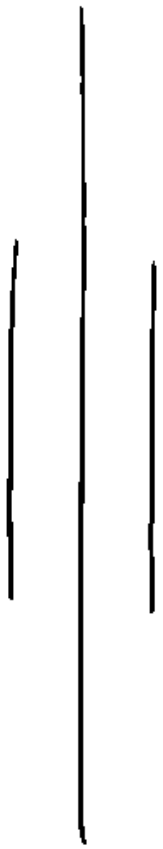

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone . 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,

57, Radhabazar Street,

CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Telegrams: 'Vessel' Cal

Codes { Scott's 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

Reg. No. 13773/66

11 MAR 1968

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	ঐ
স্মৃতির পাতা (১২ পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত
ঐ (২য়	
কবিমনীষী (১ম খণ্ড)	
ঐ	

রবীন্দ্রনাথ		১.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পঙ্কজপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫.০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮.০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	প্রনিলবরণ রায়	২.৫০
সাধনার জীবন	সচ্চিদানন্দ গুপ্ত	১.৫০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১.০০	উত্তর রহস্য	শ্রীমা	১.০০
ভারতের নবজন্ম		১.৫০	ছোটদের গল্প		১.৫০
কর্ম্মযোগী		১.৫০	পুরাণো কথা		১.৫০
জগন্নাথের রথ		১.০০	শিক্ষা		১.৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২.৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১.০০	সর্ব্বোত্তম আবিষ্কার		০.৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬

CALCUTTA

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৫ আগস্ট, ১৯৬৮

বর্ষ—২৮ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী	
সাবিত্রী	
পঞ্চ-ইন্দ্রিয় রহস্য	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. বি. পুরাণী
পেরিয়ালবার	

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	৬০.০০	বার্ষিক	২০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫.০০		১২০.০০
প্রতি সিকি পৃষ্ঠা	২৫.০০		৮০.০০
ভিতরের মলাট	১০০.০০		৩২০.০০
বাহিরের মলাট	১২৫.০০		৪০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by : NOLINI KANTA GUPTA
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
PRINTED IN INDIA

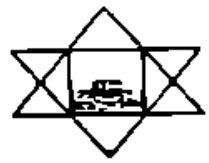

আগষ্ট ১৫, ১৯৬৮

বর্ত্তমানের মত এই সত্যসত্যই বিশ্ব-বিনষ্টির যুগে, হতাশ না হয়ে বেঁচে-বর্ত্তে থাকতে হলে ধরে রাখা দরকার—প্রশান্ত হৃদয়, দৃঢ়নিশ্চিত সঙ্কল্প, অখণ্ড আত্ম-নিবেদন আর নিয়ত দূরান্তরে নিবদ্ধ দৃষ্টি।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

ভগবৎ-প্রসাদ কাজ করে চলে সাধনপথে ক্রমগতির জন্যে। বাসনার চরিতার্থতা ঐ উদ্দেশ্যে সহায় হতে পারে, বাসনার নিরর্থকতা দেখিয়ে দিয়ে।

গতকাল যা ভাল ছিল, আগামীকাল তা আর ভাল না হ'তে পারে।

তোমার অন্তঃপ্রেরণা অনুসরণ করে চল—আমার আশীর্ব্বাদ রয়েছে।

⁂

বাহ্যসত্তা যখন আপনাআপনি চলে তখন তার নিজস্ব দায়িত্ব খুবই কম, প্রায় সর্ব্বদাই প্রকৃতির শক্তির হাতে পুতুল সে; কিন্তু অন্তরের বা ঊর্দ্ধের সত্তা—গভীরের চেতনাই হ'ল] অধিকর্ত্তা, আমাদের নিয়তির স্রষ্টা। সেই জন্যেই একান্ত প্রয়োজন হ'ল এই সর্ব্বেশ্বর চেতনাকে আবিষ্কার করা, তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যাতে জীবনের যত বৈষম্য প্রকৃতির যত সংঘর্ষ সব দূর হয়ে যায়।

⁂

শক্তি অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হ'ল অনুগত হওয়া। শরীরকে অনুগত হ'তে শিক্ষা করতে হবে প্রথমে, তবে ত' সে শক্তি প্রকাশ করতে পারবে আর শারীর শিক্ষাই হ'ল শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ সাধনা।

সুতরাং শারীর শিক্ষার জন্য উৎসাহী হবে, ঐকান্তিক হবে। তবেই তুমি শক্তিশালী শরীর অর্জ্জন করবে।

(শারীর শিক্ষার বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মায়ের বাণী—১।৪।৬৮)

⁂

যে দিব্যজীবন ক্রমপ্রকট হয়ে চলেছে, যে দিব্যচেতনা কর্ম্মপর জড়ের মধ্যে, বলা যায় তারই প্রতিরূপ হ'ল এই এখানকার সত্তাটি।

⁂

কথাটা এইভাবে বলাই ঠিক হবে, এক ধরণের চিন্তা, এক ধরণের অনুভব, এক ধরণের কর্ম্ম অনেককে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় কিংবা শারীর সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাদের কারও কারও এবং আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়।

সাবিত্রী

(অনুবাদ)

একাদশ পর্ব্ব—প্রথম সর্গ

(৭)

[সাবিত্রী আর ভগবানে চলেছে আলাপন অর্থাৎ তর্ক ও বিতর্ক। ভগবান বলছেন: "সাবিত্রী, তুমি সৌভাগ্যবতী, এখানে তুমি চলে আসতে পেরেছ, এখানেই তবে থেকে যাও। এ রাজ্যের তুলনা নেই, এই হল চরম স্থিতি, এখানে যাবতীয় সিদ্ধি, যাবতীয় সার্থকতা।" সাবিত্রী ভুলবার পাত্রী নয়, সে বলে: "ও সব আমি চাই না, আমি পৃথিবীতে ফিরে যাব এবং তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।" ভগবান একটু হাস্য করে সাবিত্রীকে বুঝিয়ে চললেন "পৃথিবীতে মানুষের সার্থকতা আছে বই কি। সৃষ্টিও চলেছে একটা পরম গন্তব্যের দিকে—কিন্তু সে এক জিনিষ আর এ আর এক জিনিষ, সৃষ্টিরও গতি ধীরে-সুস্থে ঋজুকুটিল ধারায় উঠে আসবে এখানেই পরিশেষে।"]

ছড়ায়ে হাস্য সুমহান, মধ্যাহ্নের গগন যেমন
অপরূপ দর্শনে মূর্ত, কহে দেব-বিগ্রহ:
"কি করে পার্থিব প্রকৃতি আর মানব প্রকৃতি
উঠে দাঁড়াবে স্বর্গের পর্যায়ে
পৃথিবীর সংসর্গ রেখে তবু?
স্বর্গ আর পৃথিবী পরস্পরের দিকে চেয়ে রয়েছে
একটা অনতিক্রম্য গহ্বরের এপারে ওপারে—
একে অপরকে স্পর্শ করে না কখনও;
তারা এসেছে যেন একটা অস্পষ্ট অশরীরী কুয়াশা পার হয়ে,
তারই মধ্যে রূপগ্রহণ করে আকাশে চলমান যত বস্তু,
সেই তীর দেখতে পায় সকলেই
কিন্তু কেউ সেখানে পৌঁছে না গিয়ে।
স্বর্গের আলো কখন বা পৃথিবীর মনে এসে শুধু উঁকি দেয়,
তার চিন্তারাজি পৃথিবীর আকাশে জ্বলে নিঃসঙ্গ তারার মত,
পৃথিবীর হৃদয়ে জাগে স্বর্গীয় এষণা সব
মৃদুল সুন্দর বিহঙ্গের চঞ্চল সুপর্ণের মত;

অনবিগন্য উল্লাসের দৃশ্যাবলী চলে যায়
তার স্বপ্নতরা ক্ষীয়মান দর্পণের বুকে,
আলোর আনন্দের ক্ষীণপ্রাণ বীজ ফলিয়ে ধরে
দুঃখের ফুলভার ;
অর্দ্ধশ্রুত সঙ্গীত হতে ধরা দেহ ক্ষীণ সুরসঙ্গতি,
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত কণ্ঠের মত সংঘর্ষ মাঝে ;
উদ্বেল উচ্ছল সাগরের ফেনপুঞ্জ যেন ;
দেবতাদের সুন্দর সুদূর আনন্দের ধাম—
অজ্ঞাত পুলক অলৌকিক সুখসার,
শিহরিত করে তারে, মনে প্রাণে তার পশে গিয়ে
অর্দ্ধস্ফুট রূপ নিয়ে।
ক্ষুদ্র সসীম পদক্ষেপ তার, অনুভব করে সে উর্দ্ধে
জগত সব গড়ে চলেছে ছেদ বা গ্রন্থি হিসাব না করে,
কি অপরূপ পরিপূর্ণ সৌষ্ঠব
বিধানের নিয়মের বাহিরে,
আনন্দিত আনন্দের বিশ্বসৃষ্টি সে যে ;
কালাতীত তান-লয়ের ছন্দ অবর্ণনীয়,
অদ্বিতীয়ের বহুল ধারায় বিভক্ত হৃৎস্পন্দ,
আত্মার সীমাহীন সম্মোহনী সুরসঙ্গতি,
অনন্তের স্বাতন্ত্র্য-কৌলীন্য সে,
কৈবল্যের সুখনন্য আদি অদ্ভুত উপাদান।
বিশ্বসত্তা সেখানে, সেখানে কালহীন আত্মারাম।
পৃথিবীর তরে শুধু লুপ্ত কোন নক্ষত্রালোকের চূর্ণাবশেষ,
তার কাছে শুধু দেবতাদের যদৃচ্ছ আকস্মিক আগমন,
জ্যোতিরূপে তারা আসে কিন্তু নিভে যায়, বাকরূপে শোনা যায় যদি
স্তব্ধ হয়ে যায় অমনি
তাদের মতিগতি পৃথিবীর উপরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।
উর্দ্ধের ক্ষণিক বিলসন আসে, নাই চিরন্তনী দৃষ্টি।
কতিপয় উঠে যায় অবিনশ্বর সূর্য্যের কোলে
অথবা স্থান পায় অলৌকিক চন্দ্রিমার তীর তীরে,
সেখান হতে পার্থিব মনের মধ্যে
প্রসারিত করে দেয় যাদুকর কিরণলেখা।
বীর যারা, দেবতুল্য যারা, যাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলে

অবর কণ্ঠসব
যাদের কর্মের সঙ্গে সম্মিলিত স্বর্গের বাহিনী—
স্বল্পসংখ্যক তারা।
স্বল্প সেই সব নীরবতা, সত্যের শ্রুতি রয়েছে যেখানে,
আপন গভীরে বাস্ত করে যে কালাতীত কণ্ঠ,
স্বল্প অতি দিব্যদ্রষ্টার জ্যোতির্ময় দৃষ্টিযোগ।
বিরল স্বর্গের আহ্বান, আরো বিরল হৃদয় শ্রুতিবান;
জ্যোতির দুয়ার রুদ্ধ চিরতরে সাধারণ মনের কাছে,
পৃথিবীর প্রয়োজনে পৃথিবীতে গাঁথা রয়
মানুষী জনসংঘ।
উর্দ্ধাণী কোন এক মুহূর্ত্তের দৃঢ় আকর্ষণে কেবল
বৃহতের স্পর্শে মানুষে সাড়া দিতে জানে।
কিম্বা কখনও কোন শক্তিবান বাহু তাদের তুলে ধরে যদি
স্বর্গের বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণের জন্যে,
পুনরায় পতন ঘটে তাদের সেই কর্দ্দমের মাঝে
উঠে গিয়েছিল একদিন যেখান হতে একদিন;
যে মাটিতে গঠিত তারা, যার বিধান পরিচিত তাদের,
সানন্দে ফিরে আসে সেখানে
বন্ধুজন আশ্রয়ে যেন।
কখনও যদি বা তাদের অন্তরে অশ্রুপাত করে কোনজন
অপগত মহিমার
আর অপহৃত মহত্বের জন্যে, তাদের পতন তারা সহজে স্বীকার করে
সহজ মানুষ হয়ে থাকা সবচেয়ে ভালবাসে তারা,
আনন্দ তাদের অপর সকলের মত জীবন যাপন,
মানুষ অধিকাংশ গঠিত প্রকৃতির পার্থিব কল্পনায়,
উর্দ্ধতর জগতের কাছে তারা ধারে না কোন ঋণ
সাধারণ মানুষীধারা স্বাভাবিক গতিপথ তাদের।
চিন্তাপর প্রাণী তারা বদ্ধ জড়ের ক্ষেত্রে।
সুদীর্ঘ ক্রমউর্দ্ধগামী শ্রেণীবিন্যাসে
বিশ্বজীবনের একান্ত প্রয়োজনবিধানে
প্রতি জীব লভে তার আপন কর্ত্তব্য, আপন স্থান,
আবদ্ধ সে তার প্রকৃতির রূপায়নে
আর তার আত্মার সামর্থ্যে।

এ বিধান সহজে বিকল হয়ে যায় যদি, ভেঙে যাবে
যাবতীয় সৃষ্টিবস্তুর স্থিতিসাম্য,
বিশ্বের চিরন্তন শৃঙ্খলা
টলে যাবে, নিয়তির দৃঢ়বন্ধে দেখা দেবে বিরাট ফাটল।
মানুষ যদি না থাকত, সবাই যদি হয়ে উঠত জ্যোতির্ময় দেবতা
তবে সেই সংযোগ-সেতু আর মিলত না
যাকে আশ্রয় করে জড়ের মধ্যে জাগ্রত আত্মা ঘুরে ফিরে উঠে চলে,
স্বীকার করে নেয় মধ্যবর্তী পথের সর্পিল ক্রমধারা,
শ্রমের গুরুভার আর ধীর যুগান্তরব্যাপী পদক্ষেপে
পৌঁছে যায় ভগবানের জ্যোতির্ময় অপূর্ব সামীপ্যে
বিশ্বাত্মার মহিমার মাঝে।

৮

[ভগবান সাবিত্রীকে বলে চলেছেন—সৃষ্টি ধীরগতিতে এগিয়ে যায়, তার লক্ষ্যের দিকে—আমারই দিকে, আমি তার অন্তরে রয়েছি। সে ধারাকে তুমি হঠাৎ পরিবর্তিত করতে পার না—তবে তুমি নিজে উঠে আসতে পার সৃষ্টিচক্র এড়িয়ে সৃষ্টির উৎস যা সেই পরম স্থিতি লাভ করতে; সেখানে সব ভেদ মিলিয়ে গিয়েছে, সাবিত্রীও নেই, সত্যবানও নেই, সব মিলিয়ে এক হয়ে গিয়েছে।]

আমার সঙ্কল্প আমার আহ্বান ঐ ত রয়েছে
মানুষের অন্তরে, জিনিষের অন্তরে ;
কিন্তু অচেতনা আসন নিয়েছে সৃষ্টির ধূসর নেপথ্যে,
সব আকর্ষণ করে নেয় তার রাত্রির মৃত্যুর সুপ্তির বুকে
তার অন্ধ মূক গহ্বরের মধ্যে বন্দী, শুধু কণামাত্র চেতনাকে
মুক্তি দেয় বাইরে আসতে ;
কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান আলোক সে সহ্য করেনা,
তাকে পিছনে টেনে ধরে রাখে,
তার অন্ধকার গুহামুখের কাছে যত পারে,
মূঢ় জননী যেমন তার সন্তানকে ধরে রাখে,
বেঁধে রাখে তার অচেতনার অঞ্চলের বন্ধনে ;
অচেতনাই তার আপন সুপ্তি দিয়ে গড়েছে সৃষ্টিকে

সৃষ্টি রহস্যের পাঠোদ্ধার সে করতে পারবেনা
মানুষের মন ব্যতিরেকে,
সচেতন দুয়ারটি খুলবার জন্যে মানুষই হ'ল চাবি-কাঠি ;
কিন্তু সে অচেতনা হাতে করে যেন এখনও
ঝুলিয়ে রেখেছে মানুষকে ;
তার বিপুল পরিক্রমা সে এঁকে চলেছে মানুষের চিন্তারাজি ঘিরে,
মানুষের হৃদয়কে উত্তম জ্যোতির দিকে রুদ্ধ করে রেখেছে ;
উপরে জ্বলছে এক সমুচ্চ খদ্যোতুজ্জ্বল সীমানা
আর নীচে রয়েছে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারী সীমাপ্রান্তের শাসন,
মন তার আবদ্ধ দুই আকাশের মাঝখানে।
সত্যকে খোজে সে কথার আর উপমার আশ্রয়ে,
তার দৃষ্টি নিবদ্ধ একান্ত স্থূলে, একান্ত বাহ্যে
কিম্বা অতি সন্তর্পণে পা সে ডুবিয়ে চলে অগভীর সাগরে,
তার জ্ঞানও হ'ল অজ্ঞান এক,
নিজের অন্তরের গভীরতা থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করেছে,
অজ্ঞেয়ের চোখে চোখ রাখতে সে পারেনা।
সর্ব্বজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে কি রকমে দেখবে সে,
কি রকমে সঙ্কল্প করবে সে সর্ব্বেশ্বরের শক্তি দিয়ে ?
হে উষা, অতি করুণাময়ী তুমি, অতি ব্যাকুল তুমি ;
যুগযুগান্তরকে চলতে দাও ধীর গতিতে তার পরিক্রমা ধরে,
চলতে দাও অচেতন এষণাকে তার কর্ম্মের ধারায়,
পার্থিবজনকে চলতে দাও তার অপূর্ণ আলোক ধরে ;
সব সিদ্ধি আসবে কালের সুদীর্ঘ কার্য্যক্রমে।
মানবজাতি যদিও আবদ্ধ তার আপন জন্মগত বিধানে,
অন্তরাত্মা তার তবু মহত্তর তার নিয়তির চেয়ে,
দেশের কালের প্রাবনের উচ্ছ্বাসের উর্দ্ধে
বিশ্বের সর্ব্ব সাধারণ্য থেকে মুক্ত হয়ে—
যার বশে সকল জীবই সুখে দুঃখে সমগোত্র
বিশ্বগত বিধান থেকে মুক্ত হয়ে
অদ্বিতীয় তুরীয় সদাত্মা জ্বলে ওঠে,
সূর্য্যের মত সে তার পথ করে নিতে পারে
মনের বাধা-প্রাচীর ভেদ করে ;
একক সে প্রোদ্ভাসনস্থ হয়ে থাকতে পারে চিরন্তন আকাশে,

অন্তহীন বৃহৎ প্রশান্তির অধিবাসী সে।
হে বহ্নিশিখা, সম্বৃত কর নিজেকে
নিজের জ্যোতির্ময় নিজত্বের মধ্যে
কিম্বা যাও ফিরে তোমার আদি শক্তির মধ্যে
আর কিম্বা চিন্তাজগতের সৃষ্টির উর্দ্ধে
দ্রষ্টা শিখরের শীর্ষে ;
আমার অখণ্ড আনন্ত্যের সহবাসী তুমি,
এক হয়ে যাও তুমি আমার শক্তির আনন্ত্যে
তুমি ত বিশ্বজননী, তুমি বিশ্ববধূ।
পার্থিব-জীবনের নিস্ফল কামনা সব পার হয়ে,
তার দুর্ব্বল অনিশ্চিত স্বপ্ন সব পার হয়ে
ধারণ কর আবার তোমার পক্ষদুখানি,
অনন্তে পাড়ি দিতে সক্ষম তারা ;
চলে যাও আবার সেই শক্তির কোলে,
যেখান থেকে এসেছিলে তুমি,
সেখানে তুলে ধরতে পার তুমি তোমার বিদেহী যোনযাত্রা ;
তোমার হৃদয় উঠে চলে যেতে পারে
তার অতৃপ্ত স্পন্দন সব ছেড়ে,
অনুভব করতে পারে নিত্যানন্দময় আত্মার অমর বিলাস।
মুমূর্ষু অধোগত প্রেমাতুর হৃদয়কে তোমার তুলে ধর,
বাসনার অতল অতলে ডুবিয়ে দাও, প্রকৃতির রূপাবলী
হতে চিরতরে নিজেকে মুক্ত কর ;
আবিষ্কার কর লক্ষ্যহীন যুগান্তর ধারার কাম্যবস্তু,
সারাজীবনের সকল অর্থ ওতপ্রোত বাঁধা ঐখানে ;
এখানে এ পার্থিব রূপের মধ্যে বৃথা তুমি খোঁজ তারে।
এই মর্ত্য আধার ভেঙ্গে মিশিয়ে দাও অনন্তের মধ্যে ;
হে বিদ্যুৎলেখা, তোমার অদৃশ্য বহ্নিশিখার মধ্যে গলে যাও,
হে মহাসাগর, তোমার তরঙ্গকে আপন গভীরে ধরে রাখ
গাঢ় আলিঙ্গনে,
থাক তৃপ্ত হয়ে চিরকাল তোমার উদ্বেলিত
বুকের আবরণ তলে,
এক হয়ে যাও গভীরের স্তব্ধ প্রবেগের সঙ্গে,
তখন তুমি জানবে প্রেরিক আর প্রেমাস্পদকে

যখন তোমার ও তার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় যে
যাঁর তা পার হয়ে যাবে,
তাকে তুমি স্বাগত করে ধর সীমাহারা সাবিত্রীর মধ্যে,
নিজেকে তুমি হারিয়ে দাও অনন্ত সত্যবানের মধ্যে,
হে অলৌকিক, যেখানে আরম্ভ তোমার শেষ কর সেখানে।

মন্তব্য :

শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে বিভিন্ন সম্মেলনে পাঠের সুবিধার জন্য যে ক্রম বিভাগ করা হয়েছিল, বর্ত্তমান মুদ্রিত আকারেও তাই রাখা হয়েছে—ক্রমিক সংখ্যার ও বিভাগের অন্য অর্থ নাই ; বলাবাহুল্য মূলে এ রকম বিভাগ কিছু নাই।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয় রহস্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পরাঞ্চিখানি—উপনিষদ বলছে—ইন্দ্রিয়ের দরজা জানালা সব বাইরের দিকে ঠার খোলা রয়েছে। কোন বাধা বন্ধন নেই, হাঁ করে যেন জগৎটাকে, যাবতীয় বস্তুকে গিলতে চায়; কিন্তু যদি আত্মস্থ হতে চাও, অধ্যাত্মস্থিতি যদি লাভ করতে চাও, তবে তোমার প্রথম কর্ত্তব্যই হবে এসব দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া, হুড়কো-ছিটকিনি দিয়ে, যদি সম্ভব হয় দেওয়ালও তুলে দিতে পার ও-সব স্থানে। গীতাও এই কথা বলছে, মানুষের আত্মা অন্তরে শান্তির মধ্যে স্থির আসীন, দেহপুরীর নয়টি দ্বার সে বন্ধ করে রেখেছে শক্ত করে, সে নিজেও কোন কাজ করে না, কাউকে দিয়ে কাজ করায়ও না। আমরা স্মরণ করতে পারি জাপানী তিন বানরের কথা। তিনজন পাশাপাশি বসে আছে। একজন আঙুল দিয়ে দুচোখ বন্ধ করে আছে—অর্থ, কিছু দেখবনা আমি আর একজন ঐরকমে কান বন্ধ করে আছে—অর্থ, কিছু শুনব না আমি, আর একজন মুখ চেপে রয়েছে—অর্থ, কোন কথা নয়। এই হল জেন (Zen) সাধনার প্রতীক।

ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে এরকমে এক ব্যবহার করা যেতে পারে। তুমি যদি মনে কর ইন্দ্রিয়-গুলি তোমাকে টেনে বাইরে নিয়ে চলেছে, তোমাকে লোভ দেখায় জগতের মধুর নশ্বর ভোগ্য-বস্তুদের পশ্চাতে ছুটে চলতে, জীবনের সকল সুখ-দুঃখের ভোগে, অজ্ঞানের মৃত ধারায় নেমে যেতে, তাহ'লে ইন্দ্রিয়েরা বিপদজনক দিশারী বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয়েরা এ ধরণের দুর্বৃত্ত যে হবেই তার প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রিয়েরা তোমাকে অজ্ঞানের পাতালে না নামিয়ে, তোমাকে উপরের দিকে উঠে চলতেও সাহায্য করতে পারে, অন্তরের দিকে পথ প্রদর্শক হতে পারে। তারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতে পারে—আপনাদের খুলে ধরতে পারে মায়ার জগতের দিকে নয়, পরম জ্যোতির্ম্ময় সত্যময় জগতের দিকে।

কি রকমে তা সম্ভব? বাইরের দিকে খোলা না থেকে অন্তরের দিকে কি রকমে খোলা থাকতে পারে? এ সমস্যায় উপনিষদ নিজেই এক নির্দ্দেশ দিয়েছে। উপনিষদ বলছে, চোখ দিয়ে কেউ কিছু দেখে না, দেখে চোখের চোখ দিয়ে। কান দিয়ে কেউ কিছু শোনে না, শোনে কানের কান দিয়ে। এই রকম সব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের পিছনে আছে একটা আন্তর ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়ই আসল কাজ করে, বাহ্য ইন্দ্রিয়টি আশ্রয়মাত্র। সে রকমে উপনিষদ আরো বলছে, তোমরা মনে কর যে মনই এনে দেয় জ্ঞান তা নয়, জ্ঞান এনে দেয় মনের মন। বাহ্য মন অর্থাৎ স্থূল মস্তিষ্কগত চিন্তা জ্ঞানের উৎস নয়, জ্ঞানের উৎস বলব অধিমন বা আন্তরমন। সুতরাং কথা হ'ল তাহ'লে, এই সব ইন্দ্রিয়ের বাহ্য আকার ও কর্ম্ম থেকে আপনাকে সরিয়ে নিতে হবে, পরিচয় করাতে হবে,

সংযোগ ঘটাতে হবে ঐ আন্তর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে। আমাদের চেতনাটি এইরকমে ঘুরিয়ে ধরতে হবে, আলোক-রশ্মি ঘুরিয়ে ধরবার মত। তবেই একে একে ইন্দ্রিয়েরা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করবে।

এই যেমন, আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা সিদ্ধির কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখা বা দৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করি। বলি সত্যকে দেখা, বলি সত্যদ্রষ্টা—সত্যকে জানা বা পাওয়া অর্থে আমরা বলি সত্যকে দেখা। কিন্তু দেখা অর্থ কি? কি দেখি? দেখা অর্থ আলো দেখা, দৃষ্টিতে ধরা পড়ে জ্যোতি, চক্ষু তবে হ'ল জ্যোতির আশ্রয়। চক্ষুষ্মান যে সে সত্য-দ্রষ্টা এবং সত্যসিদ্ধ। চক্ষুর, সূক্ষ্ম চক্ষুর, দৃষ্টির আশ্রয়ে আমরা দেখি সত্যের জ্যোতির্ময় অবয়ব, যে রূপ নিয়ে সত্য প্রকট হয় আমাদের দৃষ্টিপথে। তা হ'লে এই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ দান, তার নিজস্ব অবদান হ'ল সত্যকে জ্যোতির্ময়রূপে ধরে দেওয়া। এই চক্ষুকেই উপনিষদ বলছে চক্ষুর চক্ষু, একেই সাধকেরা বলে থাকেন তৃতীয় নয়ন। চক্ষু সম্বন্ধে যে কথা বললাম, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যেতে পারে। এই যেমন কর্ণ বা শ্রবণ। কানে আমরা সাধারণতঃ শুনে থাকি বিশ্বজগতের কোলাহল, নানা ধ্বনি শব্দ কথা, কর্কশ হোক মধুময় হোক। কিন্তু এই শ্রবণকে যখন ঘুরিয়ে ধরি ভিতরের দিকে তখন শুনতে পারি আর এক অপরূপ শব্দ সব। বিখ্যাত সঙ্গীতকার বধির বিঠোভেন তাঁর অন্তর্মুখী শ্রুতি দিয়ে শুনেছিলেন স্বর্গীয় সঙ্গীত সব যার যাদু আজও মানুষী শ্রুতিকে মোহিত করে রেখেছে। এই আন্তর শ্রুতিকে আশ্রয় করে আমরা যদি আরও অন্তরে চলে যাই, আরও সূক্ষ্মতর ধ্বনির অনুসরণে, তাহ'লে আমরা পৌঁছে যেতে পারি বাক্যের ধ্বনির উৎসে যার নাম অনাহত বাক—অনুচ্চারিত কণ্ঠ, পৌঁছে যেতে পারি আদি শব্দে, মূল ধ্বনিস্পন্দে যার নাম নাদব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম—ওঁ। কর্ণ বা শ্রবণ তবে খুলে দেয় সেই দ্বার যেখান দিয়ে প্রকাশ পায়, ভগবানের এক বিশেষ ধারা, সত্তার আত্মস্পন্দন, সেই মূলছন্দ যা হ'ল কথার বাক্যের উপাদান, যা হ'ল চেতনার একটা বহিঃপ্রকাশ। তারপর তৃতীয় ইন্দ্রিয় নাসিকা বা গন্ধ। নাসিকা তাচ্ছিল্যের ইন্দ্রিয় নয়, চক্ষু এবং কর্ণের মত তারও আছে একটা প্রাধান্য এবং বিশেষ অবদান। এই ইন্দ্রিয়টি ধরেই আমরা আঘ্রাণ করতে পারি সত্যের সৌরভ, সেই সৌগন্ধ্যে অবগাহন করে সুস্নিগ্ধ সুরভিত করে তুলতে পারি আমাদের সত্তাকে। সত্তার সত্যের রূপ আছে, শোভন রূপ, তার বর্ণবিলাস আছে অতি মনোহর, ভাস্বর, উজ্জ্বল নয়ন তৃপ্তিকর, কিন্তু নাসিকার কাছেও ধরা দেয় তার আর এক মহিমা, তার মুগ্ধকর সৌগন্ধ। সমস্ত আকাশ-বাতাসকে সেই সৌগন্ধ্য যেন পরিশুদ্ধ পবিত্র করে তোলে। তার পরের ইন্দ্রিয় হ'ল জিহ্বা। জিহ্বা দেয় অর্থাৎ আন্তর রসনা তোমাকে দেয় সত্যের আস্বাদ, সত্যের মধুরতা, দেবতাদের ভোজ্য ও পানীয় হয় তখন সে। সত্য তখন নাম গ্রহণ করে সোমরস, অমৃত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ত সাবিত্রীতে—

> In the nostrils quivered celestial fragrances
> On the tongue lingered the honey of Paradise.

নাসারন্ধ্রে স্পন্দিত স্বর্গের সৌরভ,
রসনায় বয়ে যায় নন্দনের মধু

তারপর শেষের ইন্দ্রিয় হ'ল স্পর্শ, শেষের বলছি কিন্তু স্পর্শই হ'ল আদি ইন্দ্রিয়। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তারই হয়েছে প্রথম প্রকাশ, জড় থেকে যখন প্রাণে উঠেছি এবং প্রাণের প্রথম প্রকাশ হয়েছে প্রাণীর মধ্যে, তখন জগতের সঙ্গে তার আদান-প্রদান ঘটেছে এই একমাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে। ত্বক দিয়েই জীবের দিকদর্শন হয়েছে গোড়াতে, চক্ষু এসেছে অনেক পরে, আলোর অস্তিত্ব প্রথম অনুভূত হয়েছিল স্পর্শেরই সহায়ে। চক্ষু হ'ল মানস আবির্ভাবের পরিচয়, মন যত গড়ে উঠেছে, চক্ষুও তত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষ যে এত জ্ঞানী হয়েছে প্রধানতঃ তা তার চক্ষুর ব্যবহারে। চক্ষুর আলোতেই মানুষের জ্ঞান যেন প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এক হিসাবে চক্ষুর জ্ঞান হল গৌণ আনুমানিক জ্ঞান। স্পর্শ দেয় যেন সাক্ষাৎ অবাধ অনাবৃত পরিচয়। স্পর্শ অর্থ যেন একাত্ম হয়ে যাওয়া, এক হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ শুধু জানা নয়, হয়ে যাওয়া। সুতরাং এই স্পর্শকে যদি অন্তরমুখী করে ধরি, আন্তর স্পর্শের ধারায় চলে, সূক্ষ্মতর গভীরতর স্পর্শের সন্ধান পাই তবে পরিশেষে আমরা সাক্ষাৎ স্পর্শ পাব গিয়ে পরমসত্যের, পরম সত্যের অঙ্গেরই সঙ্গে সম্মিলিত হব গিয়ে। আমাদের এই যে বাহ্যস্পর্শের ভূমি, দেহ, ত্বক, যার নাম অন্নময় তারই স্বরূপ পরমভূমিতে হ'ল সচ্চিদানন্দের সৎ।

এই রকমে বিবিধ ইন্দ্রিয় তাদের প্রত্যেকের আপন আপন ধারায় এনে দেয় সত্যের একটা বিশেষ গুণ এবং তার বিশেষ বোধ ও বিশেষ পরিচয়। চক্ষু দিয়ে দেখে যারা বলেছি তারা হ'ল চক্ষুষ্মান অর্থাৎ সচেতন, আর যাদের চক্ষু নাই তারা অন্ধ, অর্থাৎ অচেতন। সত্যকে দেখা হ'ল সত্যদর্শন, সত্যদৃষ্টি। সত্যকে দেখে যারা, সত্যদর্শন ও দৃষ্টি যাদের তারা হ'ল সত্যদর্শী বা ঋষি। সেই রকম সত্যকে শোনে যারা আন্তর শ্রবণ দিয়ে, তাদেরই আছে সত্যশ্রুতি, তাদের বলা হয় সত্যশ্রোতা। জিহ্বা দিয়ে সত্যকে আস্বাদন করা যায়, এইভাবে সত্যকে ভোগ করা যায়। সত্য যখন রস বা মধু বা অমৃত অথবা ভোজ্যবস্তু তখন এই ধারায় দেবতাদের নাম হয় সত্যভুক, সত্যপায়ী, সত্যস্বাদী, ঋষিরা এবং সিদ্ধ মানুষেরাও পায় এই বিশেষণ। বৈদিক ঋষিরা পরম সত্যকে দেখতেন দুগ্ধবতী গাভীরূপে (পৌরাণিক কামধেনু)—সুদুঘামিব গোদুহে—সত্য যেন সুনিষ্ট দুধের ধারা—সোমরসের মতনই মধুর ও উন্মাদক, উল্লাসে তা পান করে দেবতারা, মানুষেরা সত্যানন্দময় হয়ে ওঠে। সত্যকে স্পর্শও করা যায় বলেছি। বৈদিক ঋষিদেরও আর এক নাম—দেবতাদেরও আর এক নাম ঋতস্পৃক্। ঋত অর্থ সক্রিয় কর্মপর সত্য। সত্যকে স্পর্শ করে যারা, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ঋতস্পৃশ। আর সত্যকে দেখে যারা তাদের নাম দেওয়া হয়েছে সত্যস্পশ। স্পৃশ ও স্পশ দুটি কথা ব্যবহার করেছেন বৈদিক ঋষি, সত্য বা ঋত সম্পর্কে—স্পৃশ হল স্পর্শ

করা ও স্পশ হল চোখে দেখা। স্পশ কথাটি হতেই এসেছে স্পষ্ট—ইংরাজী Espy বা Spy একই শব্দ—যা চোখে পরিষ্কার দেখা যায়। পরিশেষে সত্যের সৌরভ আছে বলেছি, সত্যকে আঘ্রাণ করা যায়, সত্যের পরিমলে দেবতনু সুরভিত, আমরা মৎস্যগন্ধার নাম শুনেছি, সেই রকমে সত্যের উপলব্ধি যার হয়েছে, সত্যের মধ্যে যিনি লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি যে সত্যগন্ধী হবেন তা আর আশ্চর্য কি?

আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছি, কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানে বিজ্ঞানে আছে আর একটি ইন্দ্রিয়ের কথা। আমাদের জ্ঞানীদের মতে মন হ'ল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত এই মনও বহির্মুখী, মন নিয়ে আসে বহির্জগতের প্রাথমিক জ্ঞান বা প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়সব এনে দেয় যে বিক্ষিপ্ত স্থূল অনুভূতি উপাদানগুলি, মন তাদের গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে। সাধারণ মনের জ্ঞান হ'ল বাহ্য স্থূল জ্ঞান, তবে মনকেও ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে ধরা যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত। তখন তার মধ্যে ধরা দিতে পারে, প্রতিফলিত হতে পারে ইন্দ্রিয়ের, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বস্তু জগৎ নয়, কিন্তু আন্তর অনুভবের আন্তর জ্ঞানের সম্পদ। সাধারণতঃ বলা হয় মন আছে কেন, মনের কাজ কি, না, জ্ঞানের আহরণ। আসল মনের লক্ষ্য তবে এই জ্ঞানই অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, আন্তর জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান। মন যখন অন্তর্মুখী হয়, নির্ম্মল পরিশুদ্ধ হয়, প্রশান্ত ও অনুগত থাকে, তখনই সে তার স্বধর্ম্ম সম্যক পালন করতে পারে। যে পরম সত্য সকল অনুভূতির, জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহিরে, সেই সত্যকে যখন এই পার্থিব চেতনায় প্রকাশ করতে হয়, পার্থিব ক্রিয়াবলী সম্পন্ন করবার জন্যে তখনই হয় মনের প্রয়োজন; স্থূল রূপাবলীর মূল ছক মন এঁকে দিয়েছে নিজের আন্তর প্রসারে, সেই জালের মধ্যে যেন উর্দ্ধতর সত্য নেবে এসে ধরা দেয়, মানবীয় চেতনায় রূপগ্রহণ করে। সুতরাং মনও ত্যাজ্য নয়, তাচ্ছিল্যের নয়, উর্দ্ধের সত্যকে মনই দিয়ে থাকে তার নাম ও রূপ—সেই "সুরূপ" বৈদিক ঋষিরা যার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছেন, সেই শোভন আকার ইহধামে যা হবে দেবতাদের নিবাস।

ইন্দ্রিয়েরা সব বিভিন্নধারা বটে কিন্তু তারা একান্ত পৃথক নয়। তারা অন্তরে অন্তরে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, এতখানি সম্মিলিত যে একে অপরের কাজটিও সম্পন্ন করতে পারে অনেক সময়ে। আমরা পূর্ব্বে স্পর্শেন্দ্রিয়ের, ত্বকের কথা বলেছি, আদি প্রাণীরা কি রকমে এই একমাত্র ত্বক দিয়েই অন্যসকল ইন্দ্রিয়ের কাজ চালাতে পারত। আর এখনও বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা পরিচয় পাই আলো কি রকমে ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হয়, বর্ণ কি রকমে সঙ্গীত হয়ে ধরা দেয়। তাছাড়া শুধু সুমধুর ভোজ্যবস্তু নয়, কোন সুদৃশ্য দেখে বা দেখবার জন্যে, সুসঙ্গীত শুনবার জন্যে আমরা বলি না কি আমরা লালায়িত হয়ে উঠি; আমরা মুখে আস্বাদন করি যেন দৃষ্টি বা শ্রুতি নিয়ে আসে তাদের যে সম্পদ। দেবরাজ ইন্দ্রের আখ্যান আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি। ইন্দ্রের আর এক নাম সহস্রলোচন বা সহস্রচক্ষু, সহস্রাক্ষ। তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, প্রতিটি রোমকূপ যেন ছিল এক একটি চোখ। তাই তিনি সর্ব্বদর্শী, একযোগে একসময়ে তিনি সর্ব্বত্র সব দেখতে

পেতেন। আসলে ইন্দ্র হলেন ইন্দ্রিয়দের অধিপতি, তাই সকল ইন্দ্রিয় তাঁর মধ্যে ছিল মিলেমিশে, তাদের কাজ হত যুগপৎ—তাদের মধ্যে একান্ত পার্থক্য যেন ছিল না। ফলতঃ আন্তরচেতনায় ইন্দ্রিয়দের কেবল বৈষম্য পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা দেয় নি, তারা সেখানে রয়েছে একই সাগরের সম্মিলিত তরঙ্গাবলীর মত। এক অঙ্গ আর এক অঙ্গের কাজ করে চলতে পারে অবলীলাক্রমে অবস্থাবিশেষে, প্রয়োজন হিসাবে।

প্রাচীন ঋষিরা ঠিক এই কথাই বলেছেন। মূলে রয়েছে একই সত্তা, সেই একই সত্তা বিভিন্ন নামে ও রূপে প্রকাশ পেলেও সর্ব্বদাই তা রয়েছে সেই একম্ সৎ।

তা'হলে আমরা দেখলাম, ইন্দ্রিয়েরা একান্ত আধিভৌতিক শক্তি নয় অর্থাৎ তাদের ধর্ম্ম কেবল বাহ্য স্থূলজগতের সাথে পরিচয় করে দেওয়া নয়, তারা আসলে হ'ল আধিদৈবিক শক্তি। তারা এক একটি দেবতা যেন, তারা নিয়ে যায় আদি দেবতার সন্নিকটে অর্থাৎ তারা হ'ল আধ্যাত্মিক শক্তির বাহন, মানসচেতনাকে নিয়ে যায় পরমচেতনার এক একটি অন্তরঙ্গ অনুভবের জন্য এবং সেই পরমচেতনাকে আবার নিয়ে আসে বাহ্যচেতনার মধ্যেও, তেমনি বিভিন্নভাবে পরম সত্যমূলের মধ্যে আপনাকে প্রকটিত করতে।

A magical accord quickened and attuned
To ethereal symphonies the old earthy strings....
it made
The body's means the spirit's acolyte.

একটা যাদুকর সুসঙ্গতি জীবন্ত করে দেয়,
অমরার মূর্ছনায় তুলে ধরে
ধরণীর পুরাতন তন্ত্রী সব...
দেহের যন্ত্রসকলকে আত্মার সাকরেদ করে ধরে।

———

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(১২)

যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে চিনলাম লোকোত্তর পরম পুরুষরূপে ; উর্ধ্বে তাঁর প্রতিষ্ঠা, আকাশবৎ তাঁর পরম প্রকাশ। তিনি দূরে সব ছাপিয়ে অসীম অনন্ত বিশাল হয়েও, হৃদয়ের সম্পর্কে তিনিই আমাদের পরম পিতা। যেমন তিনি দূরে, তেমনই তিনি আবার অন্তিকে। যখন তিনি কাছে, তখন তাঁকে বলি মা। আমরা তাঁর সন্তান এই তো আমাদের জীবধর্ম। মা না হলে আমরা বাঁচতেই পারি না। মা তাঁর চিরকল্যাণময়ী শক্তিতে সন্তানকে কাছে টেনে নেন, দূরে থাকতে দেন না। জীবনের সম্বল এই মায়ের আলোর শক্তির ভিতর দিয়েই আমাদের যোগের পথ। বাবার কোলে, সেই আকাশবৎ পরম প্রশান্তিতে পৌঁছে দেবেন মা—এই বিশ্বাসটি অন্তরঙ্গ ভাবনা দিয়ে সদা জাগ্রত রেখে আমাদের চলতে হবে। আমরা বেঁচে থাকি, চলি ফিরি ঘুমাই আবার মরে যাই, সবই হয় মায়ের কোলে। এই মাকে ঘিরে রয়েছে এক বিরাট রিক্ততা ও শূন্যতা। মায়ের শক্তি সমুদ্রের মত ; তাতে জীবনের বুদ্বুদ জাগছে উঠছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। এই মহাশক্তি মা ও পরম পুরুষ পিতা যুগনদ্ধ। তারই লীলা বা খেলা আমাদের এই জীবন। তাই জীবনের কর্মে যেমন আছে প্রজ্ঞার কর্ম, তেমন আছে প্রেমের কর্ম ও প্রাণের কর্ম। জ্ঞানবিচার যোগে বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে কর্ম সমাধান করি, তা প্রজ্ঞার আশ্রিত। আর হৃদয়ের তাগিদে যখন কর্ম করি তাতে রস পাই, তখন তাতে প্রেমের কথা আসে। এ ছাড়াও দেখা যায়, এক প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে কর্ম যেন আপনা থেকেই স্ফুরিত হয়ে চলেছে ; তাকে বলতে পারি প্রাণের কর্ম। সে তো শুধু কর্মশক্তির চঞ্চলতা নয় ; যখন শক্তি নামে, তাকে গুছিয়ে নিয়ে ছন্দোময় করে কর্মে বিনিয়োগ করতে হয়। এভাবে সব রকমেই কর্ম যজ্ঞে রূপান্তরিত হবে, এই হল কর্মযোগের দায়।

কর্মযোগে সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে আন্তর কর্ম হল ভাবনা। কর্ম করার সঙ্গে যোগ রেখে, আন্তর ভাবনাটিও অবিচ্ছিন্নভাবে শুদ্ধ রাখতে হবে। ব্রহ্মের সঙ্গে কর্মের মধ্য দিয়েও কি ভাবে মিলন ঘটে, সেটা বুঝতে হবে। এই ছোট অহংকে

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

ছাপিয়ে ওঠা দরকার, তাহলে সহজভাবে সেখানে সবই ঘটে যায়। কিন্তু নিজের প্রতপ্ত অহংকারকে জাগিয়ে যখন কিছু ঘটিয়ে তুলি, তখন এক অহংএর সঙ্গে অপর এক অহংএর ঠোকাঠুকিতে এক বিকৃত উল্লাস দেখা দেয়। তাতে যজ্ঞ পণ্ড হয়, কর্মযোগ হয় না। প্রজ্ঞাযুক্ত প্রাণে প্রেম সঞ্জীবিত হয়, তাই এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার কর্মই মূল তত্ত্ব। মনে রাখতে হবে, "যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্"...। যা থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি এবং এই সমস্ত জগৎ যা দিয়ে ব্যাপ্ত, তাঁরই উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ কর্ম করে আত্মনিবেদন সার্থক করে তোলা কর্মযোগের সাধনা। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তাঁর স্বরূপ-শক্তিতেই কর্ম। সেই শক্তিকে ছাপিয়ে এক অসৎ (Pure Transcendence)—এই আভাস চেতনাকে কর্মের মাঝে সর্বদা ধরে থাকবে। পাওয়া ও না-পাওয়া দুই মিলিয়ে এক পরম অস্তিভাব, তাতে হাঁ ও না দুইই থাকতে পারে। প্রজ্ঞা যেন পুরুষ, আর প্রেম যেন প্রকৃতি। পরম পুরুষ দ্রষ্টা হয়ে পরমা প্রকৃতিকে ধরে রেখেছেন ; পরমা প্রকৃতিই সব কিছু হয়েছেন, আর তখন পুরুষ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। বিশ্বসৃষ্টিতে এইভাবে তাঁর প্রেমেই কর্ম মধুর হয়ে ওঠে। জগৎলীলায় তিনিই প্রকাশিত, শক্তির ঐশ্বর্যে তিনিই প্রতিষ্ঠিত। শক্তিকে নিয়েই তিনি পূর্ণ। তাই তাঁর কর্ম সত্য, বিশ্বকর্ম তাঁরই কর্ম। শিব শক্তি ও জীব এই তিন ভাব নিয়েই কর্ম সম্পন্ন হবে। গীতায় ভগবান বলেছেন "মহৎ কর্মপরমো ভব"। তাঁর কর্ম করে তিনি হয়ে যেতে হবে। মানুষ হয়ে জন্মেছি মায়ার ঘরে, মহামায়ার বরে শিব হয়ে যেতে পারি। এই যজ্ঞকর্ম সৃষ্টিতে হয়ে চলেছে। তাঁরই কর্ম ; তাই দায় তো আমার নয়, তাঁর। এই সঙ্গে কর্মে জাগে এক রস-পিপাসা। যে বিচিত্র স্বাদ এই জগৎ-সৃষ্টির যজ্ঞে বহমান, তাকেও আস্বাদন করতে হবে, আর তখনই কর্ম হয় প্রেমেরও কর্ম।

কর্ম যখন জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে তোলে, তখন মানুষের জীবনে জিজ্ঞাসা জাগে। এ জিজ্ঞাসাও আমাদের জীবনকে দুধারায় প্রভাবিত করে—জগৎ-জিজ্ঞাসা আর আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদে আমরা পেয়েছি বিদ্যার সাধনার কথা। সেখানে বিদ্যাকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে, পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। ছান্দোগ্যোপনিষদ আমাদের শুনিয়েছেন নারদ সনৎকুমারের সংবাদ। নারদ ছিলেন তথাকথিত জ্ঞানী, তিনি মন্ত্রবিৎ হয়েই এসেছিলেন সনৎকুমারের কাছে। সনৎকুমার তাকে ভূমার বিজ্ঞান দিয়ে ভূমানন্দে পৌঁছে দিলেন। বিজ্ঞান বোধিজ প্রত্যয়, ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে জানা হল বিজ্ঞান। তখন দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান হয় আত্মারই অথবা ভূমারই। পুরুষ তখন স্বরাট। চেতনার যে কোন ভূমিতে তখন তাঁর অবাধ গতি এই হল স্বারাজ্যমুক্তির সিদ্ধি। এক কথায় পরাবিদ্যা দিয়ে অক্ষর তত্ত্বকে জানা চলে। কিন্তু পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার মাঝে মৌলিক কোন বিরোধ নেই, কেননা দুটিই এক পরমা প্রজ্ঞার প্রকাশ। বোধির রাজ্য থেকে নেমে পরা-বিদ্যা মানুষের মনের রাজ্যে এসে দর্শন আর ধর্মের রূপ নিয়েছে। এদিকে অপরা বিদ্যার কারবার লোকো-

স্তর নিয়ে নয় লৌকিক নিয়ে। বিজ্ঞানের সহায়ে সে চায় প্রকৃতির শক্তি আয়ত্ত করতে, শিল্পে আর কলায় রস-চেতনাকে মুক্তি দিতে, এই ঐহিক জীবনকেই মেনে বুঝে তাকে সমৃদ্ধ করতে। বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধক বিদ্যার সাধনায় লোকোত্তর আর লৌকিকে কোন বিরোধ দেখেন না। উপনিষদ বলেছেন তাঁরই পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার মধ্যে তাঁর আলো পড়লে হয় পরা বিদ্যা, এই হল সমাধান। যখন পরা বিদ্যার অনুশীলনে তাঁকেই সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে একান্তভাবে চেয়ে উজিয়ে যাই, তখন অপরা বিদ্যার প্রতি প্রত্যাখ্যানের মনোভাব আসে। কিন্তু আবার সবই তিনি, এই ভাবের দর্শনে যখন পূর্ণতা লাভ করি, তখন আর প্রত্যাখ্যানের কথাই ওঠে না। অপরা বিদ্যা তখন পরা-বিদ্যারই বিভূতি, তারই অধীন।

এ যুগে বিদ্যার সাধনায় মানব জীবনে যে মূল্যবোধ এখন স্থান অধিকার করে আছে, তা হল ধর্ম দর্শন শিল্প ও বিজ্ঞান (Science)। এই চারটি মূল্যবোধের পরেই দিব্য-জীবনের আলো এসে পড়বে, সেটাও দিব্যজীবনের জ্ঞানের সাধনা। গতানুগতিক শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা তো আছেই, কিন্তু কোন সাধকের যোগে এ বিষয়ে যদি এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে যায়, তাকে বলা হয় প্রতিভা। এতে তখন এমন কিছু যুক্ত হয়, যাতে বিদ্যার সাধনায় সব কিছুকে নতুন আলোয় উজ্জ্বল করে দেয়। ঊর্ধ্বতন লোক থেকে এই আলোক সম্পাত সাধকের নিজের কাছেই এক বিস্ময়বোধ নিয়ে আসে। তাকে বলে প্রতিভ সংবিৎ (Intuitive Faculty)। এই রকমে হলে, তবেই অপরা বিদ্যার রূপান্তর ঘটে। প্রাণময় সত্তার ইষ্টার্থের বোধের ওপরেই, বিজ্ঞানের আলো পড়ে তার যথার্থ মূল্য দেখিয়ে ও চিনিয়ে দেয়। তখনই বিদ্যা ও অবিদ্যার কৃত্রিম বিরোধের অবসান হয় এবং বিদ্যার দ্বারাই অমৃত সম্ভোগ করা যায়।

মানুষের জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তখন সাধারণ ভাবে তার দুটি ধরণ দেখা যায়—কেন এবং কেমন করে (Why and How)। পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেন, কেন এর জবাব দেয় দর্শন এবং কেমন করে এর জবাব দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী যথাসম্ভব তার তথ্যগুলি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেন, কি ভাবে জ্ঞান লাভ করলে সব জানা যাবে ; কিন্তু কেন সেরকমটি হল, সে কথার উত্তর তার কাছে মিলবে না। এই রকমটি যে হয়, এটাই ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের জিজ্ঞাসার বৈশিষ্ট্য হল এই, যে শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিয়েই সে তৃপ্ত থাকতে পারে না। ভাব দিয়েও সে জানতে ও বুঝতে চায়। ব্যক্তিগতভাবে নিজের সংগৃহীত জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞানে পর্যবসিত করে সে পায় বিশ্বগত (universalised) জ্ঞান। মানুষকে তখন বলা হয় মনস্বী। তাই মানুষ থেমে থাকতে পারে না। তার অহেতুকী প্রশ্ন জাগে "কেন"? এ জগৎ কি, তার মূলই বা কি, আমি কি ও কে, কোথায় যাব, জীবনের লক্ষ্য কি ইত্যাদি,। এ প্রশ্ন দৈনন্দিন অনুগত জীবনের প্রশ্ন নয়।

কেন এমন হল, এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে খেই হারিয়ে না ফেলে, সমস্ত জীবন দর্শন দিয়ে ব্যক্তির জীবনের যেটি জরুরী সমস্যা, তার সমাধান করা—এটাই দর্শনের দিক। এটা অতি সূক্ষ্ম বস্তু (abstract), হয়তো জীবনের ব্যবহারিক কর্মে লাগে না। কিন্তু এই অনুভূতি জাগিলে, তার উৎস ও লক্ষ্য বুঝে, তাকে রূপ ও ভাষা দেওয়াও মানুষের এক দায়। এ আকাঙ্ক্ষা জীবন জিজ্ঞাসারই এক দিক। কিন্তু এতে সাবধান হতে হয় যে, সে দর্শনের ফল যেন জীবনের অনুগামী হয়। মানুষের ব্যবহারে সেটা এমন ভাবে লাগা চাই, যাতে ভাবের দিক দিয়ে তা তাকে বৃহতে ব্যাপ্ত করতে পারে। এই ভাবের জানা আরও গভীরে তখন আর এক জানায় নিয়ে যায়, তাকে বলে ধর্ম-জিজ্ঞাসা। হৃদয়ের আলোর পিপাসা থেকেই এই আকৃতি আসে।

সাধারণত ধর্মের সংস্কার নিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। যেমন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই তার জন্ম ও পরিবেশ থেকে এক ধর্মবোধ লাভ করে। এটা সমাজগত; কিন্তু এ থেকে কারও ধর্মজিজ্ঞাসার সূক্ষ্মে ও গভীরে প্রবেশ করলে, সেটা ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সে রসপিপাসা জীবনের গভীরের মূল রসসঞ্চারীকে চায়। নাড়ীতে নাড়ীতে সর্বাঙ্গব্যাপী তার প্রবাহ সঞ্চারমান না অনুভব করা পর্যন্ত তাকে তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত করা যায় না। আমরা এদেশে প্রকৃত ধর্মবোধ বলতে জীবনের সবটাই বুঝি। যে-সব উৎসবের আচার ধর্মানুষ্ঠানের বার মাসে তের পার্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলি জীবনের রসেই সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করার প্রয়াসী। শ্রীঅরবিন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে, ধর্মের আচরণে মোহগ্রস্ত হয়ে গণ্ডিবাঁধা এক গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ে যে ব্যক্তিগত বিকার—যা থেকে সিদ্ধাই আসে, তা মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তাই সামান্য শক্তি লাভ করে বাহিরে প্রচার করে বেড়ানো, মিথ্যা ভাবালুতা নিয়ে স্বার্থমগ্ন হয়ে থাকা, ভাবে উন্মত্ত হওয়া, দাসত্ব করা—এই সব চেতনা অসাড় হয়ে যন্ত্রবৎ বাঁধাধরা পথ ধরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সব ধর্ম ও দর্শনের বিকৃতি, আমাদের চিত্তের ও বুদ্ধির অশুদ্ধি ও তদ্‌জনিত বিকারের ফল।

কিন্তু ধর্ম ও দর্শন আমাদের অন্তরের বস্তু, তা পরা বিদ্যারই আশ্রিত। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে যেমন জ্ঞান লাভ করতে হয়, তেমনি আবার সেই জ্ঞানের আলোয় বাহিরটা দেখতে ও জানতে হয়। সেজন্য ধর্ম ও দর্শন প্রকৃত ভাবে অনুশীলন করতে পারলে পরাবিদ্যায় বিষান হওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে জীবনের কর্মকে জানতে হয় ও কলা কৌশলে (Art) সেই কর্ম সমাধান করতে হয়। জাগ্রতের জীবনে আমরা যে মন দিয়ে জ্ঞান আহরণ করি, এই বিজ্ঞানের এলাকা সাধারণভাবে তাকে অতিক্রম করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই জ্ঞান লাভ করতে চায়। মনের গভীরে যথাসাধ্য অনুপ্রবেশ করে ও তথ্য সংগ্রহ করে সে তত্ত্বটি

উদঘাটন করতে চায়। কিন্তু মনের এ দেখা পরাক্ দর্শন (Objective vision), প্রত্যক্ দর্শন (Subjective vision) নয়। এ থেকে প্রাণবিজ্ঞান (Biology) মনোবিজ্ঞান (Psychlology), এ সবের বহুমূল্য তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জাগ্রত চেতনার স্তরগুলি পেরিয়ে গিয়েও এই বিদ্যার বিষয় সূক্ষ্মচেতনাসঞ্চারী হয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত। কিন্তু এ সব বিদ্যাকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় করে রাখা হয়েছে; বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়চেতনাকে একাকার করে তত্ত্বটিকে অনুশীলন করা হয়নি। তাই বহু শিল্পী ও বিজ্ঞানীর জীবনের ব্যাবহারিক দিকটা অতিশয় অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হতে দেখা যায়। তারা যেন সব স্বপ্নসঞ্চারী শক্তিতে (Somnambulist) জ্ঞানলোকের ঐশ্বর্য অপহরণ করে চলেছে, মূলের সন্ধান পায়নি। সেই কারণেই তাদের মনীষা থেকে বড় জোর এক যান্ত্রিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ উপকরণবহুল সমাজ আড়ষ্টভাবে কিছুকালের জন্য উন্নত বলে দেখা দিতে পারে। কিন্তু মানুষের তো শুধু তা নিয়ে চলবে না।

যথার্থ অভ্যুদয়ের পথে সমাজকে তুলে নিতে হলে মানুষের আত্মগুহার গভীরে গিয়ে মূলের সন্ধান লাভ করে, সেখানে রস সঞ্চার করতে হবে। আর সেটা হবে মানুষের নিজের গরজে—অন্তরাত্মার আহ্বানে। মানবিকতা বা মানুষের ধর্মবোধ এযুগের চেতনায় একটা বড় স্থান অধিকার করেছে। মানুষকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে, সেকথা ঠিক। কিন্তু সে কোন মানুষ? 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলে এ দেশের বাউল যে মানুষের প্রেমেই প্রাণের প্রদীপটি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে আরতি করেছেন। মানুষ হয়ে যে কেন জন্মেছি, অগণিত কোটি কোটি জীব সৃষ্ট হয়ে চলেছে কেন, তা কি আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি? তাই তো মনের মানুষ নিত্য মানুষ বলে আমরা যে মানুষকে ভালবেসে আত্মহারা হতে চাই, তাতে শুধু ইন্দ্রিয়সর্বস্ব আটপৌরে জীবরূপে মানুষকে পেলেই তো আর হবে না। প্রতিটি মানুষে হৃদিসন্নিবিষ্ট পুরুষটি যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁকে দেখে তাঁর ইচ্ছাটি ধরতে পারলে, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য বোঝা যাবে ও ওই সঙ্গেই প্রতিটি মানবের জীবনের সার্থকতা ধরা পড়বে। শুধু পরিমাণের (quantity) মূল্যায়নেই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণায় যেমন আছে বিস্তারের দিক, তেমনি আছে গভীরে রসের দিক। এই রসপিপাসার তাগিদেই মানুষ ভাস্কর্য চিত্র সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকলা সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে চলেছে। তার সীমানা লোক থেকে লোকোত্তরের রাজ্যে উধাও হয়ে গেছে। এতে মানুষের লাভ হয়েছে, অতীন্দ্রিয় রসলোকের ও সৌন্দর্যলোকের আভাসে মানবমন অমৃতত্বের আস্বাদ পেয়েছে। এই ভাবেই তার কাছে ধ্যানের ভূমিগুলি অবাধিত হয়ে চিত্তে মুক্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু এই শিল্পবোধ যদি আবার চিত্তের বিকারে মগ্ন হয়ে, তাকেই বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করে প্রাকৃত নেশায় মনকে বুঁদ করে রাখতে চায়, সেটা হবে চেতনার অবক্ষয়। শিল্পকলা (Art) নিয়ে এরকম এক হিজিবিজির

যুগও এখন কিছু পরিবাণে এসে পড়েছে। তাকে কোনমতেই রসোত্তীর্ণ বলা যায় না। সেটা Art-র অবক্ষয় (decadence) সূচিত করে। এগুলি হল রসতৃষ্ণার মরীচিকা, মরুদ্যান নয়।

দর্শন ধর্ম শিল্প বিজ্ঞান এই চারটি বিদ্যাকেই দিব্য জীবনে তুলে নিতে হবে। তা করতে গেলে উপনিষদ যেমন বলেছেন, সেই রকম অসীম ভূমা হয়ে যেতে হবে। আমরা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই অসীমের উল্লাসেই প্রকৃতি সব কিছু হয়ে চলেছে, যথার্থ জীবনশিল্পকে ফুটিয়ে তুলছে। সেই ঋতিকে আশ্রয় করলে বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্যও প্রতিভাত হবে। সেই কারণেই মনন ও বুদ্ধিকে ভূমার ব্যাপ্তিতে রক্ষা করতে হবে, এই সাধনটি চাই। যে ভাবে এটা সম্ভব হয়, সেই ব্রহ্মকারা বৃত্তিই হল বোধি। বুদ্ধির সহায়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বোধির আলো হারিয়ে ফেললে বিরোধ দেখা দেয়; গণ্ডি-বাঁধা মনুষ্যের বুদ্ধিতে অনেক সময় একগুয়েমি এসে এক পাথরের দেয়ালের মত নিরেট বাধা সৃষ্টি করে। তখন সে ওপরের আলো নিতেও চায়না, ভাবে বেশ আছি। কিন্তু বেশ যে নেই বা ওভাবে বেশ থাকা যায় না, তা আমরা জীবনের প্রতিপদেই বুঝতে পারছি। সারা পৃথিবীতেই হানাহানি ও মতবিরোধ বেড়েই চলেছে। সমস্ত দেশগুলি যুক্তিসহকারে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে U.N.O. গড়ে তুলেও তার সমাধান করতে পারছে কি? তাই বুদ্ধির শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় সাধন এবং বোধিকে সত্য বলে জেনে বুদ্ধি তার অনুগত হলেই সেটা সম্ভব হবে। এই ভাবে অসীম ও অনন্তের সঙ্গে যোগ রেখে ব্যক্তিগত জীবনও সফল হতে পারবে। কেননা সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধি খাটিয়েই চলতে হয়। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মায়ের সঙ্গে যোগ থাকলে মা-ই রাশ ঠেলে দেন। আলোর মত সহজে সেই সত্য বিকশিত হয়; সেই বোধির আলোতে বুদ্ধিকে যুক্ত করতে হবে। এইভাবেই প্রতিভা স্ফুরিত হয়।

"সাবিত্রী"তে কবি বলেছেন Musings of eternity। নিদাঘের শুষ্ক দ্বিপ্রহরে কপোতকূজনের মত তার বাণী অগাধ অতল নৈঃশব্দ্যের গহন হতে ঝরে পড়ে; মন বুদ্ধি সেখানে থৈ পায় না, ডুবে নিশ্চল হয়ে যায়। এই শরীর যন্ত্রের যান্ত্রিক জানাকে অতিক্রম করে ওই বৃহৎ জানাকে পেতে হবে। এ যেন দরজা জানালা সব হাট করে খুলে নেলে দিয়ে জানা; এ জানার এক আরামও আছে এবং এতে না পারার কথা নেই। উপ-নিষদের আকাশ ভাবনাকেও এই ভাবে বুঝে নিতে পারি। সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মীনের মত বিচরণ করা এই ভাবেরই সাধন। এতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিভার আলোয় মার্জিত ও দীপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ মন নিয়েই তো আমার যজ্ঞভাবনা। এই অণুরও অণু রয়েছে মহতেরও মহীয়ানের মধ্যে, আর সেই অণুর মধ্যেই বনস্পতির বীজের মত মহৎ ও বৃহৎ তার সমগ্রশক্তি ও সম্ভাবনা নিয়েই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই ভাবে অসীম ও অনন্তের ভাবনায় এর

ঘুম ভাঙিয়ে এই জড় আয়তনকে রূপান্তরিত করতে হবে। কর্মকে তাই প্রত্যাখ্যান না করে, ও যথাবিহিত কর্ম করে আমার এই ভূমিকাটি যথাসম্ভব নিখুঁৎ ভাবে সম্পাদিত করতে হবে। কিন্তু সে কর্ম ও তার সম্পাদনা ভুবারই, তার উদ্দেশ্য যজ্ঞেশ্বর বা মহাশক্তিতে পৌঁছান। সবই তো তোমার, সূর্যের আলোর মত সর্বাবগাহী তোমার প্রকাশ। "প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামি দাঁড়াব তোমার সম্মুখে"—এই বলে প্রতিদিনকার সব কর্ম তোমার দৃষ্টির সামনে সম্পন্ন করে, তোমাতেই নিবেদিত হয়ে চলেছি। এমনি করেই অংহ বা অহং এর ক্লিষ্টতা ও ক্ষুদ্রতার জট খুলে যায়, আর শুদ্ধ আবিতে সৌর কিরণগুলি স্নিগ্ধ হয়ে চাঁদের আলোয় পরিণত হয়।

এই ভাবে কর্মের গতি উর্ধ্বগ হয়। ছোট কাজ বলে কোন কিছুকে তুচ্ছ ভাবতে নেই, সব কিছুই তো বৃহতের আলোয় অপক্ষপাতে সম্পাদিত হয়ে চলেছে। আশ্রমে, যেমন দেখতে পাই, Mother এর দৃষ্টির সামনে তাঁরই শক্তিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব রকম কর্মের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে। যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করলে দীপশিখার মত উর্ধ্বমুখী ধারা যেমন উজানে চলে, সেই সঙ্গে আদিত্যপুরুষের সোনের ধারা নেমে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই হল জগতের সৃষ্টিতে কর্মের গতির মূল রহস্য—অগ্নীষোমাত্মক জগৎ। জগতের ধারণ ও পূরণের ভারসাম্য এইভাবে অগ্নি ও সোম আদিত্যের শক্তিতে রক্ষা করেন। অনন্তের ভাবনায় কর্ম করতে এই ভাবের আরোপে দেখা যায়, তাঁর শক্তিই আমার কর্মকে রূপান্তরিত করে নিয়ে চলেছে। প্রথমে তিনি করান, যেন হাতে ধরে নিয়ে যান। তারপর বোধে আসে, তিনিই করছেন। তখন শুদ্ধ আবির নির্বিকার দ্রষ্টৃত্ব ও তাঁর আবেশের ফলে প্রাকৃত চেতনার রূপান্তর শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই চেতনার পরিবর্তনের দিকেই বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলেছেন। সে যেন এক অঘটন ঘটে যাবার মত জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়, ইষ্টার্থের বোধও তখন বদলে যায়। সত্যাত্ম চৈত্যপুরুষের দৃষ্টিপাতে প্রকৃতির রূপান্তরের কর্ম সার্থক হবার পথে চলে; শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থার নাম দিয়েছেন Psychisation চৈত্যরূপান্তর। এই আত্ম-আবিষ্কারের পথে হৃদয় খুলে যায়, বিরাট জগতের সঙ্গে প্রেমের আলিঙ্গনে মন আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁকে কেন্দ্র করে আমার সব কর্ম উদ্‌যাপিত হতে দেখি, চৈত্যপুরুষ তার পুরোহিত। এতদিনে অন্ধের মত আপনাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলেছিলাম। তাঁকে কেন্দ্রে রেখে কর্মের পরিক্রমার ভাবনার ধারা বদলে যায়, সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরে নির্ভর করে সহজে তাঁর কর্মের ভার বহন করা যায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহের পরিক্রমা দেখিয়ে কপার্নিকাস্ যেমন চিন্তা-জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, এও সেইরকমভাবে জীবনের এক কমুরেখ আবর্ত উর্ধ্বগ সহজ গতিপথ সূচিত করে। জীবন সহজ হয়ে যায় আর তাঁকে নিবেদন করার ইচ্ছাটুকুই

অবশিষ্ট থাকে। বিরাটে চেতনার ব্যাপ্তি সর্বদা কর্মের সঙ্গী থাকে বলে, কর্মের বিক্ষোভে দুঃখ ও অবসাদ আর পেড়ে ফেলতে পারে না।

এইরকম করে তাঁকে চেয়ে যত তাঁর সমীপবর্তী হব, ততই চিত্তের উদারতা বেড়ে যাবে, সঙ্কীর্ণতা থাকবে না। তাই চেতনাতে যত কিছু খাঁজ পড়েছে বা খরচে পড়ে স্থানে স্থানে করকর করছে, সে সবই তাঁর দৃষ্টিশক্তির সামনে খুলে ধরতে হয়। তাহলে সেগুলি সবই আবার তাঁর শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ রেখে চলার পথে প্রত্যেকের স্বধর্ম অনুযায়ী নিজস্ব পথ করে নিতে হবে। হৃদিস্থিত দেবতাতে একান্তী হয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে জানার পথে কর্মযোগে এক তৃপ্তি ও স্বাদ আছে। প্রথমে সে উজ্জ্বল রসধারাটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত বইতে থাকে। কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগটি সুদৃঢ় ভাবে ধরতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। বহু ধারা এসে তাতে মিলিত হয়ে তাকে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলে। রামকৃষ্ণদেব যেমন দেখিয়ে গেছেন, সেই রকম সব রকমের সাধকের সঙ্গে অন্তর-ভাবে রসাস্বাদন করা যায়। অসীমকে জানার উল্লাসে সেইরকম মহাশক্তিশালী প্রতিভার পরিচয় পেলে, পূর্ণযোগের সাধকও বহুবিচিত্র পথের আলোতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন পাঁচডেলে হওয়ার কথা। ঈশ্বরের লীলা আস্বাদনের তো অন্ত নেই, তার কত বৈচিত্র্য। তাই সাধনপথেও কর্মযোগ শুরু করার পর কত কর্ম খোলসের মত খসে পড়ে, আবার যেন নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, সব কর্মের ধারাগুলি এসে মিলেছে; কোনটি হারায়নি, কিছু খোয়া যায়নি, সবগুলি একত্র গ্রথিত হয়ে বিরাট এক ধারা সাগরসমান সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে সব কর্মের সার্থকতা। চেতনা যেমন ব্যাপ্ত হয়ে বৃহৎ হবে, সেই বৃহৎ সামের ছন্দে জীবনের সব কিছুই তেমন ছন্দোময় হবে। ঈশ্বরের কর্ম বলেই সংসারের তুচ্ছ কর্মও বৃহতের আবেশে সরস হয়ে উঠবে, জীবন সহজ ও সুন্দর হবে।

তাহলে এই সহজ অবস্থার গতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎসর্গের ধারাটি কিভাবে তার লক্ষ্যে পরিণতি লাভ করছে। প্রথম ভাবটি হল আমার সব কিছু তোমার। সমস্ত জীবন ধূপ-শিখার মত জ্বলে তোমার দিকেই উড়ে চলেছে। দ্বিতীয় অবস্থার ভাব এলে দেখি, এ তো অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিইনি; তিনিই তো এসে তাঁর কর্মের ভার দিয়ে আমাকে তার নিমিত্ত করেছেন। এ ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি আমি হয়ে গেছেন। দূরে তুমি অসীম,অন্তিকে তুমিই সসীম। তখন শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি বদলে যায়, আর তোমাকে কেন্দ্র করে ঊর্ধ্বগতি হলে দেখি—এ আমি তুমিই। এইভাবে অসীমের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ হয়। মন ও বুদ্ধির ওপারে ঈশ্বরের জ্ঞান হলে বোধির রাজ্য খুলে যেতে থাকে। তখন সেই প্রজ্ঞার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রজ্ঞার কর্ম সিদ্ধ হয়ে চলে। চৈত্যপুরুষ পুরোধা হয়ে এই সহজ অবস্থাকেই নিয়ে যান ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতায়। তখন ষোড়শকল আধ্যার সিদ্ধিতে এক

মহাসবনুয়ী শক্তির আবির্ভাবে প্রকৃতির বহত্তর চিন্ময় রূপান্তর সাধিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এরও আগে নিয়ে গেছেন তাঁর পরম সবনুয়ী সিদ্ধিকে, যাকে বলেছেন অতিমানসী সিদ্ধি ও অতিমানস রূপান্তর (Supramentalisation, supramental transformation)। কিন্তু সিদ্ধচেতনাতেও সে অনেক পরের অবস্থা।

বোধির কথা আমরা অনেকবার উল্লেখ করে থাকি। মন দিয়ে শুধু ভাবনা করে, তাকেই অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, যতক্ষণ তার উপরে বোধির আলো এসে না পড়ে। পূর্ণযোগের সাধনে এই বোধির ঘটকত্ব অপরিহার্য। এই বোধির আলোয় মনও নতুন করে আবার গড়ে ওঠে। তখন মনের মধ্যে দ্বিধা বৃত্তি চলতে থাকে। সূর্যের আলোর মত তাঁর চৈতন্যের আলোর মাঝেই তিনি ঘিরে রেখেছেন—এই বোধই মনকে বোধির সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু মন যাবার অন্য সময় বলে, তাঁকে এত ডাকি তবু পাইনে কেন? তখন মনকে জোর করে একাগ্র করতে চাই। কিন্তু তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাকে একমুখী করলে কিছুতেই তা বশে আসে না। কিন্তু চেতনার সবটা মন প্রাণ দেহ একই সঙ্গে শিথিল করে দিয়ে যদি তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিই; তিনি তাঁরই শক্তিতে নেমে আসেন আমার এই স্থির সুখাসনে। তখন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আবির্ভাবে হৃদয় আপ্লুত হলে, মন স্বভাবতই তাতে একাগ্র হয়। তাতে কর্মের মাননাও সহজ হয়ে যায়। তখন দেখতে পাই, একেবারে দৃশ্যমান পর্জন্যের মত তাঁরই করুণার ধারাসারে তিনি আমাকে শুচিস্নিগ্ধ করে ধৌত করে একেবারে ভরে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চেয়ে আছেন বলেই না তাঁকে চেয়ে চলেছি। এইভাবে চলার পথে অহংগ্রন্থির বাধাগুলি সব খুলে পথ সহজ হতে থাকে। তখন অনুভূতির রাজ্যে বোধই ব্যাপ্তিরূপে চতুর্দিক আবৃত করে। সর্বব্যাপী বিশ্ব তো তাঁরই ছটা, তাঁর অনন্ত রূপই ইষ্টরূপে বিগ্রহে বিগ্রহে প্রতিভাত—যেমন অন্তরে তেমনি বাহিরে। এইভাবে তাঁরই সঙ্গে নিত্যযুক্ত মনটি এই মনেরই উর্ধ্বতন স্তরে বিরাজিত, সেই জ্ঞান লাভ হলে এই মনেরও রূপান্তর সম্ভব হবে। এমনি করেই আকাশভরা আলো বা আকাশভরা আঁধারে, তিনি আমাকে আবিষ্ট করে আবৃত করে রেখেছেন; সর্বদেহব্যাপী এই বোধটি অবাধে নেমে এলে চেতনা রূপান্তরিত হয়ে স্বচ্ছ হতে থাকে আর উষার উদয়ের মত চেতনার ক্ষেত্রগুলি উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল করে চিদাকাশে তিনি উদিত হন। সেই রূপান্তরিত চেতনায় মন তাঁরই কাজ করে চলে। ঐহিক ক্ষেত্রের বাধাগুলির পরে আলো পড়লে মনই তাদের খুঁচিয়ে বিবর থেকে বাহিরে নিয়ে আসে। তখন সেগুলি দেখে বোঝা যায় যে কত কাজই বাকী আছে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা বারবার বলেছেন, "Open yourself to the Mother—মায়ের কাছে আপনাকে খুলে ধর।" তার অর্থ হল এই। মন নীচে নেমে যায়, বোধি জাগ্রত হয়ে কার্যকরী হয়ে ওঠে আর মায়ের শক্তিতেই কাজ চলতে থাকে। চৈত্যপুরুষ তখন হৃদয়পুরে জেগে ওঠেন।

এই রূপান্তরিত চেতনাই নবজন্মের ফল। বৈষ্ণবেরা তাকে বলেছেন রাগের মানুষ, তার জন্ম তো যোনিতে নয়। এই নবীন ভাবসত্তা নিবিড় হতে থাকে, পরে সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর জ্ঞানের আলোই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে বারবার সব আলোময় করে দিতে থাকে, তাতে প্রতিভাও দেখা দেয়। কামময় অহং বা কামপুরুষটি এতদিন যে আসনটি জবরদখল করে চেকে রেখেছিল, সেই আমিটি সরে যায়। তাঁর আসনে হৃদয়পুরে তিনিই সমাসীন হয়ে এই নিমিত্ত আমিকে যন্ত্র করে পরিচালনা করেন, এই বোধ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এমনি করে যে মনটি নবজন্ম লাভ করে, সেটি চিদ্‌ভাবিত মন (Spiritualised Mind)—অধ্যাত্মচেতনায় সেটি চিদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু মনের সংস্কার তখনও থাকে, তার প্রাকৃত স্বভাবটিও অপরিবর্তিত থাকে। তাই সিদ্ধির উপান্তে এসেও সে মন ভুল করে, এমন সম্ভাবনা থাকে। তা থেকে আসে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও অন্য-মতাসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে থাকি। তাতে সমগ্র সত্যের সম্যক্ জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দুতে না দেখা পর্যন্ত মানস সংস্কার শেষ পর্যন্ত যেন গিয়েও যায় না। দিব্যমনের ক্ষেত্রটুকু বেছে নিয়ে কর্ম চললে সে মনের কর্ম চমৎকার চলে, কিন্তু মনের অবর ক্ষেত্রগুলি সে আলোয় তখনও ঢাকা পড়ে থাকে। তাই অতিমানস বিজ্ঞান যে মনের ওপারে অতিমানসলোকে, সেইখানে এই মনকে পৌঁছতে হবে, তবেই মনের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হতে পারবে। চিদ্‌ভাবিত মন ব্যাপ্তি-চৈতন্যে মুক্তিলাভ করে, তাতে বিজ্ঞানের আলো এসে পড়ে। তবুও তার প্রাকৃত সংস্কারগুলি মগ্নচেতনায় ঢাকা থাকতে পারে, আর সেই কারণেই সমস্ত সাধনা সেখানেই নিরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

অতিমানস বিজ্ঞানলোকে পৌঁছানোর কয়েকটি ভূমি ক্রমপরম্পরা হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন। মনকে ক্রমসূক্ষ্ম করে তুলে নিয়ে গলিয়ে রূপান্তরিত করতে হবে, এই প্রজ্ঞার কর্ম। মানস বৃত্তিগুলি জোর করে যেমন বন্ধ করা যায় না, তেমন আবার ওপরের আলো জোর করে টেনে নামালেও অশুভ সংস্কারগুলি অব্যক্ত মনের অংশে চলে গিয়ে পরে আরও জোরালো ভাবে সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। পূর্ণযোগের পথ সর্বাবগাহী পূর্ণতার পথ। মনের সম্যক্ পূর্ণতাও ওই অতিমানসে। যে কোন পথ ধরেই মন জ্ঞানের চূড়ায় পৌঁছতে পারে, কিন্তু অনন্তের ঐশ্বর্য অনন্তভাবে তাতে জানা যায় না। মনকে কেটে ফেলে দিতে হবে না ; সর্বগ্রাসী অনন্ত চেতনার অধিষ্ঠানে বিজ্ঞানের বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়েই, সম্যক্ জ্ঞানে মন পূর্ণতা লাভ করবে। উত্তর-মানস (Higher Mind), প্রভাস-মানস (Illumined Mind), বোধি-মানস (Intuitive Mind) এবং অধি-মানস (Over-Mind)—অতিমানস (Supermind) পর্যন্ত মনের এই ভূমিগুলি অদ্বৈতচেতনায় সিদ্ধমনের ভূমি। তারও আগে যেতে হবে। এক নির্মুক্ত চেতনায় দিব্যমনের লক্ষণ

আবেশে স্ফুরিত হতে থাকে। অতিমানসের পানে উত্তরায়ণের পথে ওই চারটিই মানসোত্তর বিজ্ঞানের ভূমি ; এগুলিকে যথাসম্ভব বুঝে নেওয়া যাক।

প্রাকৃত মনের সঙ্গে উত্তর-মানসের মূল বিভেদ হল এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনের সংস্কার ছাপিয়ে উত্তর-মানসের দৃষ্টি চলে যায় তার পিছনের ভাবে। তখন গোড়ায় থাকে ভাব ও তা থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ। সে ভাব বিশ্বগ্রাহ্য। সেজন্য দেখা যায়, ইষ্টদর্শন বা ধ্যানজ্যোতি-দর্শন লাভ হলে তাই ধরে সে পথের নিশানা পায়। সে দর্শনের ভাব তার কাছে ইন্দ্রিয়-দর্শনের চেয়ে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। তাই রূপদর্শন উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেলেও, আবছা ভাবের মত সব সময় সেটি যেন ইন্দ্রিয়-সংবিতের পিছনে থাকে। ক্রমে ভাব এত বেশি জীবন্ত ও ঘনন্ত হতে থাকে যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দর্শনের ভিতরে উত্তর-মানসের অন্তর্দৃষ্টি পড়ে বহির্দৃষ্টিও সেই ভাবে ভাবিত হয়। বিষয় ও বিষয়ী একেরই দুটি মেরু—এই ভাবে দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি ও দৃশ্য একেরই বিভঙ্গ হয়ে দেখা দেয়। ব্রহ্মই সব হয়ে সব দেখছেন, তাই এই ভাবের আবেশে ধূলিকণার মধ্যেও সৌরজগতের মহিমা দৃষ্ট হয়। এইভাবে ব্যাপ্তিচৈতন্যের আধারে ক্রমে আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হতে থাকে, আর প্রভাস-মানস ইত্যাদি পরপর ভূমিতে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে চলে।

প্রভাস-মানসে বিচিত্র রূপে গাঢ় ভাবের প্রকাশ হতে থাকে, ইষ্টমূর্তি যেমন ঘনীভূত হয় চিৎএর উদ্ভাসে। সূর্যের আলো যেমন গাছের মধ্যে পড়ে তার বিশিষ্ট বর্ণটি বিচ্ছুরিত করে দেয়, এ ভূমির দর্শনও তেমন ধারা। এই দর্শনে বোধি মানসের আলো এসে পড়ে, শ্রবণ দর্শন স্পর্শ এ-সবই তাকে অনুসরণ করে। ক্রমে এই দর্শনের পরিপাকে ভিতর বাহির একাকার হয়ে যায়। কারণ প্রভাস-মানস স্বরূপত এক বিশাল অদ্বৈত-চেতনার ভূমি। ভাব ঘনীভূত হয়ে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষের সাধন হয়, তাহলে মনের সাধারণ মনন-ক্রিয়া আর থাকেনা, কিম্বা থাকলেও তা ভাববাসিত হয়েই দেখা দেয়। প্রাকৃত-মানস থেকে উত্তর-মানসে যেতে ইন্দ্রিয় হতে ভাবে, বিশেষ-দর্শন হতে সামান্য-ভাবনার দিকে উজিয়ে যাই এবং এই সামান্য-ভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবকে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষে ঘনীভূত করতে পারি, তাহলেই প্রভাস-মানসের ভূমি অধিগত হয়। প্রভাস-মানসে বিষয় বা দৃশ্যের স্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে। গভীর ভালবাসায়ও এই স্বরূপানুভবের আভাস ফুটতে দেখা যায়। সেই যে আমার মনের মানুষ, সে চিন্ময়। সে মোটেই আরোপ মানুষ নয়, আমার প্রতিভ-সংবিৎ দিয়ে তার স্বরূপ যেন আমি আবিষ্কার করলাম। তার স্বরূপ আর সত্যের স্বরূপ একাকার।

প্রভাস-মানসের আগে আছে বোধি-মানস। উত্তর-মানসের দিব্য মনন আর প্রভাস-মানসের দিব্য-দর্শন দুয়ের উৎস সেই। বোধি-মানসের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং মর্মভেদী। সব জানাই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় 'হয়ে জানা'তে বা বিষয়কে নিজের সঙ্গে একাকার করে

জানাতে। আমাদের সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির মূলে এই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের প্রেরণা রয়েছে। সেই তাদাত্ম্যবোধই হল বোধির বিশিষ্ট লক্ষণ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাঝেও বোধির আবেশ থাকে বলে, তাতে আমাদের এত বাস্তব প্রত্যয় হয়। কিন্তু তবুও সেখানে প্রত্যক্ষের বিষয় বিষয়ীর বাইরে, তাই বিষয়কে পুরাপুরি জানতে পারি না। জানার এই অভাব আমরা পূর্ণ করি অন্তরের ভাব দিয়ে। ভাবের মাঝে বোধির আবেশ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের চেয়েও অন্তরঙ্গ একরস প্রত্যয়। ভাবের এই পাওয়াতে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ ঘুচে যায়। প্রাকৃত জগতেও এই ভাবের জানার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সমবেদনা তার এক সর্বজনীন ও সুপরিচিত রূপ। কবির হৃদয়ে এই ভাবেই নিষ্প্রাণও স্পন্দিত হয় প্রাণস্পন্দে। বুদ্ধিও অন্তরাবৃত্তি ও তন্ময়তার ধারা ধরে চলতে জানে। বিষয়ে নিবিষ্ট একাগ্র চিত্তের তন্ময়তার গভীরে জ্ঞানের আলো 'দপ করে' যে জ্বলে ওঠে, এ তথ্য বৈজ্ঞানিকেরও অজানা নয়। কিন্তু যোগী যখন তন্ময় হয়ে বিষয়ীকে জানেন তখনও নিজেকে হারান না। সে জানাতে আত্মবোধ ও বিষয়বোধ দুইই উজ্জ্বল থাকে। এই অবস্থাকে জাগ্রৎ সমাধি বলা যেতে পারে। জাগ্রত চেতনায় আনন্ত্যের বোধকে নিরন্তর বহন করা যে পূর্ণযোগের সাধন, একথা আমরা আগেই জেনেছি। বোধির দর্শন হল আবৃতচক্ষু হয়ে নিজেকেই যেমন সামনাসামনি দেখা, তেমনি আবার সেই আত্মদর্শনের উল্লাস রূপান্তরিত হয় বিষয়ের বিসৃষ্টিতে। তাই তখন দৃষ্টিই হয় সৃষ্টি—যেমন হয় কবির হৃদয়ে কাব্যরূপের আবির্ভাবে, মরমিয়ার ভাব-সম্মেলনে। চৈত্য রূপান্তরের মত বোধি-মানসের মাঝে এই রূপান্তরে মনেরও এক নবজন্ম লাভ হয়, আর তা প্রাণে ইন্দ্রিয়ে ও দেহচেতনাতেও উত্তর জ্যোতির দীপ্তি ও বীর্যকে ছড়িয়ে দেয়। তাই একেই বলা যায় ব্যক্তিসত্ত্বে প্রতিষ্ঠার ভূমি।

বোধি-মানস পর্যন্ত থাকে চিদ্‌বৃত্তির একাগ্রতা ; তা ঊর্ধ্বমুখ তীরফলকের মত বিষয়ের আবরণ ভেদ করে তার মর্মসত্যকে আবিষ্কার করে চলে। এ থেকে বস্তুর মূলে চিন্ময় ভাব রূপ ও স্পর্শের সংবিৎ উন্মেষিত হয়। এইসব চিদ্‌বৃত্তির উৎস হল এক সংহত আত্মসংবিৎ। আত্মসংহত বিশ্বব্যাপ্ত সেই চেতনায় নিজেকে অনুভব হয় বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু বলে। অনন্ত পুরুষের অনন্ত চক্ষুতে রাসচক্র জেগে উঠল বিচিত্র ভূতিতে (becoming in manifold ways)। যে আমি তখন বিশ্বসমুদ্রের বুকে আলো হয়ে দোলে, তার বোধে সংক্রামিত হয় বিশ্বাত্মারই সম্যক্ সম্বোধি (Spiritual Intuition)। এই হল অধিমানসের ভূমি।

অধিমানস এক সংবর্তুল চেতনার (global) ভূমি। মানস প্রত্যয়ের তা চরম ও পরম প্রতিষ্ঠা। এই ভূমিতে প্রেম জ্ঞান শক্তি, তাদের বৈশিষ্ট্য রেখেও একসঙ্গে থাকতে পারে এবং তা থেকে সাধক ভক্তি জ্ঞান কর্মযোগে, তার নিজস্ব দিব্য ধারাবাটির ক্রিয়ার অবরোহণের পথটিও পেয়ে যাবেন। চেতনার এই উত্তুঙ্গ ভূমিতেও কিন্তু চিদ্‌বৃত্তির প্রগতি

শেষ হয় না। তাই পরমা প্রকৃতির অনধিগত রহস্য তখনও অনধিগত থাকে বলেই পরম সাধ্যের সম্যক সিদ্ধি সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই নিগূঢ়তম রহস্যই হল অতিমানস।

সাধনার দিক থেকে অধিমানস আর অতিমানস একেবারে মুখোমুখি হয়ে আছে। অতিমানসের চাপেই জড় অধিমানস পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। এও অতিমানসের বিভূতি, একে সহজ একান্ত বিভূতি হতে হবে। গীতায় যেমন অর্জুনের জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দর্শন দিয়ে দিব্যজ্ঞানও দিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে গলে মিশে গিয়ে, গীতা হয়ে যদি অর্জুন গীতা বুঝতেন তাহলে সমগ্র গীতা সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত হতে পারত। প্রজ্ঞা প্রেম শক্তি সেখানে একেরই বিভূতি। গীতাতে প্রজ্ঞার দিকটি পরিস্ফুট, কিন্তু নেপথ্যে যে ভাগবত প্রেম, সেখানে তারও আবরণ ঘুচে গেছে। জ্ঞানকে ঠেলে দিচ্ছে সেই ভাগবতধর্মের বাসচক্র (Supramental)। এ ক্ষেত্রে অধিমানস ও অতিমানস নিয়ে ছোটবড়র কোন কথা আর নেই, যেদিকে তিনি দৃষ্টি ফেলছেন, তাঁর কর্মের অভিব্যক্তিকে যেভাবে সম্ভূত করছেন, তাই নিয়েই সম্যক্ দর্শন। অর্জুনের সারথি হয়েও তিনি দুর্যোধনের প্রেরিক। এ পর্যন্ত না যেতে পারলে তো মানস-সংস্কার শেষ পর্যন্ত যায় না ও তা না হলে একরস প্রত্যয়ও সম্যক্‌সিদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু সে রূপান্তর ঘটানো মানস প্রকৃতির সাধ্য নয়, তার সাধ্যের সীমা অধিমানসের উন্মীলন পর্যন্ত। দিব্য অতিমানসকে অধিমানসের মধ্যে পূর্ণভাবে কাজ করতে দিতে এক প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Inscrutable Supermind leaning on Earth; অতিমানস সবার মূলে অধিষ্ঠান হয়ে আছেনই। তাকে ছেড়ে বিশ্ব-ব্যাপার হতেই পারে না। তবুও তার শক্তি পার্থিব লোকে এখনও প্রকট হয়নি।

প্রাকৃত মনের সামান্যভাবনার বৃত্তি ধরে সাধনার পথে অতিমানসের পানে উঠে যেতে সোপানগুলির বিবরণ পেলাম। মনের আড়াল ঘুচাতে তাকে অতিমানসের ধারা ধরেই লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, আর সেইভাবে প্রজ্ঞার কর্ম সংসিদ্ধ হয়ে চলবে। এভাবে ধর্ম দর্শন শিল্প বিজ্ঞান জীবনের সর্ববিদ্যায় প্রজ্ঞানকে নামিয়ে এনে কর্মকে উত্তর ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। ব্রহ্ম তার সম্যক্ জ্ঞান নিয়ে যেমন কর্ম করে চলেছেন, দিব্যকর্মে তাঁর মত হয়ে কর্ম করতে হবে—দিব্যকর্মযোগের ওই সুদূর নিশানা। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

(ক্রমশ)

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

মে ২৭, ১৯৫৩

প্রশ্ন আপনি বলেছেন ('কথাবার্তা' হতে)—"ভগবৎ সাযুজ্য হলে চেতনায় এমন একটি অবস্থা আসে যখন তুমি যা কিছু দেখ আর যা কিছু পড়ো সবই ভালো লাগে, যা দেখছ তা যতই মামুলী হোক আর যে বই পড়ছ তা যতই তুচ্ছ হোক। হয়তো এমন বেসুরো বেতালা সঙ্গীত শুনলে যাতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়, তবু তার বাহ্য সুরটুকু বাদ দিয়ে তার পিছনে যা রয়েছে তাইই তোমার ভালো লাগবে। সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্টের মধ্যে যে পার্থক্যবোধ তা অবশ্য তোমার ঘুচবে না, কিন্তু তার বাইরের ভালো মন্দকে অতিক্রম করে তার ভিতর থেকে কি মর্ম ব্যক্ত হচ্ছে সেটাই তুমি দেখবে। কারণ বস্তুত জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই যার ভিতরে ভগবৎ বস্তুর মূল সত্যটি নেই।"

সঙ্গীতের বাহ্য সুরের "পিছনে" কি জিনিস থাকতে পারে ?

উত্তর সঙ্গীত হলো কোনো কিছু চিন্তা বা অনুভূতির বা আবেগের বা আশ্পৃহার বহিরভিব্যক্তির একটা উপায়। এমন একটি স্থান আছে যেখানে এই সব জিনিসগুলো জমা থাকে, সেখান থেকে তা যখন যেভাবে নামিয়ে আনা হয় সেইভাবে তা সঙ্গীতে রূপ নিয়ে বেরোয়। কেউ যদি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতকারক হয় আর তার যদি তেমন প্রেরণা থাকে, তাহলে তার দ্বারা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যে তত বেশি ভাল রচয়িতা নয় তার মধ্যেও উৎকৃষ্ট জিনিসের প্রেরণা এসে পড়তে পারে. কিন্তু তা এলেও তার যদি তা প্রকাশের যথেষ্ট দক্ষতা না থাকে, তাহলে তার দ্বারা যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হবে তা নিতান্তই সাধারণ রকমের। কিন্তু তুমি যদি তার এই সাধারণ জিনিসেরও পিছনে চলে যেতে পারো, অর্থাৎ তার প্রেরণার মূল উৎসে—যেখানে রয়েছে তার মৌলিক ভাব ও আবেগ—সেখানে পৌঁছতে পারলে তুমি ওর সাধারণত্বের মধ্যে আটকে না থেকে পিছনের মৌলিক জিনিস-টাকেই উপভোগ করবে ; অতি সাধারণ সঙ্গীতও তোমাকে পৌঁছে দেবে রচয়িতার মূল প্রেরণার কাছে। অবশ্য প্রেরণা ছাড়াও সঙ্গীত আছে. যেখানে কেবল যান্ত্রিক সুরবিন্যাসের বাহাদুরি দেখাতে সঙ্গীত রচিত হয়েছে। তা কখনো উৎকৃষ্ট জিনিস হয় না। কিন্তু আমি বলতে চাইছি বাহ্য জিনিসটাকে বাদ দিয়ে তার ভিতরের জিনিসটার কথা, যেখানে বাহ্য অভিব্যক্তিটা অবান্তর তার পিছনের প্রেরণাটিই আসল ; সেখানে বাইরে যেমন শোনা যাচ্ছে তাই বড় কথা নয়, তার পিছন থেকে যা ব্যক্ত হচ্ছে তাই বড়ো কথা।

প্রশ্ন তা'হলে ভিতরের যা প্রেরণা, বাইরে তার বিকাশ ভালো না হতেও পারে?

উত্তর : এমন সঙ্গীত আছে যার মধ্যে কোন প্রেরণাই নেই, শুধুই যান্ত্রিক শব্দবিন্যাস, এমন নিপুণ সঙ্গীতকারক আছে, যারা অনায়াসে খুব নিখুঁতভাবে কঠিন রকমের সুরের খেলা দেখাতে পারে। কিন্তু তাতে কোন জিনিসকে প্রকাশ করেনা, কেবল সুরের যান্ত্রিক বৈচিত্র্য ছাড়া। কেবল নৈপুণ্য দেখানো ছাড়া আর কিছুই না। সব চেয়ে বড়ো কথা হলো প্রেরণা, মানুষের সব কিছু সৃষ্টিপ্রয়াসের মধ্যে তারই সার্থক বিকাশ। অবশ্য প্রেরণা যেমন হবের, তার বিকাশও তেমনি হওয়া চাই তাই উচ্চ জিনিসকে সার্থকভাবে ফোটাবার জন্য তেমনি কৃতিত্বও থাকা চাই। তবে তা অপরিহার্য হলেও কৃতিত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, প্রেরণা তার চেয়েও বড়ো জিনিস। সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে সেই প্রেরণার মূল উৎসের উপর।

প্রশ্ন এই "মূল উৎস" বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : যেখান থেকে তা আসছে, যেমন নদীর উৎস কোনো পর্বতনির্ঝর।

প্রশ্ন সব কিছুরই কি এমনি উৎস থাকে?

উত্তর বাস্তব জীবনের উৎস হলো মনোপ্রাণময় জীবনরাজ্য। আবার তারও উৎস হলো অন্য কিছু। পৃথিবীতে এমন কিছুই বাস্তবে রূপ নেয় না যার উৎসে উপরকার কোনো সত্য নেই, তা না হলে এ জগৎ টিঁকতেই পারত না। কোনো আদি উৎস ছাড়া জগৎটা যদি আপনা হতেই গজিয়ে উঠত তাহলে অচিরে এর অস্তিত্ব লোপ পেতো। পিছন থেকে একটা শক্তি, একটা প্রয়াস এসে অভিব্যক্তির দিকে অবিরাম ঠেলা দিচ্ছে, তবেই জীবনের অস্তিত্বধারা এইভাবে বেয়ে চলেছে। নতুবা এর ধারা কবেই নিঃশেষ হয়ে যেতো।

প্রশ্ন . যদি তাই হয় যে বাস্তব জগতের সব কিছুর মূলে উপরকার সত্য আছে, তাহলে তার অভিব্যক্তি এত বিকৃত ও কুৎসিত কেন? জগতের সব কিছুই এমন খারাপ কেন?

উত্তর : তার কারণ, উৎস ও অভিব্যক্তির মাঝখানে ঢুকেছে বহু প্রতিবন্ধক শক্তি। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তোমার অস্তিত্বের সত্য কি তা বলতে পারো?" এর কি জবাব তুমি দেবে?...তুমি জানো না। সব জিনিসের বেলাতেই তাই। অথচ তোমার তো যথেষ্টই বিবর্তনপ্রাপ্ত চিন্তাশক্তি রয়েছে, মার্জিত ধরণের শিক্ষাও অনেক

পেয়েছ। তুচ্ছ একটা টিকটিকির মতো নও যারা দেয়ালের গায়ে ঘোরাঘুরি করে তথাপি তুমি বলতে পারোনা যে আপন অস্তিত্বের কি সত্য। সকল রকম বিকৃতির এখানেই রয়েছে গুহা কারণ, যেহেতু মূল উৎস থেকে ছেড়ে এসে সব কিছুই রয়েছে নিশ্চেতনার আড়ালে ঢাকা। ওরই জন্য তার সত্য সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা। অথচ সেই সত্য রয়েছে বলেই জগতের অস্তিত্বও টিঁকে রয়েছে। কেবল তার প্রকাশ হচ্ছে বিকৃত, কারণ তাকে এত নিশ্চেতনা ও অন্ধকার ও অজ্ঞানতার ভিতর দিয়ে কষ্টে অভিব্যক্ত হতে হচ্ছে।

এ কথা আমি পরবর্তী বুলেটিনের সংখ্যাতে বোঝাতে চেষ্টা করব। তবে মোটের উপর এই হলো কারণ।

বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে ভগবৎ ইচ্ছা ছিল সৃষ্টিকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া—অর্থাৎ সবগুলো একই রকম জিনিস না হয়ে মূল ঐক্যকে বজায় রেখেই আলাদা আলাদা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বযুক্ত অসংখ্য সত্তা, যারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র বলেই বোধ করবে। তুমি যে অন্যের থেকে ভিন্ন, এটা জানলেই তোমার একটা ব্যক্তিত্ব ঘটল। নতুবা তুমি বোধ করতে যে একটা সমষ্টির তরল স্রোতের মধ্যে তলিয়ে নিশে আছো। মনে করো যদি তোমার বাহ্য চেহারার এবং সত্তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো চেতনা না থাকে, কেবল চেতনা থাকে প্রাণশক্তির ক্রিয়া ও নিশ্চেতনার ভিত্তিটুকুর সম্বন্ধে, তাহলে সমষ্টিচেতনার মধ্যে পড়ে অনবরত তার ক্রিয়ার কাটাকাটি চলতে থাকবে, পরস্পরকে পৃথক করে নিতে পারবে না; আলাদা ব্যক্তিত্ব-চেতনা না থাকলে কেবলই মনে হবে সমগ্র তরঙ্গের মধ্যে ডুবে থাকার মতো। তাই মূল ভগবৎ ইচ্ছা এই ছিল যে এমন বিভিন্নরূপ ব্যক্তিসত্তা তৈরী হোক যারা তাদের আদি দিব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে আবার সচেতন হবে, অথচ প্রত্যেকের একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি মূল চেতনাকে ছেড়ে এলে অমনি পড়ে গেলে নিশ্চেতনার কবলে। কারণ যা তোমার জীবনের মূল প্রাণ, যা তোমার আদি, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তোমার চেতনাও যাবে বদ্‌লে, তা হয়ে দাঁড়াবে অচেতনা। সেই অচেতনার জন্যই তুমি তোমার সত্যকে হারাও। এই হলো কার্যক্রম। এটা অপরিহার্য কি পরিহার্য তাই নিয়ে কথা নয়, বাস্তব ব্যাপার হলো এই। এইভাবে সৃষ্টি গঠন নেবার ফলে বিশুদ্ধ সত্য আর বিশুদ্ধ না থেকে, অচেতনা ও অজ্ঞানতার ভিতর দিয়ে আসাতে তা অশুদ্ধ হয়ে গেছে।...প্রশ্ন করবামাত্রেই তুমি যদি বলতে, "হাঁ, আমি জানি আমার সত্তার কি সত্য!" তাহলে তো সমস্যা মিটেই যেতো, আর কোনো প্রশ্ন থাকতনা।

অতএব ঐ কারণেই যত কিছু অসুন্দর অসঙ্গতি, মৃত্যু, রোগব্যাধি, ঐ কারণেই যত কিছু কুটিলতা ও দুঃখবাথা। সব কিছুরই ওষুধ একটিমাত্র, দ্বিতীয় নেই। এগুলি বিভিন্ন স্তরে কাজ করে বিভিন্ন শব্দনে, কিন্তু কারণ একটাই। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের গঠনের প্রয়োজন থেকেই ঢুকে পড়েছে নিশ্চেতনা। তাই হয়েছে বটে, কিন্তু তা যে

নিতান্ত অপরিহার্য ছিল এমন কথা বলছি না। সে আবার অন্যরূপ সমস্যার কথা যার মীমাংসা পরে হতে পারে, কিন্তু আপাতত যা হয়েছে তাই এখন বললাম।

কিন্তু এর ওষুধ কি? কারণ যখন জানা গেল, তখন সেই ভুল চেতনা আবার ফিরে পেলেই সব কিছু মিটে যাবে। খুব সহজ কথা।

ধরে নেওয়া যাক যে বিশ্বজগতে রয়েছে দুই রকম বিপরীত ও বিরুদ্ধ শক্তি; যা অনেক ধর্মেই বলে থাকে—ভালো এবং মন্দ। মনে করো যে চিরদিনই থাকবে এই ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব, পরস্পরে সংঘাত ও সংঘর্ষ। যখন যে ওর মধ্যে বেশি শক্তিশালী, সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তারই হবে জয়; ভালোর জোর বেশি হলে তার জয়, মন্দের জোর বেশি হলে তার জয়; কিন্তু দুটোই রয়ে গেল চিরদিনের মতো। কিন্তু বাস্তবিকই এমন যদি হতো তাহলে আর আমাদের আশা করবার কিছুই থাকতনা; তখন বলতে হতো যে ব্যাপারটা অতি কঠিন, এর মীমাংসা নিতান্তই অসম্ভব, এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা যায়না। তবে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তেমন নয়।

বাস্তবপক্ষে অদ্বিতীয় সত্যের আদি উৎস তো একটাই, কেবল তারই অস্তিত্ব একেবারে ধ্রুব; সেই সত্য যখন বাহ্যত: নিজেকে নিক্ষেপণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তখনই আমরা দেখি অসংখ্য ক্ষুদ্র মস্তিষ্কবিন্দুরা তীক্ষ্ণধী হয়ে গজিয়ে উঠে এমন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে যার নাগাল তারা কোনোমতে পাচ্ছেনা; অথচ তা মিলে যেতে পারে, কারণ যে জিনিস তারা খুঁজছে তা রয়েছে তাদের নিজেদেরই মধ্যে। এটা নির্ভুল কথা। হয়তো খুঁজে পেতে অল্পবিস্তর সময় লাগতে পারে, কিন্তু তা মিলবেই নিশ্চয়। ওষুধ রয়েছে ব্যাধিটারই অন্তর্বর্তী হয়ে।

যারা কিছু খুঁজে পেয়েছে তারা তার বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে, তাদের নিজেদের পন্থায় নিজেদের অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী। ভগবানের নাগাল যারা নিজেদের মধ্যে পেয়েছে, তারা যেমন ভাবে ও যেমন রূপে আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে অনুভব করেছে, সেটাই তাদের কাছে সত্যপ্রকাশ। কিন্তু তারা যদি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই বলতে শুরু করে, "ভগবানকে পেতে হলে ঠিক এই করতে হবে, তাই করতে হবে, ঠিক এই পথে এই ভাবে চলতে হবে", যেহেতু তাতেই তারা ঐরূপ সার্থকতা পেয়েছে। কিন্তু যদি আরো বেশি তারা এগিয়ে যায় এবং আরো কিছু অভিজ্ঞতা মেলে, তখন দেখবে যে কেবল সেই উপায়েই নয়, আরো অসংখ্য রকম উপায়ে তা হতে পারে।...একটা কথা কিন্তু সুনিশ্চিত, যা মিলবে তা বরাবর সেই একই জিনিস। এইটাই সবিশেষ কথা,—যে পথই ধরো, যেরূপেই তাকে খোঁজো, ফল হবে সমান। একই অনুভূতি পাবে। যে কেউ তার স্পর্শ পেয়েছে তার কাছে সে ঐ একটাই জিনিস। বাস্তবিক স্পর্শ পেয়েছে কিনা এটাই হলো তার প্রমাণ, সকলের কাছেই তা সমান, আর তা যদি না হয় তাহলে সত্য স্পর্শ সে পায়নি; কারণ স্পর্শ পেলে তা একই রকম হবে। তার নাম যাই দাও, তাতে কিছু যায় আসেনা।

কথা তো শুধু কথাই ; তার পিছনে কিছু না থাকলে তার কোনো মূল্যই নেই। এটা লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি, যে অনেক সময় কাউকে কিছু তুমি স্পষ্ট করে বললেও সে তা বুঝতে পারছেনা,—আবার অন্য কাউকে দুটি মাত্র কথা বলতে না বলতেই সে সমস্তটা বুঝে নিচ্ছে? এমন অভিজ্ঞতা কখনো কি হয়নি? আমার তা প্রায়ই হয়েছে। অতএব কথার বলাতে কিছু যায় আসেনা, সবই নির্ভর করে তার মধ্যে তোমার চিন্তাশক্তির প্রযুক্তির উপর ; সেই চিন্তার প্রয়োগ যত জোরালো, যত ধারালো, যত সুস্পষ্ট হবে, ততই লোকে তা বুঝবে, যারা সেই চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তুমি যদি না ভেবে কেবল কথা বলে যাও তাহলে কি বলছ তা সাধারণত প্রায় বৃথাই বলা হবে, উচ্চারিত শব্দগুলো মাত্রই শোনা হতে থাকবে। যেখানে কারো সঙ্গে তুমি নিত্য কথা বলতে অভ্যস্ত ও যার সঙ্গে তোমার মনোভাবের নিত্য লেনদেন হয়ে থাকে, অর্থাৎ পরস্পরে এমন বোঝাবুঝি থাকে যে "এই বললে এই বোঝাবে" ইত্যাদি—মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে আদানপ্রদানের এমনি অভ্যাস করা থাকে—তাহলে তেমন স্থলে পরস্পরের সব কথা তোমরা সহজেই বুঝবে। কিন্তু যদি কোনো বাইরের নবাগত আসে যার সঙ্গে আগে কখনো কথা বলোনি, সেখানে তারা কি বলছে সে-কথা বুঝতে তোমার কিছু সময় লাগবে।...কিসের দ্বারা তুমি বোঝো? অন্যের বলার পিছনে যে মনোভাব থাকে তারই দ্বারা ; তাদের মনের চিন্তাটা যদি জোরালো হয়, তার থেকে যে জোরালো স্পন্দনগুলি আসে তাই তোমাকে নাড়া দেয় ; বাক্যগুলো সেখানে মধ্যস্থের কাজ করে মাত্র। কিন্তু এই অনুভূতিকে তুমি এতটাই বাড়াতে পারো যে অল্প কয়েকটি মাত্র বাক্য থেকে অথবা বিনা বাক্যেও তুমি তার ভিতরকার মনোভাবের সরাসরি সংস্পর্শ পেয়ে যেতে পারো ; অবশ্য সেখানে তোমার নিজের চিন্তার একাগ্রতা থাকা চাই। সকল কাজের পক্ষেই এমনি। ঐরূপ উন্নত চেতনা ও একাগ্রতার শক্তি থাকলে তা নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো।

(মা এখানে পরে এইটুকু যোগ করেছেন "আসল জিনিস হলো আন্তরিক ঊর্ধ্বস্থিতির নিরেট চেতনা, সে চেতনা থাকলে তখন যাই করো আর যাই বলো সেই উপস্থিতিই কাজ করবে")। তোমার দেহযন্ত্রটি সেখানে কাজ করে না, সে হয় কেবল যন্ত্রনাধ্যম মাত্র, আর কিছু নয়। সেই উপস্থিতিকে যখন ধরতে পারো (তাকে অদৃশ্য হলেও ধরা যায়) আর তাকেই কাজে লাগাও, তখন কাজটা হয় চেতন, আর যা করো তা ঠিকই হয়। যখন তাকে ধরতে না পারো, আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো গলে বেরিয়ে যায়, তখন তুমি অপটু হয়ে কি করতে হবে তার ঠিকানা পাওনা। সুতরাং বাইরের যন্ত্রটাই আসল জিনিস নয়, আসল হলো যা তার পিছনে রয়েছে।

প্রশ্ন সঙ্গীতের উৎপত্তি সাধারণত কোন স্তর থেকে ?

উত্তর তার নানা ধাপ আছে। এক জাতীয় সঙ্গীত আসে উচ্চ প্রাণস্তর থেকে, যা চিত্তচাঞ্চল্য আনে, কতকটা হাল্‌কা ধরনের স্নায়ুতে নাচড় দেয়। এ জাতীয় সঙ্গীত যে আনন্দদায়ক তা নয়, কিন্তু স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে। অতএব তা আসে প্রাণস্তর থেকে। আবার এমন সঙ্গীত আছে যা আসে চৈত্যের স্তর থেকে—সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আবার আধ্যাত্মিক স্তর থেকে আসা সঙ্গীতও আছে, যা এমন সমুজ্জ্বল দীপ্তিদায়ক যে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত ক'রে দেবে। কিন্তু সে জিনিস ঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলে তাকে প্রাণের স্তর দিয়ে আনতে হবে, কারণ তার মধ্যে যদি প্রাণস্পন্দনের কিছু মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব মিশে না থাকে তাহলে উপর থেকে এলেও বাহ্যবিকাশে তা একঘেয়ে হয়ে পড়বে। আমি এমন সঙ্গীতকারদের জানতাম যাদের উচ্চ প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রাণস্পন্দনের অভাবে তাদের সঙ্গীত হতো নীরস। আমি এটা জানি যে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের অনুশীলন করতে গিয়ে তারা প্রাণের স্তরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখত—তাই প্রাণস্তর আদৌ কাজ করত না—সঙ্গীত সোজাসুজি উপরের স্তর থেকেই আসতো, শ্রোতাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারলে তা উৎকৃষ্ট জিনিসই হতো, কিন্তু বাহ্য প্রকাশে তার মধ্যে কোনো তেজই থাকত না, তাই শোনাতো নিস্তেজ সুরবিন্যাসের মতো, যাতে কোনো মাধুর্য নেই। প্রাণের কিছু ক্রিয়া মিশে থাকলে তবেই তার তেমন স্পন্দন জাগে। সেই উচ্চ বস্তুকে প্রাণের স্তরে এনে ফোটানো, তাই হতে পারে প্রকৃত প্রতিভার রচনা।

সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ রকম প্রতিভা থাকা চাই ; খুব কঠিন জিনিস, তার জন্য আরো কিছু মধ্যস্থ শক্তির প্রয়োজন। সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলার বেলাতেও তাই দরকার। তোমার রচিত জিনিসের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করবে প্রেরণার উচ্চতার উপর, কত উচ্চ স্তর থেকে সেই প্রেরণা আসছে। তার সঙ্গে থাকবে এটা বা ওটা, কিন্তু প্রায়ই কিছু প্রাণস্তরের কাজ।

ও ছাড়া আরো নানারকম সঙ্গীত আছে, যেমন কাফেতে বা সিনেমাতে যে সব কনসার্ট বাজে, তাতে থাকে আশ্চর্য নৈপুণ্য কিন্তু বিচিত্র হলেও তা খেলো ধরনের উত্তেজক জিনিস। কিন্তু তার চমৎকারিত্ব এমন যে তোমার পেটের মধ্যে স্নায়ুগুলো তা নাড়া দেয়, এবং তার সুরটা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে যায় ; এমন অধিকার ক'রে বসে যে কিছুতেই তুমি ভুলতে পারোনা, কারণ তার ব্যঞ্জনা কৌশল খুব নিপুণ। প্রাণস্তরের শক্তি দিয়েই তা রচিত, কিন্তু পিছনে যা থাকে তা নারাত্মক।

কিন্তু এই চিত্তজয়ী প্রাণশক্তি যখন উচ্চস্তরের প্রেরণার সঙ্গে মিলে গিয়ে কাজ করে এবং স্বর্গীয় মাধুর্যের দ্বার আমাদের কাছে খুলে দেয়—তখন তার যা ফল হয় তা অপূর্ব। কিছু বা সেজার ফ্রাংকের মধ্যে, কিছু বা বীঠোফেন এবং বাখের মধ্যে, এবং আরো

কারো কারো মধ্যে রয়েছে এই প্রেরণা ও প্রাণশক্তির সম্মিলন। কিন্তু তাদের মধ্যে তা আসে মুহূর্তের জন্য মুহূর্তের মতো, স্থায়ী হতে পারেনা। তাই যখন উচ্চস্তরের শিল্পীদের বেলাতেও তাদের সকল রচনার মধ্যেই এমন অপূর্বতা পেতে পারোনা। প্রেরণা জিনিসটা আসে চকিতের মতো, যদি কিছুকাল তা স্থায়ী হয় তবে তখনকার সব কাজগুলিও তেমনি একই স্তরের হয়, যতক্ষণ প্রেরণাটি বজায় থাকে ; আর তুমিও যদি তা শোনবার সময় একাগ্র ও একমনা হও তাহলে তা তোমাকে উপরে উঠিয়ে দেবে, তোমার সকল শক্তিকে উপর দিকে তুলে ধরবে, যেন কেউ তোমার মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে আকাশে তুলে কোনো এক জ্যোতির্লোকে পৌঁছে দিলে। অনেক বছরের কঠোর যোগ সাধনাতে যা হতে পারত তাই হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তবে তার থেকে শীঘ্রই পতন ঘটে, কারণ ভিত্তিতে তেমন চেতনা নেই। কেবল সেই সময়টির জন্যই অনুভূতি আসে, পরে জানা যায়না কি হয়েছিল। তবে তুমি যদি যোগের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকো এবং তার পরে ঐ ব্যাপার ঘটে, তখন তার ফল নির্ধার্য হতে পারে।

প্রশ্ন ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতে যে এত পার্থক্য তা কিসের কারণে? তা কি উৎপত্তির দরুণ বা অভিব্যক্তির দরুন?

উত্তর দুই কারণেই, কিন্তু বিপরীতভাবে।

খুব উচ্চতর প্রেরণা আসা ইউরোপীয় সঙ্গীতে খুবই বিরল, এবং চৈত্য উৎপত্তির সম্পর্কেও তাই। সে প্রেরণা আসে হয় উপর থেকে নতুবা প্রাণের স্তর থেকে। অভিব্যক্তি যা হয় তার অধিকাংশই প্রাণ স্তরের, সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া—কাজেই তা বেশ জোরালো, চিত্তোত্তেজক। বাঁটি প্রাণস্তর থেকেই প্রায়ই তার উৎপত্তি। শীর্ষস্থান থেকে হলে তা হয় অত্যাশ্চর্য। কোনোটা বা আসে চৈত্যের জগৎ থেকে, বিশেষত ধর্মসঙ্গীতে, কিন্তু তা খুব কম।

অপরপক্ষে ভারতীয় সঙ্গীত, যদি গুণী ব্যক্তির দ্বারা পরিবেশিত হয়, তাহলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার উৎপত্তি হয় চৈত্য থেকে, ভারতীয় সঙ্গীতে যে সব রাগ আছে তার উৎপত্তি চৈত্য থেকে। উচ্চতর স্তর থেকে প্রেরণা প্রায়ই আসেনা। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাণস্তরের জোরালো প্রভাব খুব বিরল। তার যা উৎস তা আভ্যন্তরীণ। ভারতীয় সঙ্গীত আমি অনেকই শুনেছি ; তার মধ্যে প্রাণস্তরের তেজ খুব কম, চার পাঁচ বারের বেশি শুনিনি। কিন্তু চৈত্য উৎসের ভারতীয় সঙ্গীত যথেষ্ট শুনেছি, যা সেখান থেকে সরাসরি বাস্তবে রূপায়িত হয় ; কিন্তু সেখানে একাগ্র হওয়া খুব দরকার,—কারণ জিনিসটা অতি সূক্ষ্ম ধরনের, অপ্রখর, তার মধ্যে প্রাণস্পন্দনের তীব্রতা নেই, সহজেই তার চৈত্য উৎসে তলিয়ে যাওয়া যায়। তাতে একটা নেশার মতো হর্ষান্বিত সমাধির ভাব আসে। কান পেতে শুনতে শুনতে নিজেকে ছাড়িয়ে চলে যাও চৈত্য চেতনাতে। কিন্তু যারা

চেতনাতে থাকলে তা এমন নিস্তেজ যে প্রাণের দিকে সাড়া জাগেনা, তখন একঘেয়ে লাগে।...এ ধরনের সঙ্গীত আমি পছন্দ করি, একটা মুখ্য ভাবধারাকে লীলায়িত করা। সেই মুখ্য জিনিসটাই এমনিতে খুব সুরেলা, তার পর তাকে অসংখ্য বৈচিত্র্য দিয়ে বিস্তারিত করা হয়, যাতে মুখ্য জিনিসটারই বিস্তারিত ব্যঞ্জনা হতে থাকে। ইউরোপের খাঁটি সঙ্গীতকারদের মধ্যে এটা ছিল; বাখের ছিল এইরকম, মোজার্টের ছিল পুরো সুরেলা জিনিস, সুরের জন্যই সুর, আর কিছু নয়। এই যে কতকগুলি স্বরগ্রাম নিয়ে বিশিষ্ট একরূপ সুরসম্বন্ধ নিরূপণ (অনন্ত বৈচিত্র্য সহকারে), এতে আমার মতে এমন এক আশ্চর্য বিশ্রামের ভাব আনে যাতে তুমি চলে যাও আপন গভীরে। আর তেমন তৈরি থাকলে বাহ্য চেতনাকে ছাড়িয়ে তুমি চৈত্য চেতনাতে চলে যাও, বাইরে আর না থেকে একেবারে ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হও।

প্রশ্ন : বড়ো বড়ো সঙ্গীতকারের কাছে সঙ্গীত আসে কোন আকারে? তা কি আসে একটা মেলডি (**melody**) হয়ে, অথবা কানে যেমন শোনে?

উত্তর তা নির্ভর করে সেই সঙ্গীতকারের উপর। তাই তো বলছিলাম। যেমন ভারতে সঙ্গতিধর্মী হার্মনি বিজ্ঞানের (**harmony**) বিশেষ কিছু নেই, যা কিছু হয় তা তানধর্মী মেলডির (**melody**) দ্বারা। ওর মধ্যে প্রাণস্তরের প্রভাব এলেই তখন হার্মনির ভাবটা এসে পড়ে, তাতে আসে একটা নতুন সমৃদ্ধি, যা আগে ছিল না।

প্রশ্ন : কিন্তু মেলডি কি ঐভাবে আসে?

উত্তর না, সঙ্গীত আসে, সঙ্গীত মানেই মেলডি নয়। তা স্বর সংযোজন, যা মেলডি নাও হতে পারে। মেলডি তার একটা অংশস্বরূপ।

প্রশ্ন : (বাণীর 'কথাবার্তা' থেকে) আপনি বলেছেন, "যখন তুমি স্থির সংকল্প নিলে যে তোমার সমগ্র জীবনকে তুমি ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে দেবে, তারপর তবুও তোমাকে প্রতি মুহূর্তেই সে কথা স্মরণ করতে হবে, আর অস্তিত্বের সকল বিষয়েই তা পালন করে যেতে হবে। প্রতি পদে মনে রাখবে যে তুমি ভগবানের অধিকারভুক্ত, তুমি যা কিছু করছ বা ভাবছ' সমস্ত তাঁর দিব্য চেতনার দ্বারাই হচ্ছে তোমার ভিতর দিয়ে।"

এরূপ চেতনা যখন আসবে তখন কি ভগবানকে তাঁর স্বরূপে সর্বত্র দেখা যাবে?

উত্তর : ও! তুমি তাঁকে সর্বত্র তাঁর একটা স্বরূপে দেখতে চাও?...বলতে পারিনা, তেমন হতেও পারে। তবে আমার মনে হয় যে তাতে অনেকটাই থাকে কল্পনা, কারণ ব্যাপারটি ঠিক তাই নয়। তোমার নিজেরই চেতনা বদলায়, তার ধারা বদলায়, অনুভবও বদলায়।

তুমি বলতে চাও যে প্রত্যেকের মধ্যে তুমি দেখবে কৃষ্ণের বা খ্রীষ্টের বা বুদ্ধের মতি? এটা হলো ছেলেমানুষী কথা। তা যে হতেই পারে না এমন কথা বলছি না; বোধ একটা হবে নিশ্চয়। তবে সেই বোধের মধ্যে থাকবে মানব-চেতনার অনেকখানি অংশ, নতুবা সেটা হতে পারবে না, অর্থাৎ ভগবৎ-চেতনা যাদের এসেছে ও তার সংস্পর্শ যারা পেয়েছে, তারা যে দেশের ও যে কালের—সে যেই কেন হোক—তাদের মধ্যে অনুভূতিটাই হবে একই রকম। তোমার কথামত ভারতীয়রা দেখবে তাদেরই দেবদেবীকে, ইউরোপীয়রা দেখবে তাদেরই, জাপানীরা দেখবে তাদেরই, ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই অনুভূতির মধ্যে মনের গড়া জিনিস অনেকটা এসে মিশবে। অবশ্য তাতে আসল জিনিস বিকৃত হবেনা, কারণ তা সকল আকৃতির বাইরে।

কিন্তু ওতে তোমার মধ্যে ভগবৎ-উপস্থিতির খুবই একটা সুস্পষ্ট বোধ আসবে। হাঁ, তাঁর সঙ্গে তোমার নিতান্ত একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তা ঐভাবে নয়। সে কথা বলে বোঝানো যায়না, যাদের হয়েছে তারাই জানে। যে তেমন অনুভূতি পায়নি তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বোঝাতে চেষ্টা করলেও সে কিছুই বুঝবেনা; কারণ তা সকল ব্যাখ্যার অতীত। নিজে অনুভব করলে তবেই বুঝবে।

কিন্তু ওর কোনো উপায় নেই। তুমি যাই কেন বলতে বা লিখতে যাও, তার মধ্যে মনের কথার যোগ থাকবেই, নতুবা তুমি কিছু বলতে বা লিখতেই পারবেনা। প্রত্যেকে এই মনের কথা জুড়েই আপন অনুভূতিকে বোঝাতে চেয়েছে, তারা লিখেছে কিংবা বলেছে "আমি ভগবানের মূর্তি দেখলাম।" এটা বলার ধরণ মাত্র। যা বলেছে তা যে হয়নি এমন নয়: একটা বিশেষ অবস্থাতে তুমি ভগবৎ-উপস্থিতি বোধ করেছ এবং তা তোমার জানিত একরূপ আকারও নিয়েছে—তোমার শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী একটা বাহ্য চেহারা। কিন্তু সেটাই তোমার অনুভূতির চরম কথা নয়, সেই বাহ্য রূপে তোমার অনুভূতি কতকটা খর্বিত হয়েছে, সেই জিনিসের সর্বময়তা ও সর্বশক্তিমত্তা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন : (মায়ের 'কথাবার্তা' হতে) আপনি বলেছেন—"অবশ্য, যা হবার ছিল তাই হয়েছে, অভিপ্রেত না হলে কখনই তা হতোনা। এমন কি আমরা ভুল যা কিছু করেছি আর বিপত্তি যা কিছু ঘটেছে, তাও হবার ছিল, তারও প্রয়োজন ছিল আমাদের জীবনে। কিন্তু এ কথা মনোবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না এবং উচিতও নয়। যা ঘটার প্রয়োজন ছিল তার কোনো মানসিক যুক্তি নেই, তার উপরে কোথাও আমাদের অগ্রসর করবার জন্যই

তা ঘটেছে। কিন্তু সে কথা বোঝবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? সমগ্র বিশ্বই প্রতি মুহূর্তে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করছে, যা ঘটছে তা এই বিশ্বের কারণেই ঘটছে।"

বিশ্ব কেমন ক'রে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করছে?

উত্তর সে কথা আমি বলিনি। তুমি যদি কোনো কিছুর ব্যাখ্যা চাও, এই বিশ্ব থেকেই তা পাবে। সমগ্রের ব্যাখ্যা সমগ্র দিয়েই হবে। সমগ্র বিশ্বকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা মিলবেনা, আর সমগ্র দিয়েই বিশ্বের ব্যাখ্যাও মিলবে।...এটা ভেবে দেখ সকল বিজ্ঞানের সকল বিভাগের সকল ব্যাখ্যাই যদি পড়ে দেখ তো দেখবে যে, একটা হেতু অন্য হেতু দিয়ে ব্যাখ্যাত হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যাত হচ্ছে অপর হেতু দিয়ে, তারও আবার ব্যাখ্যা হচ্ছে অন্য এক হেতু দিয়ে। তাই কোনো কিছুকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে হলে তোমাকে সমগ্র বিশ্বই ঘুরে আসতে হবে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তুমি শেষ ব্যাখ্যাটিতেই থামবে। নতুবা ঘুরতে ঘুরতে তুমি ফিরে আসবে সেই প্রথম কথাতে। এমনিই হয়, কারণ তাই চলে আসছে, এমনিই হতে হয়েছে, নতুবা কিছুই হতে পারতনা। যা কিছু হতে দেখছ তা হবার ছিল বলেই হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই; এটাই হলো পরম প্রজ্ঞা।

প্রশ্ন: এমন কোনো ভৌতিক নিয়ম নেই যাতে বিশ্বের সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে?

উত্তর: খুঁজে বের করো তাহলে আমি খুশিই হবো।

প্রশ্ন: বিজ্ঞান তা বের করতে পারেনা কি?

উত্তর: হাঁ পারে, যদি একটা সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়, যেতে যেতে যদি মাঝপথে থেমে না যায়,—তাহলে ওরা একই জিনিস খুঁজে পাবে যা পেয়েছে গুহ্যজ্ঞানীরা, যা পেয়েছে ধর্ম-সাধকেরা, সকলেই পেয়েছে, কারণ একটা জিনিসই খুঁজে পাবার আছে, দুটো নেই। আছে কেবল একটাই। সুতরাং তুমি কেবলই যদি এগিয়ে যেতে থাকো, একবারও না থেমে কেবলই যদি ঘুরতে থাকো, তাহলে ঐ এক জায়গাতে তোমাকে আসতেই হবে। আর সেখানে পৌঁছে মনে হবে যে কোনো কিছুই খুঁজে পাবার নেই। তাই তো বলছিলাম যে খুঁজে পাবার কিছু নেই, কেবল আছে সেই এক শক্তি। এই হলো মোট কথা, এই হলো সত্য।

[পরে একজন শিষ্য মাকে জিজ্ঞাসা করে, "আছে সেই এক শক্তি" এ কথার অর্থ কি? মা বলেন—"হাঁ, তারাও তাকেই পাবে যাকে ধর্মসাধক প্রভৃতি সকলেই পেয়েছে—তা সেই শক্তি, একটাই মূল শক্তি। শেষ পর্যন্ত তাকে কোনো নাম বা সংজ্ঞা

দিতে পারোনা।...এই নিয়ে একটা কলহ বাধলো যখন আমি অরোভিল সম্পর্কে বললাম, 'অরোভিলে থাকতে হলে দিব্য চেতনার সেবক হতে হবে। এতে তারা বললে—তার মানে তুমি ভগবানের কথা ভেবেই ওটা বলছ। আমি তাতে বললাম (হেসে)—আমি ভগবানের কথা আদৌ ভাবছিনা।...তখন ওরা কেউ বললে, তার বদলে বরং সর্বোচ্চ চেতনা' বলো, কেউ বললে অন্য কিছু। রাশিয়ানরা বললে, 'পূর্ণ চেতনা',—এটা হলো আপোষ নিষ্পত্তি, আমি তাতেই সায় দিলাম। এই হলো সেই জিনিস, পরমা শক্তি, যার কোনো নাম বা সংজ্ঞা নেই। আর তাও সৃষ্টির এক দিক মাত্র।"]

আর কিছু আছে?

প্রশ্ন : ভগবান কি আমাদের থেকে সরে যেতে পারেন?

উত্তর সেটা অসম্ভব। কারণ ভগবান সরে গেলেই সে জিনিসটাও তৎক্ষণাৎ লোপ পাবে, এক মুহূর্তও টিকবেনা। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে, ভগবানই অস্তিত্ব। [পরে মা বলেন : "এ প্রশ্নের মানেই হলো তুমি যেন জানতে চাইছ যে ভগবান নিজের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন কিনা। (হেসে) এখন মুস্কিল এই যে ভগবান অর্থাৎ ডিভাইন (Divine) বললেই তোমরা মনে করো গড্ (God)।...কিন্তু আসলে তা সেই জিনিস যা দিয়ে সকল অস্তিত্ব। কী তা? তা তাইই, যা রয়েছে।"

ভগবানের সরে যাওয়া মানে বিশ্ব থেকে সরে যাওয়া, যাতে বিশ্ব আর থাকেনা, (তাই বলছিলাম তা অসম্ভব)। মানুষ ভগবান থেকে সরে যেতে পারে, এবং প্রায়ই তাই করে। কিন্তু মানুষ থেকে ভগবানের সরে যাওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন : সঙ্গীত বা শিল্পকলা প্রভৃতির একাগ্র অনুশীলনের দ্বারা কি উপলব্ধি ও রূপান্তরে পৌঁছন যায়না?

উত্তর কে তোমাকে তা বলেছে? তোমার মধ্যে কি হচ্ছে তা কি তুমি নিজে জানো? এটা বিশ্বাস করো কি যে অনেকে উপলব্ধিতে ভগবান পেয়ে গেছে, অথচ তারা নিজেরা কিছুই বলেনি, কিছুই জানেনি? [শিষ্য এখানে জিজ্ঞাসা করলে,—না জেনে কেমন ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায়? মা তখন বললেন, "আবার সেই একই কথা। জানা মানে তো বলতে চাও মনের জানা। কিন্তু তারা যা পেয়েছে তা মনের জানার মতো নয়, তাই তারা মুখে বলেনা যে আমি জেনেছি।"] দার্শনিকরাই বলে ঐরূপ কথা, তাই তাদের পেশা, যা কিছু ঘটেছে তার ব্যাখ্যা ক'রে বলা। কিন্তু এমন লোকও আছে যারা অনুভূতি পেয়েও কিছু বলেনা। এমন গুণী শিল্পী মানুষদেরও জানি যারা তার ভিতর দিয়েই উপলব্ধি পেয়েছে।

আর রূপান্তরের কথা,—তোমরা যদি একটাও দেখাতে পারো, মাত্র তার একটি দৃষ্টান্ত, তাতে আমি খুশি হবো। যে যেমন পথই অনুসরণ করুক, নানা ধর্মের বা দর্শনের বা যোগের পথ, আসল রূপান্তর কেউ পায়নি।

প্রশ্ন : যদি শিল্পের সাধনাতে রূপান্তর না মেলে, তাহলে ওর বিশেষ কি মূল্য?

উত্তর : কিন্তু কিসে কারই বা তা মিলেছে, আমাকে বলতে পারো? ধর্ম দর্শন, যোগ, কোনোটিতেই হয়নি। জগতে কেবল উপলব্ধি ও রূপান্তরকেই যদি দাম দিতে চাও, আর একজনের বেলাতেও তা যদি সম্ভব হয়, যদিও আমি তা বিশ্বাস করিনা, তাহলে তো কোনো কিছুরই দাম থাকে না। কারণ কিছুতেই তা মেলেনা। বুঝতে পারছ?

প্রশ্ন হাঁ এখন বুঝতে পারছি।

উত্তর : তাহলে শিল্পকলার সাধনার কোনো মূল্য নেই এমন কথাটা বলে ফেললে কেন? রূপান্তর না হলেই কোনো কিছুর মূল্য নেই? অথচ এদিকে সব কিছুই তাতে সহায়তা করছে, সারা বিশ্বই রূপান্তরের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : কিন্তু যে শিল্পী তার চরম সার্থকতায় পৌঁছেচে, তাকে তো সেইখানেই থামতে হবে, তার জীবনের রূপান্তর আনতে?

উত্তর : কেন? জীবনের রূপান্তর আনতে? সে কথা কে বলেছে? অনেক শিল্পীজন তাদের হাতের কাজের ভিতর দিয়েই আশ্চর্যরূপে ভগবানের দিকে গেছে। একজন মুচীর দৃষ্টান্তই তো রয়েছে, যিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ যোগী ছিলেন। কে কোন কাজ আপন আনন্দে করে, তার উপরে বুঝি কিছুই নির্ভর করেনা? গেরুয়া চড়িয়ে গাছতলায় গিয়ে ধ্যানে বসতে হবে, তবেই বুঝি ভগবানকে মিলবে? তোমরা কি বলতে চাও তা বুঝিনা।

প্রশ্ন একটা সময় তো আসবে যখন পূর্বে যা করছিলাম তা বদলাতে হবে?

উত্তর : তুমি যে পথেই কেন চলতে থাকো, সত্য নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকলে তার ভিতর দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে,—আমার এই কথাটা শুনে রাখো। জুতো সেলাই যদি করো, তাতেও ভগবানকে পেতে পারবে। এর অনেক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছে, একেবারে অকাট্য। কাজ কি করছ তাতে কিছুই যায় আসেনা। বাগান করার কাজ, চাষ করার কাজ করতে করতেও অনেকে পেয়েছে ভগবানকে, তার জন্য তাদের কাজ ছেড়ে দিতে হয়নি। বুঝতে পারছ না? তোমাদের বুঝি মনে হচ্ছে যে তার জন্য দস্তুরমতো দার্শনিক জ্ঞান থাকা চাই?

প্রশ্ন না তা নয়, কিন্তু কথাটা আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছিনা।

উত্তর : না, তা আমি খুবই বুঝেছি তুমি কি বলতে চাইছ, কিন্তু ওটা নিতান্ত বোকার মতো কথা হয়ে যাচ্ছে।

জুন ৩, ১৯৫৩

প্রশ্ন (মায়ের 'কথাবার্তা' থেকে) আপনি বলেছেন "স্বাধীন ক্রিয়া ও অদৃষ্ট, মুক্ত পুরুষকার ও নিয়তি এগুলির সত্য কাজ করে চেতনার বিভিন্ন স্তর অনুসারে।"

এখানে চেতনার বিভিন্ন স্তর বলতে কি বোঝাবে?

উত্তর : ওর পরেই কি বলেছি দেখ, তার মধ্যেই ওর অর্থ রয়েছে।

চেতনার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আগেও তোমাদের বলেছি। পুরোপুরি বাস্তবের স্তরে (প্রাণের স্তর থেকে যা একেবারে পৃথক) সব কিছুই রয়েছে পুরো যান্ত্রিকভাবে কার্যপরম্পরাক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ ; কাজেই যেমন সেদিন বলেছি, একটা কিছুর হেতু বা ফল যদি জানতে চাও, তার থেকে নিলবে আলাদা একটা হেতু, তার আবার আলাদা হেতু, এমনি ক'রে সারা বিশ্বকে ঘুরে আসতে হবে, কারণ সবই আছে পরস্পর যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা। কিন্তু শুদ্ধ বাস্তবের স্তরে প্রাণের স্তর এসে ঢুকে পড়তে পারে, যেমন উদ্ভিদ্ প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। এই প্রাণের স্তরের নিয়তি কিন্তু ওর চেয়ে স্বতন্ত্র রকমের, যা হলো তারই নিজস্ব। তাই বাস্তবের নিয়তির মধ্যে যখন প্রাণের নিয়তি এসে ঢোকে, তখন দুইএর সংযোগ হয়ে সব কিছু বদ্‌লে যায়। আবার প্রাণস্তরের উপরে রয়েছে মনের স্তর। তারও আবার নিজস্ব নিয়তি আছে, তাও তার পরম্পরাগত শৃঙ্খলে বাঁধা।

পূর্বোক্ত ধরনের ক্রিয়াকে বলা যেতে পারে আড়াআড়ি (horizontal) ক্রিয়া। আবার যদি খাড়াখাড়িভাবে (vertical) দেখ, মনের স্তরের জিনিস এসে ঢুকছে প্রাণের স্তরে, প্রাণের স্তরের জিনিস এসে ঢুকছে স্থূলদেহের স্তরে, তাহলে দেখবে সেখানে তিন রূপ নিয়তিতে মিলে সম্পূর্ণ আলাদা কাজ করছে। মনের স্তরের নিয়তি না ঢোকাতে পূর্বে যা হচ্ছিল তার থেকে একেবারে বিভিন্ন। অর্থাৎ উচ্চতর জীবনের ক্ষেত্রে মনের স্তরের নিয়তি এসে ঢুকেছে, তাই উদ্ভিদের নিয়তি থেকে মানুষের নিয়তি হয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই স্তরগুলির উপরে আরো স্তর রয়েছে, একটার উপর একটা, যার শেষকালে আছে সর্বোচ্চ স্তর, সেটা পূর্ণ মুক্তির স্তর। তুমি যদি তোমার চেতনাতে খুব তাড়াতাড়ি মায়ের

স্তরগুলি পার হয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উঠে যেতে পারো, তাহলে তার প্রভাবে তোমার বাস্তবের নিয়তিকে পাল্টে একেবারে পূর্ণ মুক্তির নিয়তি এনে ফেলতে পারো। আবার মাঝের স্তরও নীচেকার সব কিছুকে পাল্টে দেয়। এমনি করে পরিবর্তন ঘটাতে তাতেও পূর্ণ মুক্তির মতো দেখাবে, কারণ উপরের স্তর নীচেকার স্তরে নেমে আসাতে নীচেকার স্তরে যা ফল দেখা যাবে তা অপ্রত্যাশিত। উপরের স্তর তা আগের থেকে জানতে পারে, কিন্তু নীচেকার স্তর তা পারেনা। তাই নীচের স্তরে আসবে একটা অপ্রত্যাশিত মুক্তির বোধ। আর যদি সর্বোচ্চের স্তরে স্থায়ীভাবে থাকতে পারো, তাহলে দেখবে যে সব-কিছুই সেখানে আগের থেকে ঠিক করা আছে, কিন্তু মাঝের নিয়তিগুলির জটিল নিষ্ক্রণের দরুণ সেখানে সবই হবে যুক্ত অবস্থায়। কিন্তু ঐস্তরে কোনো অসঙ্গতি নেই, সবই পুরো সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রশ্ন নীচেকার স্তরগুলিতে বুঝি কখন কি হয় বলা যায় না?

উত্তর তা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। এমন সব স্তর আছে যেখানকার চেতনা পৃথিবীতে অভিব্যক্তির জন্য কত কিছু গড়ে পাঠাতে পারে। সেই সব স্তরে উচ্চ-শক্তিরা পরস্পরে লড়াই করে, যাতে তার জিনিসটাই এখানে সফল হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই সব স্তরে সকল রকমের সম্ভাবনাই তৈরি আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনটা যে এখানে এসে ফলবে তার কোনো স্থিরতা নেই।...মনে করো এমন একটা স্তর যেখানে সকলেই কল্পনা করছে আর প্রত্যেকেই তাদের কল্পনাকে পৃথিবীতে বিকাশ করতে চাইছে অর্থাৎ আপন আপন গল্প নাটককে পৃথিবীতে মঞ্চস্থ করতে চাইছে। এতেই তাদের আনন্দ। সে যেন রচয়িতাদের স্তর, কল্পনাতে সব কিছু ঘটনা রচনা ক'রে এখানে বাস্তবে তারই অভিনয় ঘটিয়ে দেখতে চায় তার ফলাফল। সেখানে নানা শক্তির কল্পনা মুখোমুখি প্রস্তুত হয়ে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সব চেয়ে জোরালো বা সার্থক বা স্থায়িত্বপূর্ণ বা এখানকার পক্ষে অনুকূল, সেইগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। আবার পরস্পরে বিরোধ বাধলে তার ফল হয় অন্যরূপ; কিছু-বা বাদ হয়ে যায়, কিছু-বা নতুন জিনিস এসে মেশে, তারপর হঠাৎ দেখা যায় তা এখানে নেমে এসেছে। তাতে যথেষ্ট তেজ থাকলে তার দ্বারা পৃথিবীর পরিস্থিতির কিছু অবস্থান্তর ঘটে। যেমন মনে করো, যদি করাতের গুঁড়োর একটা স্তূপের মধ্যে তুমি জোরে একটা ঘুষি মারো, তাহলে কি হবে? সেই গুঁড়ো তোমার ঘুষির চারিপাশে জড়িয়ে যাবে। এর বেলাতেও তেমনি সেই উপরের রচিত জিনিস জোরে নেমে এলে আপনা হতেই তার কাজ হয়ে যায়, ঐ ঘুষির গায়ে জড়িয়ে যাবার মতো। তবে তার অভিব্যক্তির বেলাতে এখানকার বাধাবিঘ্নের দ্বারা তার কিছু বিকৃতি ঘটতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কাজ সফল হবেই, উপরকার গল্পরচয়িতা যেমন হওয়া চেয়েছে। এখন, সেই শক্তির সঙ্গে তোমার যদি গুপ্ত যোগাযোগ হয়ে থাকে আর তুমি যদি তার ঐ ঘুষি ছাড়ার মতো

ক্রিয়াটিকে তার আসার মুখে এই পৃথিবীতে অনুসরণ করো, তাহলে তুমি আগের থেকেই বলতে পারবে যে এবার কেমন হওয়া আসন্ন, কারণ উপরের জগতের ক্রিয়াটি তুমি দেখতে পেয়েছ, এখানে আসতে কিছু সময় লাগে বলে তার পূর্বেই তুমি জানতে পেরেছ। আর যতই তুমি উপরের দিকে যেতে পারো ততই তোমার এমন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও বেড়ে যায়। তারও উপরে গেলে তখন সকল কিছুই হতে পারে।

একটা নিয়ন্ত্রিত রাস্তা ধরে সব কিছুই উদ্‌ঘাটিত হয় কিন্তু তা অজানা থাকে আমাদের কাছে বিশ্বে সব কিছুরই বিকাশ হবে—কিন্তু তা কী নিয়মে, কোন রাস্তায়? উপরে কি সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা আমাদের সাধারণ চেতনার বাইরে, সুতরাং তা বলা যায়না। কিন্তু সেখানেই যদি চেতনভাবে উপস্থিত হতে পারো...তাহলে? সব কিছুই সেখানে ঠিক করা আছে, শাশ্বত ভাবে; কিন্তু বাস্তবের জগতে তার ক্রমশ বিকাশ হবে সাধারণত একটার পর একটা ক'রে। কারণ উপরে যদিও সব কিছুই স্থির করা থাকতে পারে, তথাপি এখানে তার সম্ভূতি হতে সময় লাগবে, পর্যায়ক্রমে। কিন্তু কোন পথ ধরে? উপরের রাজ্য হলো অবাধ মুক্তির রাজ্য।... কিন্তু এখানের বেলাতে কে বলতে পারে যে তোমার আস্পৃহা যদি তেমন ঐকান্তিক হয় আর তোমার প্রার্থনা তেমন জোরালো হয় তাহলে সে নিয়তি তার পথ বদলাবে না?

তাই বলছি সব কিছুই সম্ভব।

আস্পৃহা তেমনি জোরালো হওয়া চাই, প্রার্থনা তেমনি একাগ্র হওয়া চাই, আর তার মতো শক্তি মানব প্রকৃতির আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। এ এক বিশেষ রকমের অপূর্ব কৃপা, যার দ্বারা মানব প্রকৃতি এমন আশ্চর্য শক্তি পেয়েছে; কেবল তুমি জানোনা যে সেই শক্তিকে কেমন ক'রে জাগাতে হয়।

অতএব আসল কথা হলো এই যে আড়াআড়ি ভাবে যেমন নিয়তিই বিধিবদ্ধ করা থাকুক, তুমি যদি খাড়াখাড়ি সব গণ্ডী পার হয়ে সর্বোচ্চ চেতনাতে পৌঁছতে পারো, তাহলে সকল বাঁধা নিয়তিকেই তুমি বদলাতে পারবে। তখন বাঁধা নিয়তির সঙ্গে উপরের অবাধ একটা সংযোগ হবে, তাকে তুমি যেমন নামই দাও। কিন্তু আগেকার নিয়তির ভিতর থেকে তুমি খুশিমতো বেরিয়ে আসতে পারবে।

ঐ বইতে আমি এ কথা বলতে ভুলে গেছি (কিংবা দরকার নয় ভেবেই তখন বলিনি) যে—তোমাদের এই সকল থিওরি কেবল থিওরি মাত্র, অর্থাৎ বাস্তব সত্যের অনুমানের দ্বারা একটা মানসিক ধারণা দাঁড় করানো কিন্তু তা খাঁটি কথা নয়। যখন বলো "নিয়তি" আর যখন বলো "মুক্তি", তখন যা বলছ তা নিতান্তই আন্দাজ করা, অসম্পূর্ণ, তোমার ভিতরে আর চারিদিকে যা রয়েছে তার নিতান্ত ক্ষীণ আভাস মাত্র; বিশ্ব কেমন তা বুঝতে চাইলে তোমার মনের তৈরি ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, নতুবা কিছু বুঝবে না।

মোট কথা এই যে এক মিনিটের জন্যও যদি নিজের মধ্যে পুরো ঐকান্তিক ভাবে জোরালো আস্পৃহা ও তীব্র রকমের প্রার্থনা জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে ডুবে থাকতে পারো, তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানের ফলে যা জানা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানতে পারবে।

প্রশ্ন (মায়ের 'কথাবার্তা' থেকে) আপনি বলেছেন, "পরমা চিৎশক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিয়েছেন তার পার্থিব জীবনে স্বেচ্ছা, স্বাধীনতা ও বোধী। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে তাঁর প্রায়োগিক কৌশল, যার দ্বারা উপরকার জগতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তিদের মারফতে এখানে কাজে সফল হতে পারে।"

উত্তর হাঁ, ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি জিনিস হলো স্বেচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার ক্ষমতা, স্বাধীনতাবোধ, এবং প্রবর্তনা। স্বাধীনতা কাকে বলে তা জানো তো? তোমার যেমন খুশি তাই বেছে নিয়ে করবার স্বাধীনতা। আর প্রবর্তনা মানে কোনটা করবে তাই বেছে নেবার তাগিদ। প্রথমত, তুমি মনে করো যে তুমি নিজের ইচ্ছাতে মুক্ত; তার পরে ভাবো যে তোমার নির্বাচনে কেউ বাধা দিতে পারেনা; শেষে ওর দ্বারা স্বাধীনভাবে একটা সিদ্ধান্ত করে নাও। এই হলো তিনরকম পদক্ষেপ যে তুমি মুক্ত, তুমি যা খুশি তাই বেছে নিতে পারো, আর প্রবর্তনা অনুসারে কাজ করতে পারো—এই তিনটিকেই আমি বলেছি তাঁর প্রায়োগিক কৌশল।

কিন্তু শোনো আমার ছেলেমেয়েরা, ওটা যেন বড্ড দার্শনিক ধরনের কথা, যা আমি এখন পছন্দ করিনা। তখন যে ভাষা ব্যবহার করেছি তা যেন একটু বেশি জটিল। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এই তিনটি জিনিস, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছা আর প্রবর্তনা, এই অস্ত্রগুলির দ্বারা প্রকৃতি আমাদের দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়, নতুবা কোনো কাজই আমরা করতাম না।

এই মোহগুলি যদি আমাদের না থাকত যে প্রথমত আমরা যেমন মুক্ত, দ্বিতীয়ত আমরা স্বাধীন সংকল্প করতে পারি, তৃতীয়ত আমরা যেন খুশি বেছে নিয়ে চলতে পারি, তাহলে আমরা মোটে নড়তেই চাইতাম না। প্রকৃতি এই তিনটি মোহ আমাদের উপর চাপিয়ে রেখেছে, যাতে আমরা তারই প্রভাবে নড়িচড়ি, কারণ প্রকৃতি সেই রকমই হওয়া চায়।

সেই পরা প্রকৃতিকেই আমি বলেছি পরমা চিৎশক্তি, কিন্তু আসলে সে হলো প্রকৃতি, আর ওগুলো প্রকৃতিরই কৌশল। কারণ চিৎশক্তির কোনো কৌশল থাকে না। তিনি কেবল চেতনা রূপে সব কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি স্বয়ং সেই চেতনা, তিনি চান কেবল নিশ্চেতনকে চেতন হবার দিকে নিয়ে যেতে বিনা কৌশলে, তাঁর কোনো কৌশলের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বত্রই আছেন ও সর্বত্রই কাজ করছেন, অচেতনের মধ্যে চেতনা

দিতে চাইছেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে যখন সুইচ্ টিপে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালো তখন আর সেখানে অন্ধকার থাকেনা। তেমনি যেখানে চেতনা ঢুকতে পারে সেখানে আর অচেতনা থাকেনা। উনি শুধু এই কাজই করেন। যেখানে দেখেন অচেতনা রয়েছে সেখানেই ঢুকতে চেষ্টা করেন। যদি কোথাও শক্ত চাবি আঁটা থাকে, সেখানে ঢুকতে একটু বিলম্ব হয়, নতুবা দরজা খোলা পেলেই তিনি ঢুকে পড়েন, আর অচেতনা তখনই ঘুচে যায়—এতে কোনোরূপ কৌশলের প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই সেখানে চেতন হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রকৃতি তেমন নয়, সে অনেক কৌশল জানে, তাই সে সর্বদাই তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, আর তোমাকে সেই মতো ঘুরতেই হয়। তার কাছে তোমরা পুতুলনাচের পুতুলের মতো মাত্র। তোমাদের মাথার মধ্যে সে এমন মোহ দেয় ঢুকিয়ে, যে তার প্রভাবে সেইরকম কাজগুলো তোমাদের করতেই হয়, তোমরা তা করতে না চাইলেও, আর এটাই তার কাজ। তোমরা নিজেরা নাই-বা চাইলে, তার দড়ির টানে তোমাদের দিয়ে তা ঠিকই করিয়ে নেবে। আর সেই কারণেই আমরা কখনো কখনো বিবাদ বিসম্বাদ পর্যন্ত করে থাকি, কিন্তু সে কথা বলতে নেই।

প্রশ্ন আপনি এখানে বলেছেন যে আমরা "কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ", কিন্তু কখনো যদি সেখানে ভগবৎ কৃপা কাজ করে তাহলে সবই বদ্‌লে যায়...

উত্তর হাঁ সম্পূর্ণরূপেই, কৃপা কর্মকে সম্পূর্ণই পাল্‌টে দেয়, সূর্যের তাপ লাগলে মাখন যেমনভাবে গলে যায়।

এইমাত্র আমি সেই কথাই বলছিলাম। তুমি যে প্রশ্ন করলে তাতে আমার বলাই হয়ে গেল। যেন আমিই তোমার স্থলে থেকে তোমাকে প্রশ্ন করছি, ওর জবাব এই—তোমার আত্মীয়া যদি পুরো নির্ভেজাল হয় বা প্রার্থনা সনির্বন্ধ হয়, তাহলে ওর দ্বারা এমন কিছুকে নিজের মধ্যে নামিয়ে আনতে পারো যা সব কিছুকে উল্‌টে দেবে—প্রকৃতপক্ষেই সমস্ত বদ্‌লে যাবে। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, একথা বোঝাবার জন্য : মনে করো একটা পাথর বা টালি উপর থেকে পড়ল ; আল্‌গাভাবে থাকলেই তা পড়বে, নয় কি? কিন্তু সেখানে দিয়ে যদি মনপ্রাণের নিয়তির দরুন এমন কেউ গিয়ে পড়ে যে সেটাকে পড়তে না দিয়ে তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সেটা মাটিতে না পড়ে তার হাতের উপরেই পড়বে। অতএব সে ওখানে এসে ঐ পাথর বা টালির নিয়তিকে বদ্‌লে দিলে। আবার অন্য একটা নিয়তি আসাতে পাথর বা টালি তার মাথার উপর পড়ে তাকে খুন ক'রে ফেলার পরিবর্তে ওর হাতের উপরেই পড়ল। এমনি রকম হবে অন্য এক স্তরের হস্তক্ষেপ, অচেতন কর্মনিয়তির উপর চেতন ইচ্ছার ক্রিয়া।

প্রশ্ন তাহলে কর্মের ফল যে অবশ্যম্ভাবী এমন কোনো কথা নয়?

উত্তর একেবারেই না। সকল ধর্মেই অনেকে বলে এমন অবশ্যম্ভাবী বিধানের কথা, কিন্তু আবার মনে হয় তা ঐ পূর্বোক্ত প্রকৃতির দড়ি টানার নকলে। লোকের বরাবর একটা প্রবৃত্তিই থাকে প্রকৃতির মতো দড়ির টানে চলতে; তাই তাদের বলা হয়, "তোমার কৃতকর্মের ফল তোমাকে ভুগতেই হবে"।...বিবর্তনের একরূপ অবস্থাতে এমন একটা ধারণা করিয়ে দেবার দরকারই হয়, যখন লোকে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে আপন আনিষের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, তার ফল কি হবে তা কিছুমাত্র না জেনে। এখনও অনেকেই এমন, হয়তো অধিকাংশই তাই তারা চলে আপন প্রবৃত্তির খেয়ালে, তাতে নিজের বা পরের কি ক্ষতি হবে তা দেখতেই চায়না। সে ক্ষেত্রে এটা ভালোই, যখন কেউ চোখ রাঙিয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে বলে, "খবরদার, ও কাজ করলে তোমাকে তার ফল ভুগতেই হবে বহুকাল পর্যন্ত"। কেউবা বলে, "পরজন্মেও এর ফল ভোগ করতে হবে"। যদিও তা উদ্ভট গল্পকথা। তবুও তা লোকের ভালোর জন্যই। কোনো কোনো ধর্মে বলে: "অমুক পাপ কাজ করলে অনন্ত নরকে যেতে হবে"। তাই তোমরা অমন কল্পনা করে থাকো!...এতে লোকে ভয় পেয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে নিবৃত্ত হয়—যদিও তা সকল সময়ে নয়। কখনো-বা চিন্তাটা আসে কাজটা ক'রে ফেলার পরে, একটু দেরীতে।

কর্মফল যে একেবারে নির্ধার্য তা নয়। কতকটা হলেও তবু তার মধ্যে যথেষ্ট মনের কাজ রয়েছে, আন্তরিক জিনিস হলেও টুকরো টুকরো ভাগ ক'রে নেওয়া, যেমন "এটা করো বা ওটা করো। এটা না হলে ওটা হবে"। এতে জীবন হয় কণ্টকিত। মাথা গুলিয়ে ভয় পেয়ে লোকে ভাবে "এটা ঠিক না ওটা ঠিক"? কোনোটাই না হলে যেন বাঁচে। কিন্তু দরকার হলো উপরে ওঠা। তার সিঁড়ির দরজা আছে আবদ্ধ, তাকে খোলার জন্য চাবি চাই। তার কথাই এইমাত্র বললাম, তা হলো ঐকান্তিক আস্পৃহা বা একাগ্র প্রার্থনা। 'বা' কথাটি বলছি, কারণ কেউবা পারে এটা কেউবা অপরটা। কিন্তু দুই জিনিসেরই আছে ঐন্দ্রজালিক শক্তি, যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করতে জানো।

দুটোর মধ্যেই চমৎকার ব্যাপার আছে। একদিন তোমাদের বলব যে আস্পৃহাতে কি আছে আর প্রার্থনাতে কি আছে, আর দুটোই কেন খুব সুন্দর।...কেউ কেউ প্রার্থনা পছন্দ করেনা; হৃদয়ের গভীরে তারা খোঁজ করলেই দেখবে যে সেখানে রয়েছে গর্ব—তার চেয়েও খারাপ জিনিস, অহংকার। আবার কারো কারো মধ্যে আস্পৃহা নেই, চেষ্টা করেও আনতে পারে না; তার মানে তাদের ইচ্ছার ঔজ্জ্বল্য নেই, কিংবা তাদের মধ্যে দীনতার দীপ্তি নেই।

দুইই চাই। অতিশয় দীনতা ও প্রবল ইচ্ছার জোর থাকা চাই, তবেই কর্মফলকে বদ্‌লে দেওয়া যাবে।

—শ্রীমা

পথের কথা

মার্চ ১৩, ১৯৬৮

(পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেছিল—ভগবান কি আমাদের থেকে সরে যেতে পারেন ? তার জবাবে মা বলেছিলেন—"তা অসম্ভব। কারণ ভগবান কিছু থেকে সরে গেলেই তৎক্ষণাৎ তার বিলোপ হবে, তা এক মুহূর্তও টিঁকবে না। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে ভগবানই সব অস্তিত্ব।" —মে ২৭, ১৯৫৬)

কিন্তু এখন হলে আমি বলতাম তুমি যেন জানতে চাইছ যে ভগবান নিজের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন কিনা। (হাসা) কিন্তু মুশকিল এই যে আমি যখন বলি পরম দিব্য বা 'ডিভাইন' (Divine) এর কথা, ওরা তখন মনে করে বলছি ঈশ্বর বা 'গড্' (God) !...আসল কথা, একমাত্র সেই জিনিসই আছে। কী জিনিস ? সে তাহাই, উহাই।

(নীরব থেকে)

আজই সকালে, আমি চেয়ে দেখতে দেখতে যেন তাঁকে বললাম, "তুমি নিজেকে অস্বীকার ক'রে কি সুখ পাও ?"...আমরা আমাদের যুক্তিবুদ্ধির তরফ থেকে বলি যা কিছু অন্ধকার, অসুন্দর, নিষ্প্রাণ, অসঙ্গত, তার মধ্যে ভগবান নেই—কিন্তু তা কেমন ক'রে সম্ভব ?...

এ শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনে একটা ঐরূপ মনোভাব গ্রহণ করা। তাই ব্যবহারিক কর্মের তরফের চেতনা নিয়ে বললাম, "তুমি অমন এড়িয়ে থাকাতে কি সুখ পাও ?" (মা হাসলেন)

দেহকোষদের মধ্যে একটা নিরেট অনুভূতি চলছে (যা অনুভবও নয় বা সংবেদনও নয়), একটা বোধ যে তুমি এক গুহ্য সত্যের নিতান্ত কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছ...অকস্মাৎ সম্পূর্ণ এক দল কোষ বা তাদের একটা দৈহিক ক্রিয়া যেন মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেছে—কেন ? কী অর্থ এর হতে পারে ?...মনে হয় যেন সীমার গণ্ডিটা ভেঙে দিতে চায়।

কিন্তু কেন, এবং কেমন ক'রে ?

মনের দিক থেকে সব কিছুরই ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তাতে কোনো সমাধান হবেনা ; দেহের পক্ষে, বাস্তব চেতনার পক্ষে তা অকেজো হবে। বাস্তব চেতনাতে যতটা যা জানা যায়, তা যে মনের জানার চেয়ে একশো গুণ বেশি তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু এমন জানে বলেই সে এত জোর পায়, কারণ জানা মানেই শক্তিলাভ। তাই তখন সে অল্পে অল্পে নিজের কাজ করতে থাকে। আর অজ্ঞান চেতনার কাছে তা হয় বেদনাদায়ক কিন্তু সত্য চেতনার কাছে তা নয় : তার কাছে বেদনা, আনন্দ, সবই একটা উপায়... সব কিছু দেখার ও বোধ করার ওটা বৈচিত্র্যময় ধরন।

উত্তরোত্তর নিরেট রকমে একটা বোধ আসে যে এমন কোনো কিছুই নেই যার মধ্যে সত্তার আনন্দ নেই, কারণ আনন্দ ছাড়া তার সম্ভূতিই হয় না। কিন্তু সত্তার আনন্দ বলতে লোকে মনের দ্বারা যা বোঝে সে জিনিস নয়। তা যে কেমন...সে কথা বলা শক্ত। আর এই বেদনা ও আনন্দ, ভালো মন্দের বোধ, এগুলোর দরকার আছে কাজের প্রয়োজনে, যাতে নিশ্চেতনার মধ্যেই কাজটা হয়ে যেতে পারে। কারণ সত্য চেতনা হলো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আর সেই কথাই এখন শিখছে দেহকোষদের চেতনা, ঐ নিরেট অনুভূতির ভিতর দিয়ে, যাতে ভালো মন্দের বোধ, আনন্দ ও বেদনার বোধ, এগুলোকে দেখায় ধোঁয়ার মতো। কিন্তু তথাপি যা সত্য—যা আসল বস্তু, তা তখনও ধরা পড়েনা। ধরবার মুখে এলেও ধরা যায় না। যখন ধরতে পারবে...তখন সে তো সর্বশক্তির অধিকারী হবে। তা সম্ভব হবে যখন সমগ্র জগৎ বা তার গোটা একটা অংশ রূপান্তরের জন্য তৈরি হয়ে উঠবে।

এটাকে অনুমান বলতে পারো, ভাবগ্রাহ্য বলতে পারো, কিন্তু এ হলো উপরকার রাজ্যের অন্তর্গত।

সময়ে সময়ে যেন সর্বশক্তির বোধটা এসে স্পর্শ করে, বোধহয় এবার নিলে যাবে (মা মুঠোতে ধরার ভঙ্গী করলেন)...কিন্তু তা সরে যায়।

যখন তা কেউ পেয়ে যাবে, তখন জগৎটাও বদ্‌লে যেতে পারবে। কিন্তু 'কেউ' মানে কোনো ব্যক্তি নয়।...হয়তো সেই একজনের মতো, কিন্তু...তাও ঠিক বলা যায় না, হয়তো আমাদেরই চেতনা আমাদের ছাড়িয়ে কোনো কিছুর উপর আরোপিত হবে।

শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই বলতেন—তুমি যদি নির্ব্যক্তিককেও ছাড়িয়ে যেতে পারো তাহলে কোনো একটা ব্যক্তির মতো কিছুতে গিয়ে পৌঁছবে, কিন্তু আমরা ব্যক্তি বলতে যেমন ধারণা করি সে জিনিস নয়।

তাই বলছি কেবল তাহাই মাত্র আছে : সব কিছু শক্তি সেই তাহারই। কিন্তু "তাহাই আছে" যখন বলি (হেসে) তখন তা অন্যরকম ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে যায়।...ভাষা, বাক্য এগুলি চেতনার উপরকার জিনিসকে প্রকাশ করবার পক্ষে অনুপযুক্ত ; ভাষাতে ধরতে গেলেই তা গলে বেরিয়ে যায়।

মার্চ ১৬, ১৯৬৮

এমন একটা ভাব অনুভবে সর্বদাই আসতে থাকে—সব সময়ের জন্য, যে—তুমি যেন একটা নস্ত নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চলেছ, আর যখন তা আবিষ্কার হয়ে যায় তখন দেখ যে তার আবিষ্কার নিত্যই হয়েছে !...কেবল তুমি তাকে দেখছ অন্যরকম দৃষ্টিতে।

আজই সকালে একটা অনুভূতি এলো যাকে মনে হল বুঝি এক অপূর্ব অসাধারণ উন্মীলন...অথচ তা বরাবরই জানা ছিল। যখন তাকে মন দিয়ে বুঝে নিতে গেলাম, তখন জিনিসটা স্পষ্ট হলো বটে, কিন্তু আগে যা ছিল তা আর নেই। তুমি বলতে পারো যে এখনকার এই যে সৃষ্টি, এ একটা "সুস্থিতি ও সাম্যের সংগঠন", এর একটা জিনিসকে গ্রহণ ক'রে অন্যটাকে বর্জন করতে যাওয়া কেবল মনের ভুল, বস্তুত সবই থাকবে একত্রে: যাকে বলো ভালো আর যাকে বলো মন্দ, যা উচিত আর অনুচিত, সন্তোষজনক আর অসন্তোষজনক, সবই একত্রে মিলে থাকা চাই। অথচ আজ সকালে হলো এই ভাগাভাগির আবিষ্কার—যা কত ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, কখনো-বা গল্পচ্ছলে, কখনো-বা বিবিক্তরূপে, কখনো দার্শনিকভাবে, কখনো আর কিছু—সবই ওর ব্যাখ্যা মাত্র, কিন্তু একটা কিছু আছে যাতে সরাসরি সব বিষয়ীভূত করা যায় (মা একটা ভঙ্গীতে দেখালেন অনভিব্যক্ত থেকে বিশ্বের নির্গমন), কিন্তু তাও ব্যাখ্যা করবারই পন্থা হবে মাত্র। এই যে ভাগাভাগি, প্রকৃতপক্ষে এটা কী ব্যাপার? কেউ তা জানেনা। কিংবা হয়তো কেউ জানতে পারে, আমি জানিনা। মূলতঃ তাহাই এগুলোর সৃষ্টি করছে (বর্ণের দিক দিয়ে) কালো আর সাদা, রাত্রি আর দিন (যদিও তা মিশ্রিত জিনিস, কিন্তু কালো সাদাও তাই), যাতে দুই বিপরীত প্রান্তে ভাগ করার একটা প্রবণতা রয়েছে: সুখ অর্থাৎ ভালো, অসুখ অর্থাৎ মন্দ। কিন্তু যেমনি আবার মূলের দিকে ফিরে যাও অমনি ওগুলো পরস্পরে এক হয়ে মিলে যায়। তাই সেখানে পূর্ণ সমতা, ভাগাভাগি আর সম্ভব নয়, একটা অন্যটাকে প্রতাবিত করেনা, কারণ দুই মিলে এক হয়ে গেছে আর পূর্ণতাকে পূর্ণরূপে ফিরে পাচ্ছ। একটাকে প্রত্যাখ্যান আর অন্যটাকে গ্রহণ, এ নিতান্ত ছেলেমানুষী। এ অজ্ঞানতা। আর মনের এমনি তর্জমা করা যে মন্দ চিরদিনই মন্দ, এবং তার থেকে নরকের সম্বন্ধে একটা ধারণা; আর ভালো যা তা চিরদিনই ভালো, এ সবই ছেলেমানুষী কথা।

(নীরব থেকে)

এমন হতে পারে (হতে পারে কারণ, যেমনি তুমি মন দিয়ে ধরতে চাও অমনি তা গুটিয়ে সংকীর্ণ হয়ে সত্যের তেজ হারিয়ে ফেলে...)—যে, বিশ্ব যে ভাবে তৈরি তাতে পূর্ণতা জিনিসটা...(মা অনেকক্ষণ থেমে রইলেন)। বাক্য এখানে হার মানছে। তাই বলা যায় (যে এটা নীরস, নিষ্প্রাণ); সমগ্রটা এক হয়ে ব্যক্তি চেতনাতে এটা অনুভূত, অবিচ্ছেদ উপলব্ধিও হচ্ছে। কিন্তু এও কেবল বাক্য ছাড়া আর কিছু হলোনা।...বিশ্বের এরূপ সৃষ্টি হয়েছে চেতনাতে এই কূট আত্মবৈচিত্র্যের উপলব্ধির জন্য, সমগ্রের সর্ব অংশে, তার সকল রকম উপাদানে (কেবল জানা নয় কিন্তু হওয়া)।

তাই সেই মূল উপাদানগুলি সেইভাবে গড়া শুরু হলো বিভিন্নরূপে, যার থেকে ভালো আর মন্দের তফাৎ হলো। কিন্তু অনুভবের দিক দিয়ে—অর্থাৎ স্থূল সত্তায় অনুভব—তাই থেকে দাঁড়াল বেদনা আর আনন্দ। অতএব আসল কাজ হলো সকল

ভেদাভেদ থাকিয়ে দিয়ে সর্বাংশে এক পূর্ণ চেতনাকে উপলব্ধি করা (যা মনের দিক থেকে অযৌক্তিক হলেও তাই খাঁটি কথা)।

আমার রুচির পক্ষে এটা বড়ো বেশিরকম দার্শনিক কথা হচ্ছে, যথেষ্ট বাস্তব ধরনের নয়, কিন্তু আজ সকালে আমার কাছে যে অনুভূতি এলো তা দেহের চেতনাতে প্রকৃত বাস্তব সংবেদন রূপে—অর্থাৎ নিত্যকার এই দ্বৈত ভাব (আপাতদৃষ্ট), এই বৈপরীত্য, একটাকে ফেলে অন্যটা—যার প্রতীক হলো ঐ বেদনা ও আনন্দ। আর যা সত্য অবস্থা—তা এখন ভাষাতে ব্যক্ত করা যাচ্ছেনা, কিন্তু অববারণ ও ভুক্তি হয়েছে—তা হলো সমস্ত মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণতা, যার উপাদানগুলির মধ্যে কোনো কিছু বৈপরীত্য নেই, আছে সব কিছু নিয়ে একটা সঙ্গতি ও সাম্য। আর সৃষ্টির মধ্যে যখন এই সাম্য আসবে, তখন সৃষ্টিতে হবে...(কথায় বলা দুষ্কর), বলতে পারো একটা অবাধ ঊর্ধ্বোন্নতি ; কিন্তু তাও ঠিক হলোনা।

আর এই কয় দিনে বর্তমানের অপূর্ণ চেতনাতে বারেবারেই দেখা গেল (এমন সুশৃঙ্খল ভাবে যা আমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক শ্রেষ্ঠ) এমন এক অবস্থা যা ঐ সঙ্গতিকে ভেঙে দিতে পারে, অর্থাৎ তার কাঠামোটা নষ্ট করে দিতে পারে, যাকে বলে "মৃত্যু" তারই চূড়ান্ত রূপ—আর সেই সঙ্গে আরো এক অবস্থা (বোধে মাত্র নয়) যাতে সেই ভাঙা নিবারণ ক'রে অগ্রগতিকে অপ্রতিহত রাখে। দেহ চেতনাতে সেই অনুভূতিই এলো (একই সঙ্গে) যাকে বলা যায় ঐরূপ ভেঙে যাবার চূড়ান্ত বেদনা (ঠিক তেমন না হলেও) এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলনের চূড়ান্ত আনন্দ—একই কালে দুই জিনিস।

সাধারণ ভাষাতে তর্জমা করলে দাঁড়ায় গঠনের চূড়ান্ত ভঙ্গুরতা—তার চেয়েও বেশি—এবং গঠনের চিরন্তনতা। এবং তা কেবল মিল হওয়া মাত্র নয়, অভেদ্য ভাবে জুড়ে যাওয়া, একাত্ম হয়ে যাওয়া, আর তাই হলো সত্য।

মনের ভাষাতে এই ভাবে বললে সকলের পক্ষে কিছু পরিষ্কার হয় বটে—কিন্তু তাতে আসল মর্ম বাদ পড়ে যায়, ও জিনিস মনের ভাষায় বলা যায়না।

প্রশ্ন : দুই অবস্থার যে দুইরকম চেতনা তা কি একযোগে হবে ?

উত্তর আলাদা আলাদা আকারে নয়। দুই জিনিসকে একত্রে মিলিয়ে যে চেতনা ঘটবে তাই হবে সত্য চেতনা"—"মিলিয়ে কথাটি বলতে গিয়েও সেই ভাগ করে বলাই হচ্ছে—অর্থাৎ একাত্মীভূত হওয়া। তখন বোধ আসে যে এই চেতনাই হলো পরমা শক্তি। শক্তি কোনো বাধা ও প্রত্যাখ্যান পেলে খর্বিত হয়, নয় কি ? যে শক্তি অধিকাংশ জিনিসকে জয় করতে পারে তাই হলো জোরালো শক্তি ; কিন্তু তাও মোটের উপর অপূর্ণ ; কেবল দুই জিনিসকে জুড়ে নিয়ে যে শক্তি তাই হবে সর্বশক্তিমান শক্তি। তাইই পরমা শক্তি। দেহেতে যদি তারই উপলব্ধি ঘটে...তাহলেই হয়তো সকল সমস্যা মেটে।

এই সকালে যে কয়েক ঘন্টা ওরূপ অবস্থাতে ছিলাম, তখন বোধ হচ্ছিল যে সব কিছুই জয় করা হলো, সবই বুঝতে পারা গেছে।" "বুঝতে পারা" মানে সেই পরমা শক্তির অবধারণ হওয়া। সে কিরূপ তা মুখে বলা যায়না।

যারা এমন অনুভূতি বা এর স্পর্শ পেয়েছে তারাই তার তর্জমা ক'রে বলেছে যে জগৎ সমতাময়,—অর্থাৎ সবই একত্রে মিশে, তার মধ্যে বৈপরীত্য বা ভাগাভাগি নেই। কিন্তু যেমনি ও থেকে একটু সরে যায় অমনি শুরু হয় প্রভেদ। এবং তা আর চিরন্তন থাকেনা। কেবল ঐরূপ অবস্থাই চিরন্তন...তার মানে শুধু চিরন্তন হয়েই থাকেনা, কিন্তু তাকে বিকাশ করে (তা ছাড়া আর কি বলি?)।

এই নিয়ে কত রকম দার্শনিক তত্ত্ব হয়েছে ও কত রকমভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সবই ভাসা ভাসা, মানসিক, আনুমানিক। আসলে তার ভুক্তি চাই, অর্থাৎ সেই জিনিস "হয়ে যাওয়া" চাই।

প্রশ্ন এ কি সেই মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির বাস্তব প্রকরণ যাতে অসতের বোধ সৎএর মধ্যে বিলীন হবে, এমন কি তা অসতের মধ্যেও?

উত্তর হাঁ, তাই, কিন্তু এটা মানসিক ধারণার পরিবর্তে হওয়া চাই পুরো খাঁটি নিরেট উপলব্ধি। *

—শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S. A. I. C. E.-থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্যাম্বেলপুরের পাট এবার ফুরাইল। যাত্রা আবার সুরু হইল। যাত্রার শেষ নাই। কোথাও স্থির হইয়া বসিবার সময়ও নাই, সুযোগও নাই। নূতন কোন স্থানে যাওয়ার মানেই হইল, সেখানে গিয়া নূতন কোন কায়দা রপ্ত করা—হয়ত বা নূতন প্রকার বিমান উড়াইবার কায়দা, নতুবা সেই বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, অথবা সেই বিমান হইতে মাটিতে বা বিমান হইতে উড়ন্ত শত্রু-বিমানের উপর গুলি নিক্ষেপ করিবার যেসব শ্রেষ্ঠ রীতিনীতি আছে তাহা জানিয়া লওয়া।

বিমান বাহিনীতে শিক্ষার শেষ নাই। প্রথমত কিছুদিন পরে পরেই নূতন নূতন বিমান নির্ম্মিত হইয়া আসে। তখন যত স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব সেই বিমানগুলির সব কিছুই রপ্ত করিতে হয়।

বিমানবাহিনীর জন্য নূতনতর জঙ্গী বা বোমারু বিমান তৈয়ারীর পরিকল্পনাকে, সব দেশের কর্ত্তারাই, শুধু পরিকল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সব সময় চেষ্টা করেন। ইহার উদ্দেশ্য, যাহাতে তাহাদের দেশের বিমান যেন অন্য সব দেশের বিমানগুলির তুলনায় দ্রুততর হয় এবং আরও বেশী মারাত্মক হয়। কেননা, যদি কখনও যুদ্ধ বাধে, তখন যাদের বিমান যত বেশী যুদ্ধোপযোগী তাদেরই অন্য দেশকে বিনষ্ট করিবার আশাও তত বেশী। যে দেশের বিমানবাহিনী বিমানযুদ্ধে, শত্রুকে হটাইতে অপারগ হইল, তাহাদের স্থল-সৈন্যদের পক্ষে তখন দেশ রক্ষা করা অতীব দুঃসাধ্য। সেইজন্য সব দেশেরই প্রচেষ্টা যাহাতে নিজ নিজ বিমানবাহিনীর বিমান-গুলি শত্রুপক্ষের বিমানগুলির তুলনায় গতিবেগে, মারনাস্ত্রে, আকাশে নানাভঙ্গিতে উড়িবার কৌশলে—এক কথায় শত্রুবিমান নিপাতক্ষমতায় উৎকৃষ্টতর হয়। শত্রুবিমান-নিপাত-ক্ষমতার কথা বলিতে গেলে, আর একটা কথা খুব জোর দিয়া বলা প্রয়োজন। বিমান শুধু উৎকৃষ্টতর হইলেই হয় না। বৈমানিক বা বিমান চালকের বিমান চালনা শিক্ষা ও তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতার তৎপরতা, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস, শত্রু বিমান নিপাত কার্য্যে বিশেষ ফলপ্রসূ। এমন ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিমান লইয়াও গুণবান বিমানচালক অনেক উৎকৃষ্টতর বিমানকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিয়া নিপাত করিয়াছে।

সেইজন্য নূতনতর জঙ্গী ও বোমারু বিমান বানাইবার পরিকল্পনা যেমন সব দেশের কর্ত্তারাই সব সময় করিতেছেন তেমনি নূতনতর বিমান পরিকল্পনার পর যখন নূতন বিমান

দেশের বিমানতৈরী কারখানা হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিল, তখন বৈমানিকদেরও সেই বিমানে উড়িবার কায়দা হইতে শুরু করিয়া, জঙ্গী বিমানে—শত্রুবিমান নিপাত করিবার যতরকম ব্যবস্থা হইতে পারে, সবগুলিই আয়ত্ত করা শুধু নয়, একেবারে রপ্ত করিয়া নিজের স্বাভাবিক অঙ্গচালনার পর্যায়ে লইয়া আসার জন্য কাজ শুরু করিয়া দিতে হয়। বোমারু বিমানে শত্রু দেশের মধ্যে যাইয়া, লক্ষ্যস্থানের মধ্যস্থলে বোমা বর্ষণের এবং সেই সঙ্গে শত্রুজঙ্গী বিমানের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া আসার সমস্ত উপায়ই ঐ সময়ে রপ্ত করার পন্থা আয়ত্ত করিয়া লইতে হয়। যে দেশের বৈমানিকরা এই শিক্ষায় ও প্রচেষ্টায় উদ্যমশীল হয়, তাহাদের বিমান শত্রুপক্ষীয় বিমান হইতে নিকৃষ্ট হইলেও জয় তাহাদের প্রায় সুনিশ্চিত। এ কথা একবার নয়, বহুবার বহু পরীক্ষার পর, বহু আলোচনার পর সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এ কথা সত্য না হইলে ব্রিটেনের বিমানযুদ্ধে, জার্মানীর জয় হইত। জার্মানীর বিমান বাহিনীর তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র বিমানবাহিনী লইয়া, ব্রিটেনের কয়েকজন নুষ্টিনেয় আত্মবিশ্বাসী বিমানচালক, অমন দুর্দ্ধর্ষ জার্মান বিমানবাহিনীকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিল। সংখ্যায় অল্প হইলেও, প্রথমত: ইংলণ্ডের ছিল—অদম্য সাহসী বৈমানিক সব; আর দ্বিতীয়ত, সেই বৈমানিকদের অনুশীলন ছিল নিখুঁত এবং যতদূর সম্ভব সর্বাঙ্গসুন্দর।

ক্যাম্বেলপুর ত্যাগ করিয়া এবার আমাদের স্কোয়াড্রন ভূপাল সহরের নিকটবর্ত্তী বৈরাগড়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে চলিল। পূর্ব্বের মতই একদল বিমানে উড়িয়া চলিল। এবার স্কোয়াড্রনের হিসাবে বিমানের সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—সংখ্যায় কুড়ি বাইশ খানা, তাহার মধ্যে দুইটি হার্ভার্ডশিক্ষা-বিমান ও প্রায় কুড়িখানা ভল্টি কোম্পানীর ভেনজিয়ান্স বিমান। প্রত্যেক বিমানে দুইজন করিয়া বিমানচালক—সম্মুখের ককপিটে একজন ও পশ্চাতের ককপিটে একজন, যে একাধারে বেতারবার্ত্তা পরিবেশনকারী, নেভিগেটর এবং পশ্চাতের দিকে গুলিনিক্ষেপকারী। এই চল্লিশজন ছাড়া আর সকলেই স্পেশাল ট্রেনে চলিল। এবারও ট্রেনের ব্যবস্থা উত্তম। নবাগত সার্জেন্ট হাশ্‌নী বিজলী বিদ্যায় ওস্তাদ এবং সার্জেন্ট দাসগুপ্ত বিমানের বন্দুক ও বোমা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ওস্তাদ; এই দুইজনের তত্ত্বাবধানে ট্রেন চলিল। রাস্তায় খাদ্য, রন্ধনকার্য্য ও পরিবেশনে এই দুইজন অদ্বিতীয়। সেইজন্য দুইশতেরও অধিক বৈমানিকরা ট্রেনে বেশ আরামেই, দিন কয়েক পরে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছাইল। আমরা কয়েকজন বিমানে সেই দিনই পৌঁছাইলাম।

এখানে, একেবারে নূতন ধরণের শিক্ষা সুরু হইল। এতদিন ক্যাম্বেলপুরে বিমান উড়াইবার ও সেই সাথে লক্ষ্যস্থানের মধ্যস্থলে বোমা বর্ষণের মহড়া চলিতেছিল। সেখানে লক্ষ্যস্থানের নিকট হাজার দশেক ফুট উচ্চে উড়িয়া আসিয়া প্রথমে ইঞ্জিনের জোর একেবারে কমাইয়া দেওয়া হইত। তারপর লক্ষ্যস্থলের ঠিক উপরে আসিয়াই বিমানকে একদিকে কাত করাইয়া সরাসরি নীচে নামাইয়া ফেলা হইত—জ্যানিতির ভাষায় বলা চলে—প্রায়

নবরুই ডিগ্রীতে নামিয়া আসা। যখন প্রায় আট হাজার ফুট অবতরণ করিয়া, লক্ষ্যস্থানের মধ্যস্থলের উপর বিমানটি নিজেই একেবারে সোজা নিশানা হইল, আর প্রায় হাজার দুই ফিট অবতরণ করিলে বিমান দ্বারাই বোমার কাজ সম্পন্ন হইবে সেই সময় অর্থাৎ প্রায় হাজার দুই ফিট নীচে মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে, বিমানের পেটের তলার খোল খুলিয়া, জোড়া বা একটা বোমা নীচে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বিমান লক্ষ্যস্থলের নিশানা হওয়ায় বোমাও সেই নিশানার দিকে তাক করিয়া পড়িত। বোমা ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনকে পূর্ণ গতিতে চালাইয়া বিমানকে প্রায় সোজা উপরের দিকে চালনা করা হইত। অনেকসময় সোজা উপরের দিকে না তুলিয়া, মাটির কিছু উপর দিয়া যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্যস্থলের নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হইত। পরে নির্বিঘ্নে সবাই একসাথে আবার জোট বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিত। ক্যাম্বেলপুরের এই ছিল শিক্ষণীয় কাজ।

বৈরাগড়ে শিক্ষার কাজ একেবারে অন্যপ্রকার। এখানে নিশানাবত বোমাবর্ষণের শিক্ষা নয়। এখানে হইল, নিশানাবত গুলি নিক্ষেপ করা—সে নিশানা মাটির উপরই হউক বা আশমানেই হউক। যদি মাটির উপর হইল, তাহা হইলে নিশানার দিকে ইঞ্জিন পূর্ণবেগে চালু করিয়া, বিমান গর্জাইতে গর্জাইতে দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে ধাবিত হইবে। বিমানকে ঐভাবে গর্জাইতে গর্জাইতে নিশানার দিকে ধাবিত দেখিয়া, নিশানা রক্ষাকারী গোলন্দাজদলের ভয়ে পলায়মান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি তাহারা ভয়ে না পালায় তবে বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিবিদ্ধ হইয়া রক্ষাকারী গোলন্দাজদলকে জীবন দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে নিশানাও গুলিবিদ্ধ হইয়া কার্যাক্ষমতা হারাইবে। যদি নিশানায় শত্রুপক্ষের গুলিবারুদ থাকে ত ভালই। গুলিবিদ্ধ বারুদ বিস্ফোরণে লক্ষ্যস্থলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। এই কাজে আবার অনেক সময় উল্টা ফলও হয়। নিশানাস্থল রক্ষাকারী গোলন্দাজ দলে যদি কোন স্থির-প্রতিজ্ঞ, শান্ত-মস্তিষ্ক গোলন্দাজ থাকে, তাহা হইলে প্রায়ই দেখা যায়, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, বিমান সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, শান্ত-মস্তিষ্ক গোলন্দাজের গুলিতে ভূপতিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণবেগে ধাবমান বিমান ঈষৎ নামিয়া আসার ভঙ্গীতে যখন লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়িয়া চলে, তখন সামান্য একটা-দুইটা গুলিতে বিমানটির ভারসাম্য না হারাইবারই কথা। কিন্তু কোনওক্রমে যদি বিমানচালক গুলিবিদ্ধ হয়, সেই গুলি তাহার শরীরের যেখানেই বিদ্ধ হউক না কেন, সামান্যক্ষণের জন্য বৈমানিকের মনোযোগ বিমান চালনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আর ঈষৎ অবতরণের ভঙ্গীতে বিমান যখন তীব্র বেগে ধাবমান, তখন এই সামান্য ক্ষণের বিপত্তিই বিমানকে ভূপাতিত করিয়া ফেলে। সেইজন্য, যখন কোন বিমানের এইভাবে কোন গোলন্দাজ দ্বারা রক্ষিত নিশানাকে আক্রমণ করিতে হয়, তখন দক্ষিণে ও বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। এখানে, বিমানটির অবতরণের কোণে কোনও পার্থক্য

থাকেনা, পার্থক্য থাকে শুধু নিশানার দিকে তাক করার। প্রথমে, হয়ত বিমানটি দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাইবে, পর মুহূর্তে বামে ঘুরিয়া রক্ষাকারী গোলন্দাজের নিশানা ভুল করিয়া দিবে, আবার পর মুহূর্তেই দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া গোলন্দাজের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। কারণ, গোলন্দাজের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিলেও বিমানের গতিবেগ তীব্র হওয়ার দরুণ গোলন্দাজ বন্দুকে নিশানা করিবার পূর্বেই বিমানটি আবার বন্দুকের পাল্লার বাহিরে চলিয়া যাইবে। সেইজন্য এই উপায়ে বিমান চালকের পক্ষে, যতকিতভাবে যেকোন ঘাঁটিই আক্রমণ করা সম্ভব।

বিমান ধ্বংসকারী কামানগুলি সব সময় এমনভাবে সন্নিবেশ করা হয় যাহাতে আকাশচারী শত্রু-পক্ষের জঙ্গী বিমান চালকের দৃষ্টিতে সহজে না পড়ে। বরঞ্চ শত্রু বিমান যখন তাহার এলাকায় আসিবে, তখন তাহার অজ্ঞাতসারে গুলি নিক্ষেপ করিয়া শত্রুবিমানটিকে ভূপাতিত করিয়া ধ্বংস করিতে পারে। সেইজন্য বিমানধ্বংসকারী কামানগুলি বড় বড় বৃক্ষরাজির বাগানের বধ্যখানে বা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় সন্নিবিষ্ট করা হয়।

এইরূপে লুকাইয়া থাকার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সব শত্রু-বিমান তাহার এলাকায় আসিবে, সে সবগুলিই বিমান চালকদের বুঝিবার পূর্বেই গুলি নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করা সহজ হয়। কিন্তু কয়েকখানা বিমান ধ্বংস হইলেই, শত্রুপক্ষের বিমান চালকরা সজাগ হইয়া উঠে, এবং নানা উপায়ে এই সমস্ত ঘাঁটিগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করে। শত্রু-বিমান চালকদের দৃষ্টিতে একবার পড়িয়া গেলে আর রক্ষা নাই। ঘাঁটিগুলিকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তাহারা নিশ্চিন্ত হয় না।

বিমান ধ্বংসকারী ঘাঁটিগুলি খুঁজিয়া বাহির করার জন্য বিমান চালকেরা নানা উপায় অবলম্বন করে। কখন-বা আকাশে খুব উচেচ, বিমান ধ্বংসকারী কামানের পাল্লার উর্দ্ধে থাকিয়া বিমান চালক নীচের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখে; কখন-বা আকাশে উড়িতে উড়িতে বিমানের ক্যামেরা দিয়া নীচের সমস্ত এলাকার ছবি তুলিয়া লয়। তারপর ছবিগুলিকে একের পর এক সাজাইয়া লইয়া আতস কাঁচের মধ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। সেই ছবির কোথাও গোলন্দাজ ঘাঁটি থাকিলে নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যায়। খোঁজকারী বিমান সব সময় একখানা করিয়াই পাঠান হয়। সেইজন্য যদি কোন কারণে খোঁজকারী বিমান ধ্বংস হয়, তখন ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব শত্রুর নিকট গোপন থাকিয়া যায়।

কখন কখন অনুসন্ধানের জন্য দুইখানা বিমান একত্রে পাঠান হয়। তাহারা শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করিবার সময় একজন থাকে কিছু উচেচ; আর দ্বিতীয়টি খুব বেগে যত দূর সম্ভব নীচু দিয়া উড়িয়া চলে। দ্বিতীয়টির উপর বিমান ধ্বংসকারী কামানের গুলি নিক্ষিপ্ত হইলেই উর্দ্ধে উড়ন্ত বিমানের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। তখন প্রথমটি নামিয়া আসিয়া ঘাঁটি আক্রমণ করে, আর দ্বিতীয়টি শত্রুবিমানের অতর্কিত আক্রমণ

হইতে প্রথমটিকে রক্ষা করে, আর তারপর যখন দ্বিতীয়টি আক্রমণে ব্যস্ত তখন প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে রক্ষা করে।

এইভাবে লীডার ও তাহার দুই নম্বর বিমান মাটির উপরস্থিত খাঁটিগুলিকে আক্রমণ করার জন্য শিক্ষানবিশি সুরু করে।

নিজেদের বিমানঘাঁটি ত্যাগ করার পূর্ব্বে দুই নম্বর তাহার লীডারের বিমানের দক্ষিণ পাশে খুব নিকটে ঘেঁসিয়া উড়িয়া চলে। কত নিকটে থাকিবে তাহা নির্ভর করে তাহাদের দুইজনের বিমান উড়াইবার কায়দা কতটা রপ্ত হইয়াছে তাহার উপর। লীডার ও তাহার দুই নম্বর সব সময় এমন ভাবে একত্র উড়িয়া চলিবে—যেন বিমান দুইটিকে দেখিয়া মনে হইবে যে মোটে একটাই উড়িতেছে দুইটা নয়। আকাশে উঠিবার পর হইতে লক্ষস্থলে পৌঁছান পর্য্যন্ত তাহারা একত্র থাকিবে। তারপর যখন লীডার আক্রমণে ব্যস্ত তখন দুই নম্বর তাহার লীডারকে রক্ষা করার ব্যস্ত থাকিবে। আবার যখন দুই নম্বর আক্রমণে ব্যস্ত থাকিবে তখন লীডার তাহার দুই নম্বরের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

এই একত্রে উড়িয়া যাওয়ার কায়দাটা হইল, দুই নম্বরের বামদিকের ডানা এক নম্বরের দক্ষিণ দিকের সম্মুখের ডানা ও পশ্চাতের ডানার মধ্যখানে রাখিয়া উড়িয়া চলিবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, দুইটি জঙ্গী বিমান যখনএইরূপে একত্রে উড়িতেছে তখন তাহাদের গতিবেগ ঘন্টায় অন্ততঃ তিন চারি শত মাইল। আবার, এত দ্রুত উড়িবার সময় বিমান দুইটিকে বিমান চালকরা শুধু সোজা সম্মুখের দিকে উড়াইয়া লইয়া যান না, তাঁহারা বিমান দুইটি একসাথে রাখিয়াই, দক্ষিণে-বামে, উপরে উঠাইয়া বা নাবাইয়া, অথবা নানা ভঙ্গিতে আকাশ-বাজি খেলা করেন, যেন বিমান দুইটিকে নাট্-বল্টু দিয়া জুড়িয়া একটা বিমানে পরিণত করা হইয়াছে। এত নিকটে থাকিয়া এত দ্রুত উড়িবার সময় বিমান চালকদ্বয়কে যেমন নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে রাখিবার প্রয়োজন হয় তেমনি তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীলও হইতে হয়। সামান্য এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের অতি সামান্য একটি ক্ষুদ্র ভুল, দুইজনেরই বিমানকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারে। দ্রুত উড়িয়া যাইবার সময় পরস্পরের সামান্য ছোঁয়াতেই দুইটি বিমানই মাটিতে পড়িয়া কতবার কতস্থানে যে চূর্ণ হইয়াছে—তাহার হিসাব নাই।

বৈরাগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হইল, বিমান হইতে আকাশে উড়নশীল দ্বিতীয় বিমানকে গুলিবিদ্ধ করা। আকাশে দুইটি বিমানই হয়ত তিন-চারিশত মাইল বেগে ধাবিত। আবার নিক্ষিপ্ত গুলিরও একটা গতিবেগ আছে। যেস্থানে শত্রু বিমানকে এইমাত্র দেখিলাম, সেইখানে নিশানা করিয়া যদি গুলি নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে নিক্ষিপ্ত গুলি যখন লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিল তখন নিশানাকরা বিমান বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। সেইজন্য এই কাজে একটি আকর্ষণীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নগতিবেগের কোন

বিমানের পশ্চাতে ইস্পাতের লম্বা রশি দিয়া সিল্ক দ্বারা নির্ম্মিত একটি চোঙ্গ বাঁধা থাকে। চোঙ্গটির ব্যাস তিন-চার ফিট্ আর লম্বায় ইহা প্রায় কুড়ি ফিট্ এবং রশিটি প্রায় একশত ফিট লম্বা অর্থাৎ বিমানের প্রায় একশত ফিট পশ্চাতে সিল্কের একটি চোঙ্গ উড়িয়া চলে। শিকারী বিমান ঐ সিল্কের চোঙ্গের উপর নিশানা পাকা করে। অনেক সময় এত দূরে থাকিয়া এত যত্ন লওয়া সত্বেও শিকারী বিমানের গুলি চোঙ্গটিকে বিদ্ধ না করিয়া, বিদ্ধ করে বিমানকে, যেটি এই চোঙ্গকে টানিয়া লইয়া উড়িয়া চলে।

আকাশ হইতে মাটির উপর গুলি নিক্ষেপ করার সময় বিপদ আরও বেশী। শিক্ষনীয় এই দুই প্রকার ব্যবস্থাতেই যথেষ্ট বিপত্তি থাকে। নানা প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত গঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্কোয়াড্রনকে এই দুই প্রকার কার্য্য শিক্ষার জন্য বৈরাগড়ে আসিতে হইয়াছে। আর প্রত্যেক স্কোয়াড্রনকেই কিছু কিছু বৈমানিক ও বিমানকে চিরতরে সেখানে রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রত্যেকবারই কমিটি বসিয়াছে, তাহাতে নানাপ্রকার প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, তারপর নানাভাবে আকস্মিক বিপদ যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্য নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। আকস্মিক বিপদ কমাইবার জন্য নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে, বিমান ঘাঁটিতে নূতন সরঞ্জামও বসান হইয়াছে। বৈমানিক ও বিমানকে বাঁচাইবার জন্য কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখা হয় নাই। তবুও, আকস্মিক বিপদের সংখ্যা কমান যায় নাই আর সেই বিপদে বৈমনিক ও বিমানের ধ্বংসের সংখ্যাও কমে নাই।

বিমানবাহিনীর কর্ত্তারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন বিমান হইতে গুলিনিক্ষেপ শিক্ষা করার সময় কিছু বিমান ও কয়েকজন বৈমানিক সব সময় আকস্মিক বিপদে ধ্বংস হয়। ধ্বংস হওয়াটা তাঁহাদের ভাষায় নষ্ট হওয়া। এ যেন কোন বস্তু প্রস্তুত করার সময় যেমন শতকরা কিছু বস্তু নষ্ট হয়, তেমনি কিছু বৈমানিক সহ বিমানও নষ্ট হইল। আমাদের সময় কর্ত্তারা বলিতেন. একশত বৈমানিক লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশজন বিনষ্ট হইয়া বাকী পঞ্চাশজন কার্য্যক্ষম রহিবে।

আমাদের স্কোয়াড্রনে বৈমানিক ও বিমান দুইয়েরই ক্ষতি অন্য স্কোয়াড্রনের তুলনায় অনেক কম হইয়াছিল। কিন্তু অনেক কম হইলেও আমাদের কাছে তাহার মূল্য মোটেই কম নয়। এখন সেইরূপ এক ক্ষতির গল্প বলিয়া, এবারকার মত শেষ করিব।

কেরালা হইতে আগত জর্জ ছিলেন একজন বিমানচালক। ছোট বলিষ্ঠ মানুষটি, মুখখানা গোল কিন্তু কারণে-অকারণে সেই মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, সেইজন্য সকলে তাঁহাকে হাসিমুখ বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সাথে. একই তালে পা ফেলিয়া চলার মত, বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছিল চক্রবর্ত্তী। ছোট্ট কালো পাতলা গড়ন, গোঁপের রেখা দেখা দিয়াছে—বয়স প্রায় কুড়ি. মুখে সব সময় গান। নানা গানের মধ্যে "নয়নে নয়ন রাখিয়া" গানের এই কলিটি যখন তখন যাহার তাহার সম্মুখে নানা ভঙ্গিতে মিষ্ট গলায় গাহিত। তাহার গানের জন্য আমরা

তাহাকে "নয়নে নয়ন রাখে ওয়ালা" বলিয়া ডাকিতাম। আর একবার ডাকিলেই হইল—আসিয়া প্রাণ খুলিয়া গান গাহিয়া যাইত। ব্যারাকঘরের যেখানেই সে গান করুক না কেন—সকলেই তাঁহার গানে মুগ্ধ হইতেন। সে ছিল একাধারে বেতারবার্ত্তা পরিবেশনকারী, নেভিগেটর ও পশ্চাতের চারটি বন্দুক চালনাকারী। দুই নম্বরের বিমান চালক বোয়ো আর জগৎ বোয়োর বেতার বার্ত্তা পরিবেশনকারী, নেভিগেটর ও বন্দুকধারী।

সেদিন সকালে দুইটি বিমানে দুই সেট্ বৈমানিকরা আকাশ হইতে মাটির উপর সাজান নিশানার উপর গুলিনিক্ষেপ করার মহড়া দিবার জন্য গিয়াছে। তখনও দশটা বাজে নাই। হঠাৎ জগৎএর আর্তকণ্ঠ শোনা গেল বেতারে—"জর্জ জর্জ! তোমার কি হল?" জর্জ বা চক্রবর্ত্তীর কোনও জবাব না পাইয়া জগৎ আর বোয়ো স্কোয়াড্রনকে বারে বারে জানাইতে লাগিল জর্জের বিমান নিশানার উপর পড়িয়াছে এবং তাহাতে আগুন ধরিয়াছে।

নিশানাটি বৈরাগড় হইতে ২৫ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। পৌঁছিবার একমাত্র উপায় জীপগাড়িতে বা ঘোড়ায়। ঘোড়াতে গেলে আহতদের আনার কোনও উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ জীপ লইয়া আমরা তিনজন—স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী, ডাক্তার ফ্লাইট-লেফ্‌টেন্যান্ট দাস তাঁহার ঔষধপত্র লইয়া আর আমি রওনা হইলাম। পিছনে ডাক্তার দাসের বিরাট এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীও চলিল যদি কাহাকেও উদ্ধার করা যায়। পাহাড় জঙ্গল খাল পার হইয়া যখন অকুস্থলে পৌঁছিলাম তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বিমান তখনও পেট্রল আর তৈলের আগুনে জ্বলিতেছে। সঙ্গে অগ্নিনির্ব্বাপক বোতল ছিল কয়েকটা, সবগুলিই নিঃশেষ করিয়া জলন্ত বিমানের উপর ঢালা গেল, তাতে অগ্নির উপশম একটুও হইল না, খুব চেষ্টা করিয়াও বিমান হইতে পঞ্চাশ হাত দূরত্বের বাহিরেই থাকিতে হইল—অগ্নির উত্তাপ এত প্রচণ্ড ছিল। বিমানের ডানার অ্যালুমিনিয়াম ধাতু গলিয়া গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অবস্থা দেখিয়া সকলেই বৈমানিকদের আশা ছাড়িয়া দিলাম। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ও ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট দাস জীপে ফিরিয়া আসিলেন। ততক্ষণে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমি এই আশায় থাকিয়া গেলাম যদি চক্রবর্ত্তী বা জর্জকে অগ্নিকাণ্ডের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারি, কিন্তু মুখে বলিলাম, রাত্রে হিংস্র পশুরা যাহাতে বৈমানিকদের দেহ নষ্ট না করে তাহার জন্য কাহারও থাকার প্রয়োজন। শেষরাত্রের দিকে কোনওরূপে ককপিটের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল। ডানার এ্যালুমিনিয়াম ধাতু তখনও কোন কোন জায়গায় গলিত অবস্থায় ছিল। ককপিট্ কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয় নাই। দুইজনেরই শুধু পোষাক স্থানে স্থানে জ্বলিয়া গিয়াছে। দেহের এক এক জায়গায় পুড়িয়া যাওয়ার চিহ্নও বর্ত্তমান। দুইজনেরই মস্তকে হেলমেট রহিয়াছে। এম্বুলেন্স লইয়া আসিয়া সন্তর্পণে শোয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম, পারা গেল না। মুখে কিন্তু দুইজনেরই তখন হাসি যেন লাগিয়াছিল।

পরদিন ভোর হইতেই পুনরায় স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ও ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দশটা নাগাদ বৈরাগড়ে পৌঁছান গেল।

এবার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের পালা। কারণ অনুসন্ধান ও রিপোর্ট দাখিল না করা পর্যন্ত এ ধরণের কোন গল্পই শেষ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শুধু লিখিত রিপোর্টে বলা হইল না যে দুই নম্বর বিমানের বাম ডানার কোণার উপরিভাগে এল্যুমিনিয়াম ধাতু ঘসিয়া যাওয়ার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে কি বোরো তাঁহার বিমান দ্বারা জর্জের বিমানের দক্ষিণ ডানার নীচে ধাক্কা দিয়াছিলেন? অর্থাৎ বোরো একত্রে উড়িবার সময় কি অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন? সঠিক সংবাদ বোরো বা জগৎ না বলা পর্যন্ত গোপন রহিল। যাহারা যাওয়ার তাহারা চলিয়া গিয়াছে; বোরো আর জগৎকে সেইজন্য আর জোর করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। জগৎ এখনও বিমানবাহিনীতে রহিয়াছে, কিন্তু উড়িবার কাজে নয়, অর্ঘের হিসাব নিকাশে; আর বোরো পাকিস্তান হওয়ার পর, পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে প্রথম যোগ দেয়, কিন্তু সে সেখানে বেশী দিন রহিতে পারে নাই. উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাশ্মীর সীমান্তে ক্ষুদ্র এক নবাবের পুত্র সে, সেইখানেই চলিয়া গিয়াছে।

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট অফ কাল্‌চার—৬২, কুইন্‌স গার্ডন, ডব্লু ১

২১ অক্টোবর, ১৯৫৫—সন্ধ্যা ৮-১৫

আমরা দুজনে—অ্যালান কোহেন আর আমি—অনেক আগের থেকে যাত্রা করলাম কুইন্‌স গার্ডনে ঠিক সময়ে পৌঁছবার জন্য ; কারণ অ্যালানকে লণ্ডনের হদিস সম্বন্ধে সবজান্তা মনে করলেও কুইন্‌স গার্ডনের পাত্তা কোথায় সেটা তার জানা ছিলনা। ট্যাক্সি নিয়েও সুবিধা হয়না কারণ ট্যাক্সিওয়ালাকে রাস্তা বাৎলে দিতে হয়। যখন টিউব-ট্রেনে গিয়ে উঠলাম তখন কন্‌কনে ঝড়বাতাস দিয়ে রীতিমত বর্ষণ শুরু হয়েছে। সামনের পার্কের গাছগুলো থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি পাতা ঝরে পড়ছে। সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কুড়ি মিনিট ধরে রাস্তা খোঁজাখুঁজি করলাম ; সেখানে 'কুইন'ও নেই আর 'গার্ডন'ও নেই ! কেবল সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজে আমি কাঁপছি, কিন্তু অ্যালান শক্ত হয়ে আছে। অবশেষে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল ; সেখানকার সেক্রেটারি দেখে আশ্চর্য হলো যে এমন দুর্যোগের সময়েও বক্তা এসে হাজির হয়েছে সময়ের ১৫ মিনিট আগে !

সে আমাকে এক গরম ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালে। খানিকক্ষণ পরে শ্রোতারা আসতে লাগল, তার মধ্যে মিষ্টার রিক্‌টারের মতো সাহিত্যিক এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের একজন ভক্ত এবং তার লেখার সহৃদয় পাঠিকা মিস্ কুইগ্‌লি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

আমি এই বলে শুরু করলাম যে এই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট অফ কাল্‌চারের এবং শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য হলো একই। তিনিও চেয়েছিলেন যাতে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়, যা দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হতে পারে কেবল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের দ্বারা—অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা নয়।

প্রসঙ্গত অক্সফোর্ড আলোচনাচক্রের ব্যর্থতার কথাও বললাম এবং রাসেল ও মুরের মূলগত ভাবধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। আরো বললাম যে বাঁধাধরা কোনো ধর্মপন্থা মানুষকে তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেনা। মনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার জন্য প্রয়াসের দরকার। ভাষণের শেষে ডক্টর কেনেথ ওয়াকার ও মিষ্টার রিকটার নির্বন্ধ সহকারে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। মিস্ কুইগ্‌লিও খুব খুশি হলেন।

ঐ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেল। আমাদের ধারণা ছিল যে লণ্ডন শহরে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হবেনা। কিন্তু সেক্রেটারি কোন ক'রে কোনো ট্যাকসি পেলেন না, ঝড়ে বৃষ্টিতে অত রাত্রে ট্যাকসি মিলবেনা। ভয় হলো যে অ্যানালিতে যাবার শেষ বাসও বোধ হয় ছেড়ে গেছে। সেক্রেটারি মিস্ বেস্‌উইক দুর্যোগের সম্বন্ধে কিন্তু কিন্তু করছিলেন, কিন্তু আমি বললাম তা হোক আমরা ঠিক চলে যাবো। তিনি বলে দিলেন প্যাডিংটন ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে।

আমরা বেরিয়ে এসে দেখি লণ্ডন শহর যেন জনশূন্য নরভূমি; রাস্তায় কোনো লোক চলছেনা, বৈদ্যুতিক আলোগুলো যেন ভৌতিক আলোকপাতের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে অন্ধকার পথের উপর, মাঝে মাঝে মোটর গাড়ি ও মোটর সাইকেল তার উপর দিয়ে তীব্র রশ্মি ফেলে ছুটে যাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে একজন মোটর সাইক্লিষ্টকে ধরে জেনে নিলাম যে প্যাডিংটন ষ্টেশন কোন দিকে। তারপর একটা ট্যাকসি পেয়ে কুইন্‌স গেট পর্যন্ত গেলাম, যদি সেখান থেকে অ্যানালি পর্যন্ত যাবার শেষ বাস্‌টা ধরে ফেলতে পারি। শেষ বাস্ যদিও পেলাম কিন্তু তা আমার অ্যানালি পর্যন্ত যাবেনা, মাঝপথে ট্র্যাথাম কোর্টে থামবে আর সে সেখানেই থাকবে। অগত্যা অ্যালানকে ছেড়ে দিয়ে তাতেই উঠলাম।

আমি অ্যানালি পর্যন্ত যাবো শুনে বাসের কণ্ডাক্টর খুব অবাক হয়ে গেল। ৬০ বছর বয়সে একজন মানুষ এই দারুণ বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে কেমন করে রাত ১১॥ টার সময় অতখানি রাস্তা হেঁটে যাবে? আমি তার উদ্বেগ দূর ক'রে দিয়ে বললাম যে দরকার হলে আমি বরাবর অ্যানালি পর্যন্তই হেঁটে যেতে পারি। কিন্তু ট্র্যাথামে নেবে কাছেই পেলাম ক্ল্যাপহাম ষ্টেশন, সেখানে গিয়ে পেয়ে গেলাম প্রায় ১১॥টার শেষ ট্রেন, সেই ট্রেনে উঠে ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসে পৌঁছলাম মধ্য রাত্রে। সেখান থেকে অ্যানার্লি বেশি দূর নয়, হেঁটেই গেলাম।

পরের দিন অ্যালান জানালে যে তার শরীর খারাপ হয়েছে—তার যথেষ্টই কারণ ছিল। সে কাজে যেতে পারলে না। কিন্তু ভগবৎ কৃপাতে আমার কিছু শরীর খারাপ হয়নি, অতটা ঝড় জলে ভিজেও আমি তার পরদিনের ধার্য মতো সমস্ত কাজই করতে পারলাম।

উপরোক্ত ইনষ্টিট্যুটের সেক্রেটারি মিস্ বেস্‌উইক এই চিঠি পাঠালেন—

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ কালচার
৬২ কুইন্‌স গার্ডন, ডব্লু ১
২৮-১০-১৯৫৫

প্রিয় শ্রীপুরাণী

এখানে আপনার ভাষণ দেবার পরে এক সপ্তাহ কেটে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যহই প্রায়ই আপনার উক্তিগুলি আমি স্মরণ করি। আমরা সকলেই তা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি ও উপকার পেয়েছি।

একটা জিনিস আমাকে খুবই বিহ্বল করেছে, আমরা এখানকার আবহাওয়ার তীব্রতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুযোগ ক'রে থাকি, আর সেদিন শুক্রবারের রাত্রিটা ছিল দারুণ দুর্যোগের ; আপনার সেদিনকার ভাষণের মধ্যে প্রকৃতির কথা বলেছিলেন, তার পরেই আপনি নির্বিবাদে সেই রাত্রির প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কন্‌কনে ঠাণ্ডা মেনে নিয়ে এখান থেকে রওনা হলেন। এটা "প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মেলার" এবং প্রকৃতির সকল খেয়ালকে সয়ে যাবার চমৎকার এক দৃষ্টান্ত যথার্থই দেখিয়ে দিলেন—যদিও তা খুবই কষ্টকর!

সুতরাং আপনার ভাষণের জন্য ও তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেবার জন্য আমি এবং আমাদের শাখার সকলের তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বিনীত

ইথেল বেস্‌উইক
(সেক্রেটারি)

সেদিন যিনি সভাপতির আসনে ছিলেন সেই মিস্ কুইগ্‌লি এই চিঠি পাঠালেন

এলেনকোর্ট, লিম্পস্‌ফীল্ড
সারে

প্রিয় শ্রীপুরাণী, ২৫, ১০, ৫৫

শ্রীঅরবিন্দের "Message to philosophy" পড়ে এবং সেদিন সন্ধ্যায় ইনষ্টিট্যুট ও কাল্‌চারে আপনার ভাষণ শুনে আমি খুবই আনন্দিত। এ আমার পক্ষে এক নতুন ব্যাপার, পাঁচ বছর আগে শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়তে শুরু করি, তারপরে এই সুযোগ পেলাম তাঁর মহাতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়ে শোনবার। সভাপতির আসনে বসা আমার পক্ষে সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমি দেখলাম যে কেবল বই পড়ে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন জেনেছি ও বুঝেছি তার সঙ্গে তাঁর নিজের একজন শিষ্যের বলা ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল হয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের যা দর্শনতত্ত্ব তাই হলো মানুষের নানাবিধ সমস্যাগুলির নিরাকরণের পক্ষে একমাত্র যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত ও আধ্যাত্মিক উপায়... বিনীতা

ই, পলিন কুইগ্‌লি

ডারহাম অক্টোবর ৩০ থেকে নভেম্বর ৪ঠা ১৯৫৫

লণ্ডন কিংস ক্রস ষ্টেশন থেকে ডারহামে গেলাম, পৌঁছতে লাগল ১২-১৫ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

ট্রেন লেট ছিল, আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ৭টায়। প্রফেসার অরবিন্দ বসু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ; আমরা উঠলাম গিয়ে তাঁর সদ্য কেনা Lydstep নামক বাড়িতে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে। পাহাড়ের উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত সেই স্থানটিতে একটি

দুর্গ আছে—সেখানে প্রধানের থাকবার স্থান, তার ভূগর্ভস্থ কুঠরিগুলি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সবস্তুই অবিকল ভারতের রাজপুতানার দুর্গগুলির মতো। ওয়ারউইক কাস্‌ল দেখলাম, তাও সেই রকমই, খাড়া নদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে, দুর্গের দেয়াল স্থানে স্থানে পাঁচ সাত ফুট পর্যন্ত চওড়া।

ওখানে থাকতে দেখা হলো ওরিয়েন্টাল ফ্যাকালটির ওয়ার্ডেন স্যর জেন্‌স্ ডাফের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে ভারতে সাক্ষাৎ হয়েছিল ইউনিভার্সিটি কমিশনের একজন সদস্য রূপে। আর দেখা হলো ইংরেজী সাহিত্যের প্রফেসর ডক্টর ক্রিফোর্ডের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে ইংরেজী কাব্য নিয়ে অনেক কথা হলো, তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কাব্য প্রসঙ্গও ছিল। আমি তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের লেখা কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ (On Quantitative Metre) এক কপি দিলাম।

আরো সাক্ষাৎ হলো হ্যাট্‌ফিল্ড কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রফেসর নিষ্টার র‍্যাওল্‌ফ কোয়ার্কের সঙ্গে এবং ঐ কলেজের ব্যায়াম বিভাগের নিষ্টার ডি, ই, ওয়েষ্টারের সঙ্গে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমরা সম্পূর্ণ একমত হলাম যে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানাদি বাদ দিয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন দরকার, এবং মানুষের চেতনাকে উন্নত করে তোলা দরকার। গির্জা প্রভৃতিতে শুষ্ক এবং একঘেয়ে উপদেশবাণী শুনে শুনে মানুষের অরুচি ধরে গেছে। এটা প্রকৃতই সত্য কথা যে ইউরোপে শতকরা অনেক মানুষই যারা ধর্মানুষ্ঠানাদি ছেড়ে দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের নিজের উন্নতি করতে সচেষ্ট।

আরো সাক্ষাৎ হলো সঙ্গীতের প্রফেসর নিষ্টার আর্থর ইউচিনসনের সঙ্গে, তিনি এক সময় পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক রেকর্ড নিয়ে গেছেন ডারহামে।

৪ঠা নভেম্বর তারিখে নিউকাস্‌ল-অন-টাউনে ছিল রামগোপালের নৃত্যানুষ্ঠান, ডারহাম থেকে বেশি দূর নয়। নিউকাস্‌লে কয়েকজন ভারতীয়ও থাকেন। নৃত্যানুষ্ঠান, যদিও অসাধারণ ছিল না, কিন্তু ইংরেজ দর্শকদের পক্ষে তা উপযুক্তই হয়েছিল। নিউকাস্‌ল থেকে রাত্রে ট্রেন ধরে আমি তার পরদিন সকালে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলাম।

৭ নভেম্বর, ১৯৫৫ হ্যাম্পটন-ইন-আরডেন গমন

লণ্ডন থেকে কাল ৯টায় যাত্রা করে কোভেন্‌ট্রিতে পৌঁছলাম ১১টায়। আমার বন্ধু মিসেস পিন্টোর (বোনা) দুই ভাই উইলি এবং জন লাভগ্রোভ এসেছিল ষ্টেশনে, কিন্তু পরস্পরে পরস্পরকে ধরতে পারলাম না। আমি পুল পার হয়ে ট্যাক্‌সি ভাড়া করতে গিয়ে শুনলাম যে হ্যাম্পটন-ইন-আরডেনে যাবার একটি ট্রেন শীঘ্রই এসে পড়বে। আবার আমি পুল দিয়ে ফিরে চললাম, তখন বৃষ্টি পড়ছে। পুলেই উইলি আর জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আমরা তখন সকলে মিলে মোটরে চড়ে গেলাম তাদের ভগ্নীপতি নিষ্টার জেন্‌স্ উডের বাড়িতে। কোভেন্‌ট্রি শহরটি জার্মানদের বোমার আক্রমণে প্রায় ভূমিসাৎ হয়ে

গিয়েছিল। এখন নতুনতরো ভাবে আবার গড়ে উঠেছে। হ্যাম্পটন ইন-আরডেন জায়গাটি চমৎকার, ইংলণ্ডের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত। উইলির সঙ্গে বার্মিংহাম থিয়েটারে গিয়ে আমি একটি নাট্যাভিনয় দেখলাম, তার পর উড পরিবারের সঙ্গে তাদের আগুন পোয়াবার "হার্থের" চারদিকে ঘিরে বসে বহুক্ষণ কথাবার্তা হলো। 'হার্থ" এবং 'হোম' যে একই কথা তা স্পষ্টই অনুভব করলাম : ইংলণ্ডের দারুণ শীতে এই হার্থের পাশেই গৃহস্থের পরিবারবর্গ একত্রে মিলিত হয়।

৮ই নভেম্বর ১৯৫৩

আমরা ওয়ারউইক কাস্‌ল দেখলাম। পথে দেখলাম কেনিলওয়র্থ কাস্‌লের ভগ্নাবশেষ। শোনা যায় যে ভারতে মহীশূর রাজ্যে এই কাস্‌লের অনুকরণে একটি দুর্গ তৈরি হয়েছিল, সেটি এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। পথে আমরা লীচফিল্ড ক্যাথিড্রাল দেখলাম, যেটি ক্রমওয়েলের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু ক্যাথলিকেরা আবার তারই ভিত্তিতে নতুন ক'রে গড়েছে। পিতলের উপর কারুকার্য সেখানে অতি মনোরম। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সমাধি রয়েছে সেখানে।

নোটিশে লেখা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাড়ে নটার সময় ওয়ারউইক কাস্‌লে প্রবেশের টিকিট নেবার দরজা খুলল। দর্শনার্থীদের সঙ্গে একজন গাইড চলল। প্রাচীনকালের বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যদের সাজোয়া, রাজাদের দেওয়া উপহার, প্রাচীন তৈজসপত্র রয়েছে সেখানে। একটা প্রকাণ্ড আকারের পাত্র রয়েছে যাতে একসঙ্গে কয়েক শত মানুষের জন্যে রান্না করা যায়। রাণী অ্যান্ যে সকল উপহার দিয়েছিলেন আর্ল অফ ওয়ারউইককে, তা একটি স্বতন্ত্র ঘরে রাখা আছে। আর সেখানে ছোটো বড়ো নানা আকারের অয়েল-পেন্টিং রক্ষিত আছে।

আর একটি ভূতের ঘরও আছে। মধ্যযুগের ইংলণ্ডে বড়ো বড়ো রাজবংশে ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ক্ষমতার লোভে খুন হতো, যেমন ভারতেও হয়েছে। ওয়ারউইক বংশের তেমনি কোনো রাজপুত্র খুন হয়েছিল, তারই আত্মা নাকি ভূত হয়ে ঐ ঘরে অবস্থান করছে। ইংরেজরা যদিও সাধারণত ভূত বিশ্বাস করেনা, কিন্তু যন্ত্র সংস্কারবশত এই কথাটা তারা বিশ্বাস ক'রে আসছে। আমি কিন্তু দেখলাম একজন তরুণী সেই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো, তার পিছু পিছু এলো তার স্বামী।

এই সব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে বজায় রাখা খুবই ব্যয়সাধ্য ; তাই একে বাইরের দর্শকদের জন্য মিউজিয়মের মতো ক'রে রাখা হয়েছে।

১২ই নভেম্বর, ১৯৫৩

লণ্ডনে ছিলাম। এই দিন পিটারের (Crampton-Chalk) স্মৃতি নিয়ে ডোরিসের সঙ্গে গেলাম গোল্ডার্স গ্রীণের সমাধিস্থলে। ডোরিস বললে যে শবদেহ দাহন করতেই সে

চেয়েছিল। কেন্‌সিংটন থেকে সমাধিস্থল অনেকটা পথ, সারাটা পথ ডোরিসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেলাম, কর্মযোগ সম্বন্ধে সাধকের মনোভাব কেমন হবে তাই নিয়ে। কর্ম ক'রে যাওয়া মানেই কর্মযোগ নয়। কর্মযোগের প্রণালী গীতাতে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে।

গোল্ডার্স গ্রীণে কিছু ফুল কিনে নিলাম। ওখানকার দাহ করার ব্যবস্থা খুব সুন্দর, খুব জোরালো ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয় পিছনের সবুজ ঘাসে, যাতে মৃতব্যক্তির স্মৃতি "সবুজ" থাকে। আমরা তার নামে সেখানে ফুল ছড়িয়ে দিলাম; তার স্মৃতিতে ও তার উপস্থিতি বোধে আমাদের অন্তঃকরণ ভরে গেল। আমি নীরবে তাকে উদ্দেশ করে বললাম: "তোমার জীবনের অতি প্রিয় কাজটি আমরা সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছি; আমরা জানি যে তুমি সক্ষ্মভাবে তাতে সাহায্য করছ। মায়ের আশ্রয়ে থেকে তোমার ভবিষ্যৎ যে নিরঙ্কুশ এ আমি নিশ্চয় জানি। সত্যের আলো আমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছিল, সেই আলোকে জীবনের মাঝে প্রকট করতে আমরা দুজনেই অভিনুচিত্ত। ইংলণ্ডে যে কাজ করা হচ্ছে তাতে তুমি খুশিই হবে, সত্যের পথে তোমার অগ্রগতি অবিচল হোক।"

হৃদয়ে একটা ভাবাবেগ নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

১লা ও ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৫

রামকৃষ্ণ মিশনে গমন, ৬৮ ডিউক্‌স্ এভিনিউ, মাসোয়েল হিল, লণ্ডন।

বিকেলের দিকে অ্যালানের সঙ্গে মিশনে গেলাম, মাসোয়েল হিলের রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খেয়ে। সেখানে সাক্ষাৎ হলো স্বামী ঘনানন্দের সঙ্গে, ইনি মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। একজন সুন্দরভাবে কামানো ইংরেজ যুবক তাঁর সেক্রেটারি। একজন শিষ্য আমাকে নিয়ে গেল একটি বড়ো ঘরে, সেখানে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ ফটোগ্রাফ। শান্ত একটি আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সেখানে বিরাজ করছে। স্বামী ঘনানন্দ বললেন যে ২রা ডিসেম্বর কিং জেনস্ হলে গিয়ে তাঁর দলের লোকেদের কাছে আমাকে কিছু বলতে হবে। সেদিন আমার কোনো এনগেজমেন্ট ছিল না, ৩রা ডিসেম্বর আমি লণ্ডন পরিত্যাগ করব ঠিক ছিল, কাজেই তাঁর কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সেই সভাতে আমার পরিচয় দান করতে গিয়ে স্বামিজী শ্রীঅরবিন্দের জীবন সম্বন্ধে অনেক সব মারাত্মক রকমের ভুল কথা বললেন। কাজেই বাধ্য হয়ে আমায় ভুলগুলি সংশোধন করে দিতে হলো, তারপরে আমি বললাম "শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতা ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে। গীতার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কি তফাৎ তা বললাম—আর বললাম যে জীবনযুদ্ধের মধ্যে গীতার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল এবং "কর্মের" ভিতর দিয়ে যোগ করার সম্বন্ধে গীতার বিশেষত্বের কথা। গীতার যা আধ্যাত্মিক শিক্ষা তা জগৎ ত্যাগ করার শিক্ষা নয়, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাধারণ ক্রিয়াগুলির ভিতর দিয়ে ভগবৎ ইচ্ছা কি ভাবে কাজ করে তাই ওতে দেখানো হয়েছে।

পেরিয়ালবার

পেরিয়া আলবার বা বিষ্ণুচিত্তর শ্রীভেল্লিপুত্তুরে সৎ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি স্বভাবত ধর্মপ্রবণ তিনি স্থানীয় মন্দিরে পুষ্পার্ঘ পাঠাতেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মাদুরায় পাণ্ড্যরাজ বল্লভদেবের সভায় যান তিনি—সেখানে রাজসভায় বেদান্তব্যাখ্যা শুনিয়ে পণ্ডিতমহলে 'পট্টরপিরাণ' বা ব্রাহ্মণোত্তম উপাধি পান। প্রত্যাবর্তনের সময়ে পথে বিষ্ণুপ্রেমে অধীর আকুল হয়ে যে স্তবগান শুরু করেন তারই নাম "তিরুপ্পলাণ্ডু"। শ্রীভেল্লিপুত্তুরে তিনি কৃষ্ণের লীলা 'তিরুমোলি' রচনা করেন।

সর্বশক্তিমান, পূজা পূজা নিবেদন করব তোমাকে,
নীলকান্ত দ্যুতি তোমার
তুমিই বল্লভের পরাভূত করেছিলে।
তোমার চরণশ্রীর মহিমা অপার—
তা পার হয়ে যায় বহু বৎসর,
বহু সহস্র বৎসর, কোটি কোটি বৎসর, অনাদি অনন্ত কাল।

জয় জয়! তুমি আর তোমার দাসদের মধ্যে
কোনো ভেদ না আসতে পারে।
জয় জয় শ্রী, দক্ষিণে উপবিষ্ট তোমার অঙ্গভাস তিনি।
জয় জয়! তোমার অনল দক্ষিণ করে চক্র।
জয়জয়, পাঞ্চজন্য যুদ্ধারম্ভের নিনাদ দিয়েছে।

হাতে নাও এই বিভূতিরাগ নাও এই পঙ্করাগ
চাও যদি আনন্দের উৎস রক্ষা করতে:
কিন্তু তাহ'লে কোনো সংসারীকে আমাদের দলে নেব না।
সাতপুরুষে অবিচ্ছিন্ন আমরা গেয়েছি,
'লঙ্কার রাক্ষসচমূ যিনি বিনাশ করেছিলেন তাঁর জয় জয়।'

কুশানে১ পৌঁছাবার আগে
আসবে যারা এসে পড় আমাদের সঙ্গে,
ভাঙো এই সব বাধা।
ভিড়ে যাও নারায়ণের নামগান করছে যারা তাদের দলে,
তাড়াতাড়ি এস,
নগর জনপদ তোমাদের গানে মুখরিত হবে এখনি।

ইরুদিকেশন২ একদা রাক্ষস-অসুরদের ঘিরে ফেলে
বধ করেছিলেন,
তোমরা তাঁরই দাস যারা এস,
অতীত বিসর্জন দিয়ে এসে তাঁর চরণসেবা কর
কীর্তন কর তাঁর সহস্র নাম।

পিতা-পিতামহের সাতপুরুষ ধরে
আমরা ব্রত পালন করে চলেছি—
দুর্জনের কুদৃষ্টি যেন ব্যাহত হয়
তাই আমরা ডাকছি হরিকে,
তিনি যে তিরুবোনমের শুভ সায়াহ্নে
রাক্ষস৩ নিপাত করেছিলেন।
আমাদের প্রতীক অরুণাভ চক্র
অগ্নিশিখার চেয়েও তা প্রদীপ্ত,
আমাদের সকলে চক্রধারীর নামগান আর সেবা করবে—
তিনিই তো নিদারুণ যুদ্ধে
সহস্র বাহুর আঘাতে বাননের রক্তে গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন।

ফণীর ঘোর শত্রু যাঁকে বহন করে ধ্বজার মতো,
আমার জীবনও নির্মল করে দেন তিনি
তাঁকেই স্বাগত জানাই।
মধুর ছিল অন্ন মধুর ঘি,
হাতে তাম্বুল,

১ শ্মশানে ২ ঋষিকেশ ৩ হিরণ্যকশিপু

পূজা-অর্চনার অফুরন্ত আয়োজন
সে-অঙ্গের উপযুক্ত কণ্ঠহার কুণ্ডল চন্দন।

তুমি যে-স্বর্ণবাস ফেলে দাও তা-ই আমরা পরিধান করি,
তোমারই পাত্রের প্রসাদী অন্ন খাই,
তোমার তুলসী আমাদের মুকুট,
তোমার দেওয়া ব্রত এই উদ্‌যাপন করলাম,
এখন স্বাগত জানাই তোমাকে এই তিরুবোনমের উৎসবে—
তুমি যে শায়িত বাসুকীর পিঠে।

দেবতা, নিজেদের বলেছিলাম তোমার দাস
আর তুমি দিয়েছিলে আমাদের মুক্তি আর সমৃদ্ধি;
তুমি যে সেই শুভলগ্নে মথুরায় ধনুর্ভঙ্গ করেছিলে
উঠে দাঁড়িয়েছিলে বিষধরের[১] মাথায়,
তোমাকেই এখন ডাকি।

কোট্‌চিয়ূরের গরবী সেলভার[২] মতো,
তিরুমাল, আমি নিষ্কলঙ্ক
তোমার চিরপুরাতন ভৃত্য,
পবিত্রতায় বহুশ্রী যে তুমি
তোমাকে সানন্দে আবাহন করি।

যারা বিষ্ণুচিত্তর[৩]-দের এই স্তব আবৃত্তি করে,
(স্বর্গের শার্ঙ্গপাণি) দেবতার গুণকীর্তন করে,
নিরন্তর ডাকে 'নমো নারায়ণ'—
তারা জানে এ-বছর ভগবানকে ঘিরেই তাদের সৌভাগ্য।

১ কালীয় ২ তিরুকোট্টিয়ূরের ভক্ত রাজা ৩ পেরিয়ালবার

ধুলায় তার অঙ্গ লুটোপুটি,
ললাটে দোলে টিকলি,
কটিতে ঝুনঝুন মেখলা।
চাঁদভাই, দেখ আমার বালগোবিন্দের খেলা
কপালে এক জোড়া চোখ তো আছে তোমার,
তারপর যেও।

দুলাল আমার সুধা আমার যাদু আমার
ওই কচি হাতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমায়।
চাঁদভাই, এই কৃষ্ণকায় দামালের সঙ্গে খেলতে চাও যদি
তাহলে মেঘের আড়ালে আর গা-ঢাকা দিও না—
এসে আনন্দে মেতে যাও।

সর্বাঙ্গ যদি তোমার হত নিষ্কলঙ্ক
তোমার আবর্তনের ছটায়
তবু তবুও আমার যাদুর মুখখানির কাছেও তুমি না!
চাঁদভাইটি শীঘ্র এস,
অনুপম তেজস্ক্রিয়বাসীর হাতছানিতে হাত ব্যথা হবার আগেই এস।

আমার অঙ্কে থেকে সে-ই তোমাকে হাতছানি দিচ্ছে—
হাতে তার চক্র, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।
চাঁদভাই, যদি বুঝে থাক কী তোমার করা উচিত
তবে বৃথা তাকে রাগিও না
যদি অপুত্রক না হয়ে থাক
তবে নেমে এস।

বালভাষে সে তোমাকে ডাকছে,
আধ-আধ কথা তার শ্রীমুখের সুধায় মধুর।
চাঁদভাই, বিশ্ববন্ধু যে এত ডাকছে,
যার নামটি শ্রীধর তার কথা যদি না শোন
তবে মরণই তোমার শ্রেয়।

যার মহাভুজে আকৃষ্ট গদা-চক্র-শার্ঙ্গ
সে তন্দ্রাবশে হাই তুলছে—
এখন না ঘুমালে পেটের দুধ তার উঠে আসবে।
চাঁদভাই, আকাশে ভেসে বেড়াও তুমি,
এবার নেমে এস তাড়াতাড়ি।

বালক বলে একে তাচ্ছিল্য ক'র না—
বটের পাতা একদিন ইনিই শয্যা করেছিলেন—
স্বগুণ ধরলে উঠে লাফিয়ে ধরবেন তোমাকে,
চাঁদভাই, আমার দেবতাকে হেলা কর না—
আনন্দে ছুটে এস।

আমার সিংহশাবককে ছোট বলে তুচ্ছ ক'র না ;
বালীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর এর দাপট,
মহাবাল নিজে তোমাকে আসতে ডাকছেন।
চাঁদভাই, যদি বুঝে থাক তাঁকে অবজ্ঞা করা তোমার অপরাধ
তাহলেও তাঁর দাস হবার যোগ্যতা তোমার যায় না।

দেবতা আমার তোমাকে কেমন ডাকছে দেখ,
পাত্র থেকে তুলে দিতে তার মুখ ভরতি।
একটুও সন্দেহ নেই চক্র দিয়ে সে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করবে—
অতএব বাঁচতে চাও তো
ছুটতে ছুটতে আনন্দে নেমে এস।

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

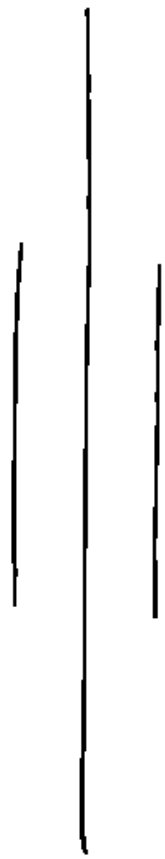

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

Sarat Chatterjee & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

!! নূতন প্রকাশিত !!

শ্রীননিনীকান্ত গুপ্তের

কবিধর্মনীধী (দুই খণ্ড)

বেদমন্ত্র

উপনিষদ-কাহিনা

রবীন্দ্রনাথ

Evidently the reasoning mind finds it difficult to reach the Divine but a simple heart can enter into contact with Him almost without effort.

—The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Telegram : BIDYASEVA **22-1532-33**

With Compliments of :—

Inter Provincial Transport Co.,

57, Radhabazar Street,

CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE :
22-4972.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—*Sri Aurobindo*

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

KULJIAN-INDIA
in the service of

CHEMICAL
INDUSTRY

Kuljian's Chemical Engineering Department is equipped to take charge of complete engineering work for chemical manufacturing facilities. Kuljian can develop the selected process into a single-line flow diagram, prepare specifications for process equipment, handle the detail engineering, and undertake complete field engineering services. Project engineering is performed in conjunction with Kuljian's other engineering departments—mechanical, civil, electrical architectural, and structural services. Equipment and material procurement, construction supervision, training of owner's personnel and start-up complete the picture.

Kuljian-India serves the industry—serves the nation

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET CALCUTTA-16.

অনির্বাণের

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সমীরকান্ত গুপ্তের

মনের মন মুকুর

দাম ৩.৫০ টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীরের
জীবন থেকে অসামান্য কাহিনীমালা]

Reg. No. 13773/66

27 AUG 1988

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাতা (১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪·৫০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবিমনীষী (১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০৫
ঐ (২য়)	ঐ	৪·৫০
রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পশুপতি ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্তমান জগৎ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন	সমীরকান্ত গুপ্ত	১·০০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তম রহস্য	শ্রীমা	১·০০
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		১·৫০
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		১·৫০
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		১·৫০
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		২·৫০
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		০·৩৭

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

ক লি কা তা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮

বর্ষ—২৮ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...
সতো লেগে থাকো	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে	শ্রীঅরবিন্দ
কবি শ্রীঅরবিন্দ	সুনীলচন্দ্র সরকার
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু
ত্রিভুবনে আলবার	সনীরকান্ত গুপ্ত

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

আগামী মার্চ থেকে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তিত হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Published by: Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Edited by: Nolini Kanta Gupta
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2
Printed in India

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮

যে সব পরিবর্তন আজ আমরা দেখছি জগতে, তা হ'ল বুদ্ধিগত, সুনীতিগত আর সূক্ষ্মক্ষেত্রগত, আদর্শ হিসাবে এবং উদ্দেশ্য হিসাবে। আধ্যাত্মিক রূপান্তর তার সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে, আপাততঃ শুধু এখানে ওখানে তার ঢেউ তুলে দিয়েছে। যে পর্যন্ত তা নিজে এসে উপস্থিত না হয়েছে, সে-অবধি অন্যগুলির মর্ম্ম বুঝা যাবে না, সে-অবধি বর্ত্তমান ঘটনাবলীর অর্থ নির্ণয় আর মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব পূর্ব্ব কল্পনাই নিরর্থক—কারণ আধ্যাত্মিক গতিরই প্রকৃতি, শক্তি আর ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করবে মানবজাতির আগামী যুগচক্র।

—শ্রীঅরবিন্দ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সাবিত্রী

(৯)

[ভগবানের উত্তরে সাবিত্রীর একই কথা, একই প্রতিজ্ঞা—পার্থিব জীবনকেই দিব্য-জীবনে পরিবর্ত্তিত করবার জন্য—তাদের দুজনার আবির্ভাব।

সাবিত্রীর অচল অটল বাক্যে ভগবানের মন ক্রমে ভিজে এসেছে, মানুষী ভাবে ও ভাষায় বলতে হ'লে। অর্থাৎ তিনি দেখলেন ও দেখালেন সাবিত্রীর পূর্ণ রূপ: তাঁর পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল সাবিত্রীর স্বরূপ—ভগবানের সঙ্গে তার ঐক্য ও একত্ব।

ভগবানের তর্ক বা বাণীর লক্ষ্য হ'ল সাবিত্রীর কাছে সাবিত্রীর স্বরূপ ধরে দেওয়া—আপন ব্রত সম্বন্ধে পূর্ণচেতন হওয়া, আপন ভাগবতী ধর্ম্মকর্ম্মে পূর্ণ সজ্ঞান ও সক্রিয় হওয়া।

আর একটু হয় ত' অবশিষ্ট আছে, এই পূর্ণত্বও পূর্ণতার জন্যে, তাহ'লেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।]

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তবে উত্তর দিলে সাবত্রী:
"বৃথাই তুমি নিঃসঙ্গ আনন্দভোগের লোভ দেখাও
দুটি জীবকে যারা দুঃখপীড়িত জগৎ থেকে উদ্ধার পেয়েছে
আমার আর তার যারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত;
একই কর্ম্মের জন্য আমাদের জন্মগ্রহণ এবং জীবনধারণ—
জগৎকে ভগবানের কাছে, মৃত্যুহীন জ্যোতির মধ্যে তুলে ধরতে,
ভগবানকে নামিয়ে আনতে এই জগতে পৃথিবীর মধ্যে,
আমরা এসেছি
পার্থিব জীবনকে দিব্যজীবনে পরিবর্ত্তিত করবার জন্যে;
আমার সংকল্প অটল, জগৎকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্যে।
তোমার মোহন কণ্ঠের যাদু অবধি,
হে আনন্দ-সার ভগবান, আমাকে ধরতে পারে না, বাঁধতে পারে না।
পৃথিবীকে আমি বলি দিই নাই সুখীতর জগতের জন্যে;
শাশ্বতের বৃহৎ ভাবধারা, তার সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি
স্থান করে নিয়েছে মানুষের মধ্যে, বস্তুরাজির মধ্যে,

তাইত' বিরাট সৃষ্টিপট খুলে গেল সম্মুখে
কোথা হ'তে এল তারকানালার এই নিরর্থক উদ্যমতা,
সূর্যরাজির বিশাল নিষ্ফল পরিক্রমা ?
কালকবলিত ব্যর্থজীবনে বদ্ধ এই আত্মাকে গড়েছে কে,
হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করেছে আশা আর লক্ষ্য,
প্রকৃতিকে নিযুক্ত করেছে অতিকায় অর্থহীন প্রযত্নে,
তার কোটিযুগব্যাপী প্রয়াস-নক্সার পরিকল্পনা করেছে কে ?
কোন শক্তি জন্ম মৃত্যু আর অশ্রু দিয়ে
দণ্ডিত করেছে সচেতন জীবকে
এই যারা ধরণীর 'পরে বুকে হেঁটে চলে।
পৃথিবী যদি চেয়ে দেখে উর্দ্ধে স্বর্গের আলো,
শোনে যদি সাদর প্রত্যুত্তর তার নিঃসঙ্গ কণ্ঠের,
তবে বৃথা নয় পরস্পরে সাক্ষাৎ তাদের, স্বর্গের স্পর্শ নয় ত' পাশবদ্ধ ?
তুমি যদি সত্য, আমি যদি সত্য, জগৎ সত্য তবে ;
তোমার কর্ম্মের পিছনে তুমি লুকিয়ে রয়েছ,
তবুও অস্তিত্ব নয় ত' কেবল স্ববিরোধী হেঁয়ালী।
ভগবান পৃথিবীকে যখন গড়েছেন, পৃথিবীকে তবে নিজের
মধ্যে ভগবানকে গড়তে হবে,
তার বুকের অন্তরালে গুপ্ত রয়েছে যা ব্যক্ত করবে তাকে সে,
তুমিই জগৎকে গড়েছ, জগতের জন্যে তাই তোমাকে চাই আমি ;
মানুষ যদি তার মানুষত্বের মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায়,
তার বেদনার সঙ্গে চিরতরে যদি সংযুক্ত থেকে যায়,
তবে মানুষকে ভেদ করে উদ্ভূত হোক মহত্তর সত্তা এক,
সেই অতিমানুষ শাশ্বতের সঙ্গে উন্নাহে আবদ্ধ যে,
মর্ত্যরূপ সব ভেদ করে উদ্ভাসিত হোক চির অমর দেবতা,
নতুবা ব্যর্থ সৃষ্টি, নাস্তি এই বিপুল জগৎ,
অস্তিরূপে যদি বা দেখা দেয় কালের মুহূর্ত্তাবলির ধারায়।
আমার দৃষ্টি কিন্তু নিষ্প্রাণ মুখোসটি দীর্ণ করে চলে গিয়েছে,
আমি অনুভব করেছি চিন্ময়সত্তা এক গোপনে সচল রয়েছে
বস্তুরাজির মধ্যে,
তারা বহন করে চলেছে ক্রমবর্দ্ধমান ভগবানের কায়া ;

চিন্ময়ের দৃষ্টি আবরক-রূপ সব ভেদ করে পৌঁছে যায়
নিরাবরণ সত্যে,
দেবতাদের সম্মুখে যবনিকাখানি ঠেলে সরিয়ে দেয়,
আপন চিরন্তনীর দিকে উঠে চলে নিরন্তর।"

মহাদেবতা তবু কিন্তু নারীর হৃদয় লক্ষ্য করে বলে চললেন,
"প্রমুক্ত বাক্ তুমি, জীবন্ত শক্তি তুমি তার,
চিন্ময় পুরুষ যা কিছু কল্পনা করেছে সব তুমি সৃষ্টি করতে পার।
তুমিই ত সেই শক্তি যাকে ধরে আমি জগৎ সৃষ্টি করেছি,
তুমিই আমার দৃষ্টি, ইচ্ছাশক্তি আমার, কণ্ঠ আমার।
কিন্তু জ্ঞানও রয়েছে তোমার, তুমিই জান ত' সৃষ্টির ব্যবস্থা—
কালক্রমের মন্থর ক্রিয়াগতি।
তোমার বহ্নিহৃদয়ের উগ্র প্রবেগে,
মানুষকে পৃথিবীকে উদ্ধার করবার আবেগে,
কালের বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে
আর বিবর্তনের ধীর অলস পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে
তুমি অজ্ঞানময় জগতের জীবকে
আলোকের অভিযানে দুঃসাহসে এগিয়ে নিয়ে যেও না—
মানুষের মধ্যে সুপ্ত দেবতাকে ঠেলে তুলে দিও না,
জেগে উঠবে সে যে অনির্বাচ্য নীরবতারাজির মধ্যে,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট সীমাহীন কোন বীথিকাশ্রেণীর মাঝে,
সসীম মনের এই সর্ব্বশেষ সীমানা পার হয়ে,
অতিচেতনার ভীতিকর সীমান্ত অতিক্রম করে,
বিপদসঙ্কুল আনন্ত্যের কবলে,
তবে তুমি যদি কালের জন্যে ভগবানের জন্যে
আর অপেক্ষা না করতে চাও
তবে আপন কাজ তুমি করে চল,
নিয়তিকে বাধ্য কর আপন ইচ্ছাশক্তির বলে।
তোমার উপর থেকে আমি তুলে নিয়েছি রাত্রির ভার,
তুলে নিয়েছি গোধূলির সংশয় আর স্বপ্ন যত,
তেমনি এই তুলে নিলাম আমার পূর্ণতর দিবসের আলো।

তবে কিন্তু এ সবই হ'ল আমার পূর্ণতম
প্রতীকময় জগতে, এখানে
সেই মহানির্ব্বাচন করা যায় না
যাতে নিয়তি নিরস্ত্রিত হয়,
উচ্চারিত হয় না পরমকণ্ঠের অনুজ্ঞা।
উঠে চল আরো বহত্তর জগতের সোপানাবলি অতিক্রম করে
সেই অসীমের মধ্যে যেখানে কোন জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না;
কিন্তু এখানে নয়, এই যে প্রসারিত আকাশ, বৃহত্তর জীবন যেখানে
তুলে ধরে তার রহস্য আর অলৌকিক ক্রিয়া,
এখানেও নয় সমুদ্ভূত মানসের জ্যোতির্ময় যত শিখরের 'পরে,
এখানেও নয় এই গহ্বরে যেখানে সূক্ষ্ম জড়ের চিৎসত্তা
লুকিয়ে রয়েছে তার গোপনতার চূর্ণ আলোকে ; এসবের মধ্যে
শোনা যায় না কখনও শাশ্বতের অটুট আদেশ,
সংযুক্ত করেছে যে নিয়তির মূর্দ্ধা আর তার পাদপীঠ।
এরা সব মধ্যবর্ত্তী সংযোগের ক্রমাবলি,
তাদের নাই সৃষ্টিক্ষম দৃষ্টি
নাই তাদের পূর্ণ সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্ম,
নয় তারা সেই সর্ব্বশেষ অবলম্বন
যার উপরে ভর করে রয়েছে বিশ্বের তারস্তূপ।
দুটি শক্তিতে ধরে আছে কালের প্রান্তদুটি :
ভবিষ্যদ্রষ্টা চিন্ময় পুরুষ আর তার চিন্তাকে
উন্মোচন করে চলে যে জড় সত্তা—
ভগবানের অনুজ্ঞা শুধু পালন করে চলে সে,
বিশ্লু বা বিসর্গ উহ্য না করে,
আজ্ঞাবাহী কর্ম্মীমাত্র, অচেতন অসম্বৃত ;
গর্ভগত বস্তুতার অবাধে উদ্‌ঘাটিত করে চলে সে,
দেশে ও কালে ভাগবতশক্তির অভিসন্ধি,
সজীব সত্তা কি নির্জীব বস্তুর অন্তরে
অভ্রান্ত সে উদ্‌যাপন করে চলে তার যথাবিহিত কর্ম্ম।
কৃতকর্ম্মের ঘৃণাক্ষরও সে মুছে ফেলে না
দিব্য আদেশ হ'তে কখনও বিচ্যুত হয় না সে,

অদৃশ্যের পদক্ষেপ পরিবর্তিত করে না।
তুমি যদি সত্যই চাও মানুষকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে,
তুলে ধরতে অধ্যাত্মের শিখরে,
তাহ'লে চেয়ে দেখ এই নিম্নের জীবনধারা,
আবিষ্কার কর ভগবানের মানুষের জগতের সত্য,
তারপর কাজ করে যাও তোমার, সব জেনে সব দেখে ;
হে জীব, উত্তীর্ণ হও গিয়ে তোমার কালাতীত আত্মায়,
নিয়তির ধারা নেমে নাও, কালের অঙ্গে এঁকে দাও
তোমার সংকল্পের চিহ্ন।''
কথা তার শেষ হল, অস্থির মূর্চ্ছনার সঙ্গে
শক্তি এক উঠে এল, কাঁপিয়ে দিল
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ লোকসব।
আর রূপাবলির শিবির যত
বাঁধন তাদের শিথিল করে দিল

সত্যে লেগে থাকো

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দিব্যজীবন সত্যের জীবন। সে জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সত্যই, স্বভাবে ও স্বরূপে—বিশুদ্ধ সত্য, অবিশ্র, অব্যভিচারী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আমরা বস্তুতঃ রয়েছি যখন আমাদের অজ্ঞান অর্দ্ধজ্ঞান চেতনা নিয়ে, একটা প্রায় সম্পূর্ণ মিথ্যাময় জগতে তখন আমাদের কি প্রয়োজন হবে না যথার্থভাবে, মিথ্যাকে স্বীকার করে নিতে সাময়িকভাবে, যাতে আমরা এই জগতে কাজ করে চলতে পারি, সফলতা লাভ করতে পারি? আমরা রয়েছি একটা আবেষ্টনের মধ্যে, একটা প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার মধ্যে, আমাদের জীবনধারা সেই পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। আমরা যদি সাক্ষাৎ মুখোমুখী তার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই তবে তা কি কার্য্যতঃ সম্ভব হবে? ব্যক্তিগতভাবে আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কণিকা মাত্র; সমগ্রের বিশাল গুরুভার আমাদের পিষে চূর্ণ করে দেবে, আমাদের প্রত্যেককে, কারো অস্তিত্ব কিছু থাকবে না। সত্যকে চাই, সত্য আমাদের লক্ষ্য, ঠিক কথা; কিন্তু সেদিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে সাবধানে সন্তর্পণে বুদ্ধিমানের মত। মিথ্যা যদি চতুর হয় তবে আমাদের হতে হবে তার চেয়েও চতুর, জগতে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যই হ'ল সাফল্য, সেখানে বলের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই ছলের ও কৌশলের স্থানও অনেকখানি। তোমার শত্রুর কথাগুলি কিছুটা মেনে নিতে হবে, তুমি যদি চাও তোমার কথা কিছু সে মানবে। এ জগতে, এই সত্য-মিথ্যার ব্যামিশ্র ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে কেবল পরস্পরের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে। একান্ত সত্যবাদী সাধুত্ব বাস্তবের কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পায় না। সেই জন্যই প্রাচীন জ্ঞানীরা তাদের সত্যকে অনাবিল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই বাস্তবের জগৎ পরিত্যাগ করেছেন, আশ্রয় নিয়েছেন অরণ্যের পর্ব্বতগুহার নিভৃত আশ্রয়ে।

সাবধান, জান কি, এ হ'ল শত্রুর কণ্ঠ, তোমাকে ভুলিয়ে নিতে চায় তোমার মনকে মোহাচ্ছন্ন করে দিয়ে। তোমার পথ সম্মুখে উঠে গিয়েছে ঋজু শীর্ণ রেখা—প্রসারিত নয়, মসৃণ নয়, ফুলশয্যায় শোভিত কোমল নয়। সত্যকে আবিষ্কার করতে হলে, সত্যের জীবনযাপন করতে হলে সত্যকে প্রথমেই ধরতে হবে তার পূর্ণ বিশুদ্ধ সত্তায়, জীবনের প্রতিপদে তাতেই লেগে থাকতে হবে। আরম্ভ যেমন, পরিণামও হবে তেমনি। আমাদের নিষ্ঠা, আমাদের শ্রদ্ধা হবে অবিমিশ্র,

আমাদের আন্তরিকতা হবে নিষ্কলঙ্ক। সত্যই নিয়ে যেতে পারে সত্যের কাছে, মিথ্যার সঙ্গে কোন সন্ধি বা আপস নিয়ে যাবে আলো মিথ্যার মধ্যে। ততো ভূয় ইব অন্ধং তমঃ।

তোমার ছল, তোমার চাতুরী, তোমার কাব্যের সফলতা নিয়ে আসতে পারে কিংবা নাও পারে; কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই তোমার অন্তরাত্মার উপর সে লেখে দেবে কালির প্রলেপ, তোমাকে আরও এক পা পিছনে ঠেলে নিয়ে যাবে তোমার অজ্ঞানের অচৈতন্যের মধ্যে। আর তুমি যদি ঐ একইভাবে চলতে থাক—তবে তুমি হয়ত' সাফল্যের চরম চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পার জগতের দৃষ্টিতে, কিন্তু তোমার অন্তরাত্মাকে আর কোথাও খুঁজে পাবে না, হয় ত' দেখবে সে ফেলে গিয়েছে কোথাও অন্ধকারের কোণে শুধু এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

যা কি বলেন নি, বিন্দুমাত্র অসত্যকে যদি তুমি ফুটে উঠতে দাও তোমার কথায় হোক, কাজে হোক, তবে পরম সত্যকে তুমি প্রকাশ হতে দেবে কি করনে? শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে রাখবে এই প্রসঙ্গে, "কল্পনাও করবে না যে সত্য ও মিথ্যা, আলো আর অন্ধকার, সমর্পণ আর স্বার্থপরতা একসঙ্গে বসবাস করবার অনুমতি পাবে ভগবানে নিবেদিত একই আধারের মধ্যে। রূপান্তর হবে অখণ্ড, অখণ্ড হওয়া চাই যা-কিছু তার প্রতিরোধী তার প্রত্যাখ্যান।" মিথ্যাকে তুমি পাশ কাটিয়ে যেতে পার না, অনুনয়-বিনয়ে তার মন ভিজাতে পার না, মন্ত্রে তাকে মোহিত করতে পার না। মিথ্যার মুখোমুখি তোমাকে দাঁড়াতে হবে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে হবে, অন্তরে নিরন্তর সত্যের অম্লান অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখে।

যদি তুমি বল তুমি ক্ষুদ্র জীবমাত্র, ক্ষুদ্রতর তোমার আলো তোমার চেতনায় নাই মহাবীরের আয়তন, তোমার আলো ডুবে যাবে, নিভে যাবে, হারিয়ে যাবে চারিদিকের বিরাট সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে। তবুও যত ক্ষুদ্রই তুমি হও, যতটুকু সামর্থ্য তোমার, যতখানি সম্ভব তোমার পক্ষে, যথাসাধ্য তাই করে যাবে। তোমার যে ক্ষুদ্র আলোকশিখা তাকে মলিন হতে দিও না, তোমার কোন বিরোধী, কোনও অনুচিত বৃত্তির স্পর্শে। থাকবে স্থির অবিকম্প, শিখাটি ধরে রাখবে উজ্জ্বল অমল। চারিদিকের অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরতে পারে, অবরোধ করতে পারে কিন্তু তাকে নির্ব্বাপিত নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। কারণ তোমার অন্তরে যা আছে তা চিরন্তন স্বয়ং ভগবানই। এই দেহ, এই অস্থি-মাংস চিরদিন যদি নাই থাকে তবুও রয়ে যাবে সেই পুণ্য-জ্যোতি। বাহিরের আধারকে হয়ত' নতিস্বীকার করতে হবে, আপনাকে মিলিয়ে দিতে হবে বাহিরের আবেষ্টনের মধ্যে—সেই আবেষ্টন এখনও তৈরী হয় নি বলে, অন্তরের চেতনা যে তৈরী হয়নি সেজন্য নয়। ফলতঃ শেষ যাত্রাকালে এই শরীর মুক্ত

করে দিয়ে যায় অন্তরের আলোটি, সে আলোই মিশে যায় পার্থিব আকাশের ক্রমবর্দ্ধমান আলোর মধ্যে। খ্রীষ্টীয় আত্মবলির এই হ'ল মূলতত্ত্ব। শহীদের রক্ত দিয়ে গীর্জা গেঁথে তোলা হয়। এই আত্মবলির সত্য, ভক্তের এই আত্মাহুতি প্রয়োজন ছিল একসময়ে যখন মানুষ যথেষ্ট উর্দ্ধে উঠতে পারেনি তার চেতনার যাত্রায়, পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল ঘনতর, অস্বচ্ছ, আরও তমোময়, বর্ত্তমানের অপেক্ষা। সেই যুগে একমাত্র প্রয়োজন ছিল অটুট অবিচল জীবন্ত বিশ্বাস, অমলিন জ্যোতি, নিষ্কম্প বহ্নিশিখা, অন্তরের এমন চেতনা ক্ষুদ্র-কায় হলেও যা দাঁড়িয়ে উঠতে পারে অপরিসীম বাধার বিরুদ্ধে। এ হ'ল একটি পথ, আত্মবলির পথ, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে। এইজন্যেই ভাগবত মানুষকে অবতারকে সে-যুগে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল।

আজ আমরা কিন্তু এসে পড়েছি আর এক যুগে, ভিন্ন অবস্থার মধ্যে, অন্ততঃ লক্ষ্য আমাদের ভিন্ন। আমরা দাঁড়িয়েছি উন্নত শির, ঋজু মেরুদণ্ড, দৃঢ় কলেবরে সকল প্রলোভনের বিরুদ্ধে সকল কলা-কৌশল অবজ্ঞা করে এই অটল বিশ্বাস, নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে যে আমাদের বিজয় হবেই, আমরা কখনও পরাহত হব না, আমাদের বিরোধী শক্তিদেরই পিছনে হটিয়ে নিয়ে চলব যতদিন তারা বিলুপ্ত হয়ে না যায়। এ হল বিজয়ের যুগ।

কারণ দুটি জিনিষ ঘটেছে—দুটি বিপুল বৈপ্লবিক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে, প্রকৃতির বিবর্ত্তনধারা-ক্রমে—দুটি অদৃশ্য ঘটনা কিন্তু যা পৃথিবীর মানবজাতির নিয়তি পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে। প্রথমতঃ মানুষী চেতনা, তার মূল প্রকৃতি, স্বভাবে ও স্বধর্ম্মে উঠে গিয়েছে চেতনার এক নূতন পর্য্যায়ে—বাহ্যতঃ সর্ব্বসাধারণভাবে নয় কিংবা সর্ব্বত্র ব্যক্তিগতভাবেও নয়, তবুও আন্তরচেতনায় মানুষ স্বীকার করেছে, একটা স্পর্শ পেয়েছে উচ্চতর বৃহত্তর স্থিতির। মানবপ্রকৃতি পরিহার করতে পেরেছে কতকটা তার প্রাচীনতর যুগসুলভ রূঢ়তা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, পরস্পরে বিচ্ছিন্নতা। মানুষী মন হয়েছে মার্জ্জিত, শাণিত, তীক্ষ্ণ, লাভ করেছে এতখানি প্রসার যে বিশ্বরশ্মির নিভৃত আলোক, উত্তর জ্যোতির আভাষ তার দৃষ্টির মধ্যে এসে গিয়েছে। মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে, স্বীকার করে নিয়েছে, যদিও কার্য্যতঃ সে অনুসরণ করতে পারে না যে পৃথিবীর উপর জীবনধারার একটা জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় মঙ্গলময় সম্ভাবনা রয়েছে। সময়ে অসময়ে এই লোকের স্পর্শ সে পেয়ে যায় এবং অভিভূতও হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে, এ হল প্রকৃতির অবদান, কোটি কোটি বৎসর ধরে সৃষ্টির উর্দ্ধাশা চলেছে যে আলোকের দিকে তার প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হ'ল আরও অদৃশ্য, আরও অগোচর, কিন্তু তার শক্তি অপরিসীম এমন কি প্রলয়ঙ্কর। তা হল একটা উর্দ্ধতম মহাশক্তির অবতরণ, প্রকাশ এবং সাক্ষাৎক্রিয়া। যারা দেখেছে এ বস্তু, তারাই জানে, কোন প্রশ্ন নাই

আদের। বহু অতীতে বৈদিক ঋষি বলে গিয়েছেন "যে অন্ধ তার জ্ঞান নেই, চক্ষুষ্মান যে সেই জানতে পারে"।

আজ, বিশেষভাবে আজকাল এই শুদ্ধচেতনার স্বল্পমাত্রও তোমাকে বিজয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারে—তোমাকে যে নশ্বতা বিনষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে, শুধু তা নয়। চতুর্দ্দিকের আকাশজোড়া বিপুল নিবিড় তমিস্রার মধ্যে অন্তরের আকাশ এক কোণে আজ জ্যোতির্ম্ময়, ত্রিগুণ জ্যোতির্ম্ময়, ত্রিগুণ শক্তিময়।—এবং তা আরো ত্রিগুণতর হয়ে চলেছে।

———

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জনৈক যুক্তিবাদী সমালোচক

শ্রীঅরবিন্দ

কোন জাতের সমালোচককে ধরে বিরুদ্ধপক্ষের মূল্যায়ন করতে চলেছি সে-সম্বন্ধে গোড়াতেই পরিষ্কার ধারণা থাকা ভালো। সামনে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর একটি গড়পড়তা বিশিষ্ট পাশ্চাত্য মনের ভাবধারা, লোকটির বেশ উচ্চ শিক্ষা এবং বিস্তর অধ্যয়ন, তবে প্রতিভা বা অসাধারণ দক্ষতা নেই, বরং সাধারণ সফল গুণপনা, মনের তেমন নমনীয়তা বা সহানুভূতি নেই তবে আছে চমকদার করে দেখাবার অভ্যাসের দরুণ নির্ভুল না হলেও বিচিত্র সংবাদকে চটকদার ও রূঢ় মতামতকে সমর্থন ও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রকাশের কৌশলটি। সাংবাদিকতা-চর্চায় কিছু কৌশল অর্জন করা গড়পড়তা ইংরেজের মন ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতপক্ষে এই রকমই। ঠিক এই জিনিসটি চাই যাতে বুঝতে পারি সেই বৈরিতার প্রকৃতি যার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রাডিয়ার্ড কিপলিং বলেছিলেন—নিজে তিনি সরেস সাংবাদিক এবং 'ফলিয়ে-তোলা-অস্বাভাবিক' গড়পড়তা মানুষ, গড়পড়তা তবে ঘষেমেজে-ধরা, তবু স্বভাব যায়না মলে,—এক ধরণের ক্রূর বর্বর প্রতিভার আবরণে—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের চিরবিরোধ। দেখা যাক এরকম মতিগতি ভারতীয় মনে ও সংস্কৃতিতে অনন্য ও কুৎসিত কী খুঁজে পেল—ব্যক্তিগত অনুভবের প্রতিক্রিয়া সরিয়ে যদি নিরাসক্তভাবে বিষয়টি দেখি তাহলে এ-অনুধাবন চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠবে।

একটা আপত্তি উঠবে প্রতিনিধিত্বের পদে এমন রাজনৈতিক ভারাক্রান্ত যুক্তিবাদী সমালোচক গ্রহণের বিরুদ্ধে, এমন মন যে বর্তমানে থেকেও অতীতেই চলে গিয়েছে। বহুকালের এবং ঐতিহাসিক এক পার্থক্যের ফলেই মহাদেশিক এই অবোধাবুঝি গড়ে উঠেছে, আলোচ্য বইখানি তার সেই একটি দিক—যা বেশ আধুনিক প্রকৃতির—তাকে তুলে ধরছে। কিন্তু আধুনিক কালেই, এই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের যুগেই, পার্থক্যটি সবচেয়ে প্রকট, অবোধাবুঝি সবচেয়ে উগ্র এবং সাংস্কৃতিক গরমিলের বোধটি সবচেয়ে সচেতন এবং নগ্নরূপে প্রকাশ হয়েছে। অনাসক্ত মানসিক কৌতূহলে ভরা প্রাচীন গ্রীক কেউ বর্বরদের তুলনায় নিজে জাতে সংস্কৃতিতে কুলীনতর এ-বোধটি সত্ত্বেও যে-কোন বিশিষ্ট আধুনিক য়ুরোপীয়ের চেয়ে বেশি ভারতীয় মনের কাছে আসতে পারত।

পিথাগোরাস কিম্বা প্লেটো-অনুবর্তী দলের কোনো দার্শনিক, আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের মতো লোকই যে শুধু এশিয়া-সংস্কৃতির মূল ভাবগুলির তাৎপর্য সহজে সমাদর করতে পারতেন তা নয়, গড়পড়তা যোগ্য ব্যক্তিও—যেমন মেগাস্থিনিস—যান্ত্রসূত্র ধরে বা নিখুঁতভাবে না হলেও বেশ বহুলাংশে দেখার ভঙ্গিতে ও বোঝার ব্যাপারে তার কদর দেখাতে জানতেন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয়টি, বিধর্মী ও অবিশ্বাসীর প্রতি তার যুদ্ধং দেহি খৃষ্টানী এবং বিরূপতা সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টি ও অনুভবের অনেক দিক দিয়ে বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে মিলে যায়—গড়পড়তা য়ুরোপীয়ের পক্ষে যা সম্ভব নয় যদি না সে তেমন নূতন ভাবধারা আত্মস্থ করে যা আবার এই মহাদেশিক বিভেদের গহ্বর কমাতে শুরু করে দিয়েছে। পাশ্চাত্য মনের যুক্তিতে শান দেওয়া, তার ধর্মীয় ভাব ও অনুভবকেও যুক্তিবদ্ধ করা এই আপাত-দুরতিক্রম্য বিভেদের মূল। আমাদের সমালোচকটি এই ক্রমবর্দ্ধমান বৈরিতার চরম নমুনা—চিন্তাবিমুখ অবাধ ভাবুকের এই ফলশ্রুতি—লোকটি এই দুরূহ সমস্যাবলি মৌলিক চিন্তায় রসিয়ে তোলেন নি, বরং এসব মতামত কুড়িয়ে পেয়েছেন নিজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এবং সমসাময়িক বুদ্ধির আবহাওয়া থেকে। বিরোধের অংশগুলি নিয়ে তিনি তিলকে তাল করবেন, তবে এই অতিশয়োক্তির দ্বারাই সেসব আরো স্বচ্ছ সুবোধ্য করে ফেলবেন। নির্ভুল তথ্য ও বুদ্ধিযুক্ত গবেষণার ঘাটতি তিনি পুষিয়ে নেবেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে বিদেশী সব জিনিসের ওপর আক্রমণে বেশ সহজাত বোধের উপর এক নির্ভরতার দ্বারা।

অভ্রান্ত সহজাতবৃত্তির প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর আক্রমণ মুখ্যত চালিয়েছেন ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মের উপর। একটা জাতির সংস্কৃতি মোটামুটি বলতে তার জীবন-চেতনার ত্রিধা প্রকাশ। এক আছে চিন্তা আদর্শ ঊর্ধ্বাশী এষণা এবং অন্তরাত্মার আকূতি; আর আছে সৃজনধর্মী আত্মপ্রকাশ এবং গুণগ্রাহী সমন্বয়, বুদ্ধি ও কল্পনা আবার আছে কার্যকরী বহিঃস্থ রূপকৃতি। একটা জাতির দর্শন ও উচ্চচিন্তায় আমরা পাই তার জীবন-চেতনা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তার মনের স্বচ্ছতম বৃহত্তম ব্যাপকতম ধারণাটি। তার ধর্ম প্রমূর্ত করে ধরেছে মহত্তম আদর্শ ও প্রবণতার পথে সার্থকতা চেয়ে উঠেছে তার যে ঊর্ধ্বমুখী ইচ্ছা ও আত্মার অভীপ্সা। শিল্পকলা কাব্য সাহিত্য খুলে ধরে তার সম্বোধি, কল্পনা, জীবনবিচিত্রা এবং সৃজনশীল বুদ্ধির সমৃদ্ধ প্রকাশ ও প্রতিফলন। সমাজ রাজনীতি তাদের রূপাধারে দেয় একটা স্থূল কাঠামো যার আশ্রয়ে বাহ্য জীবন যতটা সম্ভব ফুটিয়ে তুলতে চায় তার অগ্নিময় আদর্শ, পরিবেশের বিঘ্নের মধ্যে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বভাব। তাহলে দেখতে পাব স্থূল জীবনধারণ থেকে কতখানি উপাদান সে গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে কী করেছে, দিশারী চেতনা ও গহন আত্মার প্রতিবিম্ব হিসাবে কতখানি তাদের ফুটিয়ে তুলেছে। অন্তরালের গুপ্ত প্রতিভাকে এদের কোনোটিই

পূর্ণ প্রকাশ করেনি, তাহলেও এরা এর থেকেই টেনে বের করেছে তাদের মূল ভাবনা ও তাদের সাংস্কৃতিক প্রকৃতি। সব মিলে রচনা করেছে তার দেহ মন আত্মা। ভারতীয় সভ্যতার দর্শন ও ধর্ম—দর্শন ধর্মের দ্বারা সক্রিয় আর ধর্ম দর্শনের দ্বারা আলোকিত—নেতৃত্ব করে এসেছে, আর সব যথাসাধ্য অনুগমন করেছে—বস্তুত এই হল তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য—অন্য পরিণত এশিয়ান্ দেশের মতো। তবে এটিকে সে বহুদর্শিতা ও ব্যাপকতায় চরম করে তুলেছে। ব্রাহ্মণ সভ্যতা যে একে বলা হয় তার অর্থ এই। সত্যই ওকথার অর্থ পুরোহিত-প্রাধান্য হতে পারে না, সংস্কৃতির কোনো নিম্নাঙ্গে পুরোহিত-মন বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিলেও, কারণ সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি রচনায় প্রকৃতপক্ষে পূজারীদের কোনো হাত ছিল না তো। আসলে একথা সত্য যে মুখ্য ভাবগুলি রূপায়িত করেছেন দার্শনিক চিন্তাবীর এবং ধর্মপ্রবণ মন, তাঁদের সকলেই কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্মণ নন। একটা শ্রেণী যে গড়ে উঠেছিল যার কাজ সমস্ত জাতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, জ্ঞান ও আইনকানুন সংরক্ষণ—ব্রাহ্মণের আসল কাজ ছিল এইটিই, পুরোহিতগিরির ব্যবসা নয়—তারা যে একচেটিয়া না করে হাজার হাজার বছর ধরে বহুলাংশে রক্ষা করেছিল জাতীয় মন ও বিবেক, নির্ণয় করেছিল সামাজিক নীতি-রীতি আচার, এ তারই জলন্ত নিদর্শন। আসল অন্তর্নিহিত কথা হল যে ভারতীয় সংস্কৃতি গোড়া থেকে এবং বরাবরই আধ্যাত্মিক, একটা অন্তর্মুখী ধর্ম-দার্শনিক সংস্কৃতি। আর সবকিছু এই কেন্দ্রগত ও মূল বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ, নয়ত তাদের উপর নির্ভরশীল কিম্বা তাদের অনুগত, অধ্যাত্মের অন্তর্মুখী দৃষ্টির কাছে বহির্জীবন পর্যন্ত মাথা নত করে চলেছে।

আমাদের সমালোচক-প্রবর এই মূলকথাটির গুরুত্ব ঠিক ধরেছেন, তাই এরই উপর চালিয়েছেন অবিরাম আক্রমণ; অন্যত্র দয়া করলেও একটু ওদার্য দেখালেও এখানে তিলার্ধ ছাড়তে নারাজ। এখানে সব কিছুকে মন্দ ক্ষতিকারক হতেই হবে, কেন্দ্রিয় ভাব ও উদ্দেশ্যটির জন্য একেবারে পরিহার্য না হলেও আসল কল্যাণার্থে নিষ্ফল তো হতেই হবে। মনোভাবটি তাৎপর্যপূর্ণ। তর্কের মতলব তো আছেই। ভারতীয় মন ও সংস্কৃতির পক্ষে দাবি হল উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও চিন্তার উচ্চ শিখর সব, তা চারিয়ে গেছে তার শিল্পে সাহিত্যে ধর্মাচরণে ও সমাজ-ভাবনায়, তা সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনকেও রাঙিয়ে দিয়েছে। সে দাবি মেনে নিলে, ভারতীয় জীবনদর্শন গ্রহণ না করলেও প্রত্যেক সহানুভূতিশীল এবং অপক্ষপাতী জিজ্ঞাসু যেমন তা মানেন, বলতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতি আছেই, তার সভ্যতারও অধিকার আছে থাকবার। অধিকন্তু, যুক্তিসার আধুনিকতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে বলবার "আগে আমার আধ্যাত্মিকতার উচ্চতা পাও তারপর আমাকে ধ্বংস করবার বা পাল্টে যাবার কথা ব'লো কিম্বা একান্ত তোমারই বাঁচে আমাকে আধুনিক সাজতে বলো। কিন্তু এসে-যায় না নিজস্ব উচ্চতা থেকে পতিত যদিই বা হয়ে থাকি কিম্বা আমার বর্তমান রূপ ও বৃত্তি

যদিও ভবিষ্য মানব মনের সকল দাবি না মেটাতে পারে আবার তো উঠতে আমি পারি, সে-শক্তি রয়েছে আমার মধ্যে। এমন কি, হয়ত সক্ষম হব এক আধ্যাত্মিক আধুনিকতা গড়ে তুলতে যাতে তোমার আত্মঅতিক্রমের সাহায্য হবে, পাবে এমন বৃহত্তর সমন্বয় যা অতীতের অনধিকৃত এবং বর্তমানের স্বপ্নাতীত।" বিরূপ সমালোচক এ-দাবিটি গোড়া থেকে নস্যাৎ করে দিতে চান। তাঁর চেষ্টা ভারতীয় দর্শনকে অনাধ্যাত্মিক এবং ভারতীয় ধর্মকে একটা অযৌক্তিক আত্মকামুক বর্বরব্রত প্রমাণ করা। সত্যকে বাধা দিয়ে দাঁড় করান এবং ঘটনাকে তার দৃষ্টিতে উল্টো দেখানর এই প্রয়াসে তিনি নিজেই গোঁজামিলের অসঙ্গতি ও ভণ্ডুলে বপাস হয়েছেন—তাতে নিছক অতিশয়োক্তির দোষেই মামলা খারিজ। তবু এই ভজঘটর ভেতর থেকেই দুটি নির্ভেজাল প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রথম, জিজ্ঞাসা করি যে আধ্যাত্মিক ও ধর্ম-দার্শনিক জীবন-দর্শন এবং তাদেরই ভাবনায় ও প্রেরণায় সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ না যুক্তিসার ও স্থূলচারী জীবন-দর্শন এবং নগণ্য ও বাস্তব বুদ্ধির শাসনে প্রাণ-পুরুষটি চরিতার্থতা মানুষকে দেখাবে শ্রেয়ের পথ? জীবনের আধ্যাত্মিক রূপটির মূল্য ও সার্থকতা স্বীকৃত হলে জিজ্ঞাসা করব, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার যে প্রকাশ তা-ই মানবোন্নতির শ্রেষ্ঠ স্তরে যাবার সর্বোত্তম সহায় কিনা। এশিয়ার বা প্রাচীন মানসের এবং য়ুরোপের বা আধুনিক বুদ্ধির মাঝখানে এ-দুটিই আসল প্রশ্ন ও সমস্যা।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মেজাজ এখনো ধরে আছে যে পাশ্চাত্য মন তাকে রূপায়িত করেছে এই দ্বিতীয় মতটি; সে গড়ে উঠেছে প্রাণিক ও যুক্তিসার ভাবনার ছাঁচে। তার জীবন-বরণে সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্বের অধিকার আদৌ নেই—শুধু গ্রীক-রোমক সভ্যতার ক্ষণজীবী কালটুকু আর তার পরে বুদ্ধিমান উচ্চশিক্ষিত নাভিবৃহৎ শ্রেণীটি ছাড়া; পারি-পার্শ্বিকের দাবি এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিই তাকে চালিয়ে এসেছে। সে-যুগও তো পেছনে ফেলে আসা হয়েছে যখন প্রাচ্য থেকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ভাবধারা এসে গ্রাস করেছিল, এই প্রাণিক ও বুদ্ধিপ্রবণতার উপর প্রভুত্বের চেষ্টা করেছিল; এদের বেশ করে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে নয়ত এক কোণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ধর্ম প্রাণের ধর্ম, পৃথিবীর ও পার্থিব মানুষের ধর্ম, মানসিক স্ফূর্তি, জৈব পটুতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও ভোগ, একটা যুক্তিসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ। এ-মন ভারতীয় সংস্কৃতির সামনে এলেই বিরূপ হয়, প্রথমত সে অপরিচিত ও অভূতপূর্ব, তারপর মনে হয় সে অযৌক্তিক অস্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রায়শ যেন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরোধীপক্ষ এবং শেষে প্রচুর অবোধ্য রূপসমারোহ। এসব রূপ তার চোখে অতিপ্রাকৃতের ভিড়, অতএব তার হিসাবে অলীক। অবশ্য অপ্রাকৃত তো রয়েছেই, পরিচিত আদর্শ সঠিক পদ্ধতি নির্ভুল পন্থা পর্যন্ত ছেড়ে যাওয়া, এমন অবস্থায় থাকা যেখানে প্রত্যেকটি জিনিসের আকৃতি—চেষ্টারটনের ভাষায়—মনে হবে বেচপ। পুরাতন গোঁড়া খৃষ্টানী দৃষ্টিতে এই সংস্কৃতি মনে হতে পারে নারকীয় বস্তু, একপাল

রাক্ষস নিয়ে বিকৃত রচনা ; আধুনিক সমাজতন্ত্রীয় যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে শুধুই অযৌক্তিক নয় যুক্তিবিরোধী দুঃস্বপ্নও, একটা বীভৎসতা, বিগত দিনের অসংলগ্নতা, বড় জোর অতীত প্রাচ্যের রঙীন আকাশকুসুম। বলা বাহুল্য এ হল চরম দৃষ্টিভঙ্গী—এবং নিঃ আর্চারেরও —তবে নির্বেদ এবং অরুচি এখানে রাজা। সহানুভূতিশীল এবং বোদ্ধা জিজ্ঞাসুদের অন্তরেও সর্বদা এই ধরণের একটা বোধের রেশ দেখা যায় ; তবে গড়পড়তা পাশ্চাত্য-পুরুষটি প্রাথমিক অজ্ঞানের স্বাভাবিক ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট, তার কাছে সবই বিস্বাদ বিশৃঙ্খলা। ভারতীয় দর্শন অবোধ্য, সূক্ষ্ম অবাস্তব মেঘসঙ্কুল ; ভারতীয় ধর্ম তার চোখে অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধনা এবং অসম্ভবতর স্থূল অনৈতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহুদেব পূজার সংমিশ্রণ। ভারতীয় কলাশিল্পে তার চোখে পড়ে দারুণ বিকৃত কিম্বা চিরাচরিত রূপ এবং অসীমের হাতছানি ধরবার ব্যর্থ প্রয়াস—যেখানে সব খাঁটি শিল্পের হওয়া উচিত স্বাভাবিক ও সসীমের সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত প্রতিচ্ছবি অথবা সূক্ষ্ম কাল্পনিক প্রতিফলন। তার অভিযোগ ভারতীয় সমাজে পুরাতন জগতের ও মধ্যযুগীয় ভাবধারা ও অনুষ্ঠানের এ এক অসংলগ্ন এবং অর্ধবর্বর পুনরুত্থান। এই মতবাদের ধার আজ অনেক কমেছে এবং প্রকাশে তত সোচ্চার বা নিশ্চিত নয়, তবে রয়েছে বটে এবং নিঃ আর্চারের গলাবাজির তাই গোটা ভিত্তি।

ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সব আপত্তির প্রকৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট। তার অঙ্গ থেকে যখন সাংবাদিকের অলংকার খুলে নেওয়া যায় তখন দেখি এর মোটা অর্থ, একটা সংস্কৃতি যে বুদ্ধিকে তর্কাতীত আধ্যাত্মিকতার অধীন করেছে এবং যে প্রাণ ও কর্মকে প্রাণ ও কর্মের চেয়ে বৃহত্তর কিছুর জন্য উদ্‌গ্রীব হতে বলেছে তারই বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধ প্রাণ ও বস্তুবাদী মানুষের একটা স্বাভাবিক বিরূপতা। ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরাত্মা—অঙ্গাঙ্গী ও অন্যোন্যসম্বদ্ধ। ভারতীয় দর্শনের গোটা লক্ষ্য, তার সার্থকতা, আত্মার জ্ঞান, তারই উপলব্ধিতে, অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ আবিষ্কারে ; তার অনন্য লক্ষ্য আর ধর্মের পরমার্থ একই বস্তু। ভারতীয় ধর্ম তার সব বিশেষার্থ বের করেছে অধ্যাত্ম দর্শন থেকে—তা-ই তার বহুতর অভীপ্সাকে ভাস্বর করে তুলেছে, ধর্মীয় অনুভূতির নিম্নতর স্তর থেকে সংগৃহীত সবের বহুলাংশকে একরসে রাঙিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথমে ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে নিঃ আর্চারের আপত্তিগুলিই বা কী? তা হল, প্রথম আপত্তি হল যে এটি অতিরিক্ত দার্শনিক। দ্বিতীয় অভিযোগ হল, এমন যে পচা জিনিস, আধিবিদ্যক দর্শন, তা-ও অতিরিক্ত আধিবিদ্যক। তাঁর তৃতীয় অভিযোগ, সর্বাপেক্ষা নিঃসংশয় এবং বিশ্বাস্য, এতে নৈরাশ্য কৃচ্ছ্রসাধন কর্ম জন্মান্তরের ভ্রান্ত ধারণাগুলি ব্যক্তিমনকে দুর্বল ও হতাশ করে। আর সমালোচনা যদি এই তিন ভাগে নিয়ে দেখি তাহলে দেখব তা নিতান্তই নিরাসক্ত

বুদ্ধিজাত সমালোচনা নয়, বরং একটা মানসিক অপছন্দ এবং মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মূলগত পার্থক্যেরই অতিশয় প্রকাশ।

মিঃ আর্চার অস্বীকার করতে পারেন না—অস্বীকৃতি তাঁর ভোজবাজী স্বীকারের অনন্য ক্ষমতাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে—যে ভারতীয় মন দার্শনিক চিন্তায় একটা অতুলনীয় সক্রিয়তা এবং ফলপ্রসূতা দেখিয়েছে। তিনি অস্বীকার করতে পারেন না আধিবিদ্যক ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং আধিবিদ্যক প্রশ্ন বেশ সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচারের ক্ষমতা অন্য দেশের চেয়ে ভারতে অনেক বেশি ব্যাপক। একজন গড়পড়তা ভারতীয়ও এ ধরণের প্রশ্ন বুঝতে ও সামলাতে পারে, যেক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও শিক্ষার সমপর্যায়ে একজন পাশ্চাত্যবাসী তা নিয়ে, এ কয় পাতায় মিঃ আর্চারের মতো, অথৈ জলে পড়ে নাস্তানাবুদ হবেন। তবে তিনি স্বীকার করছেন না যে এই ঘনিষ্ঠতা এবং সূক্ষ্মতা কোনো উৎকৃষ্ট মানসিক সামর্থ্যের প্রমাণ—'অনিবার্য' কথাটা প্রমাণের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে—যাতে প্লেটো, স্পিনোজা, বার্কলেকেও সেই দলে ফেলার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বোধহয় এসব তেমন 'অনিবার্য' প্রমাণ নয়; কিন্তু এক বৃহৎ সমস্যার শ্রেণীতে, মানস প্রতিভার এক বিপুল ও দুরূহ স্তরে এ তুলে দেখায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপক অনন্য সমৃদ্ধি। খানিকটা বাহাদুরির ভড়ং দেখিয়ে য়ুরোপীয় সাংবাদিকের অর্থনীতি রাজনীতি তথা শিল্প সাহিত্য নাটক সমালোচনা করার প্রয়াস অবশ্যই কোন সমুন্নত মানস সামর্থ্যের অনিবার্য প্রমাণ নয়; অবশ্য এতে দেখা যায় সাধারণ্যে য়ুরোপীয় মনের স্তরে উৎকর্ষ, এসব কর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্যগ্রহণ এবং সহজ সামর্থ্য। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও পদ্ধতি স্থানে স্থানে বহিরাগতের কাছে 'বর্বরসুলভ' মনে হতে পারে, তাতেই আবার প্রমাণ হয় যে একটা সংস্কৃতি, সভ্যতা, মহান এক মানসিক ও সামাজিক সংসিদ্ধি য়রেছেই, আর সেই সঙ্গে সেই সিদ্ধিতে প্রখর ও ব্যাপক জনসহযোগ। মিঃ আর্চারকে ভারত সম্পর্কে সূক্ষ্মতর দুরূহতর এক বিষয়েও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা পরিহার করতে হল। তার জন্য তিনি বলে বসলেন দর্শনের কোনো মূল্য নেই; তাঁর কাছে ভারতীয় মনের এই চর্চা অজ্ঞেয়কে জানবার ও অচিন্ত্যকে ভাববার এক অতুলনীয় নিষ্ঠা। কেন? না, দর্শন তো সেই জগতের ব্যাপার যার 'মূল্য যাচাই' চলে না, আর সে-জগতে এই চিন্তা জিনিসটিই—নিছক অপ্রমাণ্য কল্পনাবিলাস বলেই—তুচ্ছ বা নিরর্থক।

তাহলে পৌঁছান গেল দুই দৃষ্টিভঙ্গীর চিত্তাকর্ষক ও বিশিষ্ট সংঘর্ষে, মানসিক উপাদানের পার্থক্যে পর্যন্ত। যা শুনলাম তা নিরীশ্বরবাদীর অবিশ্বাসীর তর্কজাল, তবে এ তো মজ্জায় মজ্জায় জড়বাদী য়ুরোপীয় ভাবুকের যেটি পরিচিত রূপ তারই চূড়ান্ত যুক্তিবদ্ধ বাগ্‌বিস্তার। য়ুরোপে মহাননীষীরা যে দর্শনচর্চা করে এসেছেন তার ফল বুদ্ধিস্তরে বিপুল ও বিরাট, কিন্তু জীবন থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন একটা বৃত্তি বলে,—চমৎকার সমুচ্চ একটা জিনিস, যদিও বন্ধ্যা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ভারতে ও চীনে দর্শন

যখন জীবনকে আলিঙ্গন করেছে, সভ্যতার উপরে এনেছে প্রচণ্ড বাস্তব প্রতিক্রিয়া, তৎকালীন চিন্তা ও কর্মের মর্মে প্রবেশ করেছে তখন য়ুরোপে তেমন পদমর্যাদা আদৌ সে পায়নি। স্তোয়িক (Stoics) এবং এপিকুরীয়দের (Epicureans) সময়ে তার দখল কিছু ছিল, যদিও উচ্চ সংস্কৃতিবানদের মধ্যে; বর্তমানেও সে-ধরণের প্রবণতা আবার দেখছি। নীটশের প্রভাব বিদ্যমান, ফরাসীদেশে জনকয়েক চিন্তাবীরের, জেম্‌স্ এবং বের্গসঁর দর্শন জনচিত্ত কিছুটা আকর্ষণ করতে পেরেছে; এশিয়ার দর্শনের পরিণামী প্রভাবের তুলনায় তা কিছুই নয়। গড়পড়তা য়ুরোপীয় দার্শনিক-বিদ্যা থেকে তার নীতিসূত্রের দিশা নেয় না, নেয় বাস্তববাদী ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকে। মিঃ আর্চারের মতো সে দর্শনকে একান্তই উড়িয়ে দেয় না, তবে "মানুষের গড়া বায়ু" না হলেও মনে করে বেশ ধোঁয়াটে, সুদূর, নিষ্ফল ব্যাপার নিয়ে করবার। তার কাছে দার্শনিকদের সম্মান আছে, কিন্তু সভ্যতার গ্রন্থাগারে তাদের বইগুলি সর্বোচ্চ তাকে তুলে রাখা, গুটিকয়েক বিশিষ্ট বুদ্ধিবান ছাড়া যার কারো হাতে পড়া বা আলোচনার জন্য নয়। সমাজের অধ্যাত্ম গুরু এবং শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা হলেন দার্শনিকরা—প্লেটোর এ-মত তাঁদের কাছে উদ্ভট অবাস্তব ধারণা মনে হয়; দার্শনিক, তার বিচরণ তো ভাবলোকে, তাই আসল জীবনের উপর দখলও শূন্য। অন্যথা ভারতীয় চিন্তা বলছে সত্যদ্রষ্টা মনীষী ঋষিই শুধু ধর্মানুষ্ঠানের বা নৈতিকের দিশারী নন, বাস্তব জীবনেরও। দ্রষ্টা ঋষিই সমাজের স্বাভাবিক নেতা তার সভ্যতার আদর্শ ও আলোকদিশা এই ঋষির মধ্যেই সে প্রমূর্ত হতে দেখে। আজও যে তার জীবনের সাহায্যকল্পে এনে দেবে অধ্যাত্ম সত্যটি, ধর্মনীতিবিদ্যা সমাজ এবং রাজনীতিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করবার সেই সকল ভাব ও প্রেরণা তাকেই ওই নামে আখ্যাত করতে সে প্রস্তুত।

তার কারণ হল ভারতীয়ের এই বিশ্বাস যে সব পরম সত্য হল অন্তরাত্মার সত্য, আর আমাদের জীবনে এই অন্তরাত্মার সত্যই সবচেয়ে গভীর এবং ফলপ্রসূ, যেমন আন্তর জীবন-গঠনে তেমনি বহির্জীবন সংস্কারে। য়ুরোপীয়ের কাছে প্রায়শ পরম সত্য হল ভাবগ্রাহী বুদ্ধির সত্য, বিশুদ্ধ যুক্তি, সত্য আধ্যাত্মিক হোক আর বৌদ্ধিক হোক মন প্রাণ দেহের সাধারণ প্রবৃত্তির ওপারে এমন এক স্তরে যে এই ত্রয়ীর দৈনন্দিন "মূল্য-যাচাইয়ের" পরীক্ষা চলে না। এসব পরীক্ষা হতে পারে শুধু বাহ্য ঘটনা এবং বস্তুসার ব্যবহারিক যুক্তির জীবন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে। বাকী যা তা কপোলকল্পনা, তার স্থান ভাবলোকে, জীবনের ক্ষেত্রে নয়। এবার এসে পড়লাম দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতায় যা মিঃ আর্চারের অভিযোগের মূলকথা। তাঁর মতে দর্শন বস্তুটাই স্রেফ আন্দাজি ব্যাপার; একমাত্র প্রামাণ্য সত্য, আমাদের ধরে নিতে হবে, সাধারণ ঘটনার সত্য, বহির্বিশ্ব এবং তার দিকে আমাদের সাড়া, জড়বিজ্ঞানের সত্য এবং জড়বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত মনোবিজ্ঞানের সত্য। তিনি তিরস্কার

করে বলছেন যে ভারতীয় দর্শন তার সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে, সিদ্ধান্তকে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেছে, তার 'অনধ্যায়' অভ্যাস যার জন্য হাতড়ান গৃহীত হয় সন্ধান বলে, অনুমান জ্ঞান বলে—সেই আধ্যাত্মিক অভ্যাসের পরিবর্তে, বোধকরি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-কেই একমাত্র জ্ঞেয় এবং দেহগত জ্ঞানকেই আত্মা এবং চেতনার জ্ঞান মনে করে। দার্শনিক নিবিষ্টতা এবং যোগ যে প্রকৃতিতত্ত্ব এবং বিশ্বরূপ জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার উপর তাঁর তিক্ত শ্লেষোক্তি। নিঃ আর্চার-প্রদত্ত ভারতীয় দর্শনের যে ব্যাখ্যা তাতে তার প্রকৃতি ও অন্তঃ-সার সম্বন্ধে তাঁর দারুণ অজ্ঞতাপ্রসূত বিকৃতচিত্রণই ধরা পড়ে, কিন্তু আসলে এটি গড়পড়তা বস্তুবাদী পাশ্চাত্য মনের অনিবার্য দৃষ্টিভঙ্গিই।

বস্তুত নিছক অনুমান ও আন্দাজকে ভারতীয় দর্শন ঘৃণা করে। কথাটা ঔপনিষদ চিন্তা ও সিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কেই য়ুরোপীয় সমালোচকরা অনবরত বলে থাকেন; অবশ্য ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের পদ্ধতির এ-ব্যাখ্যা অচল বলে সরাসরি ত্যাগ করবেন। আমাদের দর্শন অচিন্ত্য অজ্ঞেয় পরমকে স্বীকার করে নিলেও সেই উত্তম রহস্যের চুলচেরা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত হয়ে ওঠে না,—যুক্তিবাদী তাকে যে উদ্ভটত্বের অপবাদ দেয়; তার কাজ আমাদের অভিজ্ঞতার উর্ধ্বতন শিখরে এবং নিম্নতর স্তরে যা-কিছু চিন্ত্য ও গ্রাহ্য তাদেরই নিয়ে। তার সিদ্ধান্তকে সে তার ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে বেঁধেছে,—নীতিসূত্র, বলা হচ্ছে যাদের,—কারণ সে-সবের প্রতিষ্ঠা এমন অভিজ্ঞতার উপর যা যে-কেউ উপযুক্ত পন্থা এবং একমাত্র সম্ভব পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে দেখতে পারে। ভারতীয় চিন্তা স্বীকার করে না যে মূল্য বা বাস্তবতার একমাত্র পরীক্ষা স্থূল বিজ্ঞান, জড়প্রকৃতির তল্লাসী পরী-ক্ষায় কিম্বা আমাদের অগভীর মনোবিজ্ঞানের নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনার নিরিখে,—এ সব তো অসীম প্রচ্ছন্ন অবচেতন ও অতিচেতন উচ্চতা গভীরতা বিস্তারের উপর-ভাগে সামান্য দোলাচুকু। এসব অধিকতর সর্বব্যাপী ও নৈর্ব্যক্তিক মূলের পরীক্ষা কী? স্পষ্টত, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ ও সমন্বয়, যুক্তি, বোধি,—যেহেতু মনে হচ্ছে আজকালকার দর্শন ও বিজ্ঞান বোধির মর্যাদা মেনে নিয়েছে। অন্য সূক্ষ্মতর সত্যের ব্যাপারেও পরীক্ষা একই ধরণের, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ ও সমন্বয়, যুক্তি, বোধি। কেবল একটি কথা, যেহেতু এসব বস্তু আত্মা ও চিতের সত্য, এই অভিজ্ঞতারও হওয়া চাই মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক, একটা মনস্তাত্ত্বিক এবং চৈত্য-দৈহিক পরীক্ষা বিশ্লেষণ ও সমন্বয়, একটা বৃহত্তর বোধি যার দৃষ্টি চলে যায় উচ্চতর লোকে, বাস্তবতায়, সত্তার সম্ভাবনায়, এমন-এক যুক্তি যা নিজের ওপারে অন্য কিছুকে স্বীকার করে, উর্ধ্বে তর্কাতীতের দিকে তাকায়, মানুষী বুদ্ধির কাছে তার যথাসম্ভব পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। নিঃ আর্চার আমাদের যে-যোগ ত্যাগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন তা অভিজ্ঞতার এই সব বৃহত্তর লোকাবলি খুলে ধরবার বহু-পরীক্ষিত পন্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে নিঃ আর্চার কি তাঁর ভাতভাইয়েরা যে এসব বুঝবেন এমন আশা করা যায় না ; ঘটনা এবং ভাবের সংকীর্ণ কেত্রটুকুই যাঁদের কাছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিধি তাদের বুদ্ধির অগম্য তা। বুঝতে পারলেও তাতে তাঁর কিছু এসে যেত না ; সে ভাবকেও তিনি অসহিষ্ণুতা-ভরা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেন, অপরিচিত সত্যের সম্ভাবনাটি পরীক্ষায় নেমে তাঁর দারুণ যুক্তিবাদী শ্রেষ্ঠত্ব একটুও হানি না ক'রে। এই মনোভাবে পড়পড়তা জড়বাদী মন তাঁর দলে ভিড়বে। এ-মনের কাছে এ সব চিন্তা-ভাবনা আদপে অসম্ভব এবং অবোধ্য—গ্রীক হিব্রুর চেয়ে অনেক অধম, এমন যে-সব ভাষার মানা-গণ্য পুরোহিতরা রয়েছেন ; কিন্তু এগুলি হল চিত্রলিপি যাকে সঙ্কেতবহ গ্রাহ্য দাবি করে শুধু ভারতীয় থিওসফিস্টরা এবং বয়সী ভাবুকরা—গোটা অচ্ছুত দলটা। এ-মন আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে সত্র ও অনুমান, পুরোহিত এবং বাইবেল যেন বুঝতে পারে অবিশ্বাসের সঙ্গে হোক কিম্বা চিরাচরিত স্বীকৃতির সঙ্গে হোক, কিন্তু তা বলে গভীরতর প্রামাণ্য আধ্যাত্মিক সত্য, নির্দেশ অধ্যাত্ম-রহস্যাবলী ! সমস্ত ভাবটা তার কাছে উটকো, একটা হাঁগোল। প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সে একটা প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে বুঝতে পারে, যেন 'বিশ্বাস করি কারণ যুক্তিগতভাবে তা অসম্ভব বলে' অথচ ধর্মের অতল একটা রহস্য, দার্শনিক চিন্তার একটা উচ্চতম সত্য, মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার একটা গূঢ়তম পরম আবিষ্কার, আত্ম-সন্ধান ও আত্ম-বিশ্লেষণের একটা ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল পরীক্ষণ, আত্মসিদ্ধির একটা গঠননূলক আন্তর সম্ভাবনা, সব গিয়ে পৌঁছায় যে এক এক লক্ষ্যে, পরস্পরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন ক'রে, আত্মা এবং যুক্তি তথা মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং তার গভীরতর দাবির এক সমন্বয় এনে—ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহাপ্রাচীন ও অনলস গবেষণা ও সংসিদ্ধি পড়পড়তা জড়বাদী পাশ্চাত্য মনকে ব্যাহত ও বিক্ষুব্ধ করে। যে জ্ঞানের পেছনে ছুটতে গিয়ে বারবার আছাড় খেয়েছে এবং শেষে যার হদিশ পায়নি তা আর কেউ পেয়েছে এতে পাশ্চাত্য অবাক। বিরক্ত হতবুদ্ধি ঘৃণাপরচিত্ত সে তার নিজেরই নিকৃষ্টতর দ্বিধাভিন্ন সংস্কৃতির চেয়ে বড় বলে এমন কোনো সমন্বয়কে স্বীকার করতে চায় না। কারণ সে অত্যন্ত ধর্মীয় অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতায় যার নিত্য দ্বন্দ্ব বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে অথবা যে এক অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং একটা বিক্ষুব্ধ কিম্বা আত্ম-বিশ্বাসী সন্দেহবাদের মধ্যে দোলনা। য়ুরোপে দর্শন এক এক সময়ে ধর্মের পরিচারিকা হয়েছে—সহোদরা নয়, প্রায়শ শত্রুতায় নয়ত অবজ্ঞাভরা সম্পর্কছেদে সে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানে লড়াই বলতে গেলে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মূল কথা। এমন-কি, দর্শন ও বিজ্ঞানও একমত নয় ; তারাও ঝগড়া করে পৃথক। য়ুরোপে এসব শক্তি এখনো একসঙ্গে, কিন্তু তারা সুখী পরিবার নয় ; গৃহবিবাদ তাদের জলভাত।

আশ্চর্য কি এ সব যার কাছে জলভাতের ব্যাপার সেই বস্তুবাদী মন তেমন চিন্তনা ও জ্ঞানৈষণা থেকে সরে পড়বে যেখানে রয়েছে সমন্বয়, সর্বসম্মতি, ধর্মে-দর্শনে মিলন এবং

শৃঙ্খলাবদ্ধ সুপরীক্ষিত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা। এমন বিদেশী জ্ঞানরূপের মোকাবিলা থেকে সহজেই পালানো যায় স্রেফ এই বলে যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান আত্ম-সম্মোহনী আকাশ-কুসুমের জঙ্গল, ভারতীয় ধর্ম যুক্তিবিরোধী কুসংস্কারের অবাধ স্ফূর্তি, ভারতীয় দর্শন অন্তঃসারহীন কল্পনার সুদূর মেঘবিস্তার। স্বস্তি এনে দেয় এই যে আত্মতৃপ্তির অস্বস্তিকর মনোভাব তার ফলে এবং মিঃ আর্চার যে সমালোচনার সস্তা ও সর্বধ্বংসী পদ্ধতি চালিয়েছেন তার ফলে পাশ্চাত্যও সম্প্রতি সেই রাস্তায় এসে পড়েছে যেখানে এই বর্বরতার অপ্রীতিকর রাশি সমর্থিত এবং য়ুরোপ নিজে অনুরূপ চিন্তার দারুণ সান্নিধ্যে। ক্রমেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় দর্শন তার নিজের ধরণে অধিবিদ্যার গবেষণায় অতীত ও বর্তমানের আলোচ্য সবই জেনেছিল। এমনও দেখা যাচ্ছে গবেষণার আর এক প্রান্ত থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা পর্যন্ত সেই প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্তগুলিই আবৃত্তি করছে। যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানকে মিঃ আর্চার ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব এবং কায়াতত্ত্বের সঙ্গে অর্থহীন শ্রেণীবিন্যাস এবং চতুর আন্দাজ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—আদৌ তা নয়, তার ভিত্তি নিরলস অভিজ্ঞতা—তার ক্রমশ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারে। ভারতীয় ধর্মের মূল ভাবগুলি মনে হচ্ছে সেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তের কাছে যখন তারা একটা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মনো-ভাব এবং আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার মুখ্য চিন্তা এবং অনুভূতি হয়ে উঠবে। কে বলতে পারে যে পাশ্চাত্যের 'হাতড়ান এবং আন্দাজি'র কিছুকে যদি আর একটু ঠেলে এগিয়ে দেওয়া যায় তাতে শেষে ভারতীয় যোগসাধনাই সমর্থিত হবে না? এমন কি এই ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ড-কল্পনা যে সুলভ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের পরেও আছে অন্য সব জগৎ অদূর ভবিষ্যতে তা-ও স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু বস্তুবাদী মনের সাহস তবু হয়ত অটল : কারণ তার দখল বেশ জোরদার এবং তার পক্ষে সনাতনী চিন্তা ও ভোগদখলের স্বত্ব নীতির মর্যাদাটি ; অনেক স্রোতের ধারা ফুলে ফেঁপে মিশবে এসে এসব ডুবিয়ে দিতে, তারপর বিলনবন্ধনের চিন্তার এক উজান ধারা বিশ্বমানবকে ঠেলে নিয়ে যাবে আত্মার নিভৃত তীরে।*

---

* Foundations of Indian Culture : A rationalistic Critic of Indian Culture—Chapter II

কবি শ্রীঅরবিন্দ

সুনীলচন্দ্র সরকার

কবির কাছে পাঠকের একটা সঙ্গত দাবী আছে। তা শুধু নূতন তত্ত্ব বা চিন্তন, নূতন কোনো ভঙ্গিমা বা ঝঙ্কারের দ্বারা তৃপ্ত হবার নয়। এমন কিছু অভিজ্ঞতার আস্বাদন পাঠক চান যা সত্যি ভালো লাগার, শুধু এক মুহূর্তের জন্য নয়, বরাবরের জন্য ভালো লাগার একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করে দেবে। এমন একটা নালিশ আছে যে শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য রচনার মত তাঁর কাব্যেরও ভাষা, ভাব, সংগঠন কঠিন, দুর্বোধ্য। তার জন্যেই হয়তো অনেকে তাঁর কাব্য আস্বাদনের চেষ্টাই করেননি। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভূমিকা, স্তর বা পর্যায়-ও চেনা কবিদের থেকে আলাদা, সেটাও একটা বাধা। এই ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য সব মহান ও মৌলিক কবিদেরই থাকে। দান্তের কস্‌মোগ্রাফি—বিশ্বজগৎ পরিকল্পনা—এবং তার কাব্যিক ব্যবহার স্বীকৃত বা মোটামুটিভাবে গৃহীত হতে সময় লেগেছে অনেক। শেলির ঊর্ধ্বাকাশ, কীট্‌স্‌এর প্রেমপ্রপঞ্চনিহরিত জগৎ অনেক কৃতবিদ্য কাব্যরসিকের কাছেও বহুকাল ছিল অদ্ভুত, অগ্রহণীয়। ব্লেক, মালার্মের মত কবিদের সম্বন্ধে এ কথা আরো সত্য।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজগৎ শুধু স্বপ্নপ্রয়াণ বা কল্পনাবিহারের রাজ্য নয়। তাঁর বিবৃত প্রতিটি লোক বা জগৎএর ভূগঠন দৃঢ়, পরিসীমা সুস্পষ্ট। এমন কি অস্পষ্ট, অন্ধকার, অনির্দেশ্য সেই সব স্তর—তারও প্রবেশ নির্গমপথের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। প্রতিটি জগতেই জীবনের এক এক ধরণের বিশেষ রূপ বা নাট্যচিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। প্রায়ই তা দেখানো হয়েছে সেই স্তর অনুযায়ী প্রকৃতি ও পুরুষের লীলাবর্ণনের মধ্য দিয়ে। এই সব ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মতই প্রত্যক্ষ জগৎএর সৃষ্টিকর্তা। সেখানকার পাত্রপাত্রী, তাদের নানারকমের অভিজ্ঞতা, একেবারে নিম্নভূমির, অস্পষ্টতা থেকে উচ্চ চেতনালোক পর্যন্ত অভিজ্ঞতাবিস্তৃতি—এর অদ্ভুত নিপুণ রূপায়ণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। কত ভাবেই দেখিয়েছেন জীবনের দেবীকে। কোথাও সে দুঃখ বিপর্যয়কে মেনে নিয়েছে নিতান্তনৈমিত্তিক ঘটনার মত; যন্ত্রণাভোগ, পাপ ও পতনে ভ্রূক্ষেপ না করে বিপদ ও নূতন আবিষ্কারের রাজ্য হাতড়ে সে মেলে ধরতে চাইছে আত্মার অজানা প্রদেশ। কখনো বা সে নিজে কর্ত্রী, কখনো বা নিজের অদম্য আকাঙ্ক্ষার ক্রীতদাসী, হাতের পুতুল। প্রকৃতির নীচের পঙ্ককুণ্ডে কখনো বা সে কৃমিকীটের মত, কখনো বা সে পৃথিবীটাকে গিলতে চাইছে হাঁ করে, বা সমস্ত সমুদ্রটাকে জড়াতে চাইছে গায়ে পোষাকের মত,

ভোগ করবার শাসন করবার আরো অনেক জগৎএর জন্য বায়না ধরেছে। কখনো স্বর্গে যাবার পথে বহুদূর এগিয়ে হঠাৎ নেবে যাচ্ছে নরকের সিঁড়ি দিয়ে।

প্রতিক্ষেত্রেই আমাদের এই পৃথিবীজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখা যায় তাহলেই এই সব সূক্ষ্ম জগৎএর সন্নিবেশ ও আকৃতিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীজীবনে মানুষের ভূমিকা কত সামান্য। সেখানে তার লাভের মধ্যে এই যে সে পায় এক অনাত্মীয় ভীড়ের মধ্যে একটুখানি বন্ধুতা, একটু মায়ামমতার ছোঁয়া—আর তাকেই আশ্রয় করে জীবনের অতি ক্ষুদ্র মানচিত্রে সে এঁকে তোলে তার হৃদয়-অনুভূতি বিস্তারের একটা প্ল্যান

> A touch of friendship mid indifferent crowds
> Draws his heart-plan on life's diminutive map.

আর মানুষের এই সঙ্কীর্ণ জীবনকে নিয়ে খেলা করে ক্রূদে উপদেবতারা ; নীরস কঠিন আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রপে বিঁধতে থাকে মানুষকে, তার ফলে জীবনের শকট কেবলি ঘুরে মরে এক গোলকধাঁধায়, কিছুতেই আর বেরিয়ে যেতে পারেনা সেই বিভ্রান্তি থেকে

> With a goad of hard dry lusts they prick,
> While jogs on devious ways that nowhere lead
> Life's cart finding no issue from ignorance.

কিন্তু সুখের বিষয় জীবননাট্যের সব সম্ভাবনা এতেই শেষ হয়ে যায়নি। জীবন-বিধাত্রী যে দেবী তিনি আছেন নিম্ন থেকে উচ্চতর সমস্ত লোকেই। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা কেবলি কিছুনা কিছু গড়ে তুলছে। এমন কি যেখানে মনে হয় তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, জড়ীভূত, সেখানেও তাঁর ভিতরকার এক গোপন সৃজনীশক্তি কাজ করে চলেছে

> Here fallen, a slave of death and ignorance,
> To things deathless she is driven to aspire
> And moved to know even the unknowable.
> Even nescient, null, her sleep creates a world,
> When most unseen, most mightily she works ;
> Housed in the atom, buried in the clod
> Her quick creative passion cannot cease.

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যরাজ্যপ্রবেশের একটি সহজ রাস্তা সেইসব কাব্যাংশ যেখানে তিনি পৃথিবীরই প্রকৃতি, এর ঋতুযাত্রার বর্ণনা করেছেন। মানুষের সুখদুঃখ প্রেমবিরহের

বর্ণনা করেছেন। তাঁর ঋতুযাত্রা বিবরণীর যে চলন্ত মোটামুটি অনুবাদ দিচ্ছি তা থেকে দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে কেমন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পাশে, অথচ নিজের দৃষ্টিপ্রসারে ও চেতনাসমৃদ্ধিতে তিনি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট।

প্রথমে গ্রীষ্ম তাঁর প্রচণ্ড মধ্যাহ্নের দহননীতি নিয়ে এলেন, বিশাল এক বার্নিশকরা আকাশ দেখা গেল তাঁর রাজকীয় সীল। পরে বর্ষা এসে ছিঁড়ল গরমের তপ্তডানা, বিদ্যুতে ভাঙালো হাওয়ার ঝিনুনি, ঝড় ডানা-নাড়া অন্ধকার দিয়ে ঢাকল তারাদের প্রহরায় রক্ষিত স্বর্গের ঘুম, আর পৃথিবীর ব্রাউন মুখটি আড়াল করল তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নায়কের সোনার চোখের দৃষ্টি থেকে। তারপর সুরু হল প্রলয় নাচন :

A surge and hiss and onset of huge rain,
The long straight sleet-drift, clamours of
winged storm-charge,
Throngs of wind-faces, rushing of wind-feet
Hurrying swept through the prone afflicted plains,

এরপর তিনটি চিন্তাগাঢ় সাধনগম্ভীর ঋতুর প্রবেশ ও প্রস্থান। তারপর প্রবেশ করলেন বসন্ত—সৌন্দর্যের দেবতা। পৃথিবীকে দিলেন এমন আলিঙ্গন যা কোনো তরুণ দেবতাই শুধু দিতে পারে। চুম্বনে চুম্বনে তাকে করে তুললেন সুন্দর। সমস্ত জীবনকে মাতিয়ে তুলল যেন স্বয়ং ভগবানের ইন্দ্রিয়ভোগবিলাস। শুধু নিশ্বাস নেওয়াটাই মনে হতে লাগল যেন একটা তীব্র আনন্দ-উন্মাদনা। গাছগুলো হ'য়ে উঠল গন্ধধূপের মত, অশোক ধরল বিশুদ্ধ কামনার রং। সোনার হাসি হাসলেন সূর্য। প্রকৃতির যেখানে যা আছে সব এসে জুটল এক সৌন্দর্যের উৎসবমেলায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার যৌবনবন, তার প্রেমের বিকাশের বিবরণ মনে রেখে যদি আমরা সাবিত্রীর রূপ গুণ ও যন্ত্রণানুভূতির বর্ণনাগুলি পড়ি, তৎক্ষণাৎ শ্রীঅরবিন্দের কবিত্ব-শক্তির আস্বাদন পাওয়া যাবে এবং তার বিশেষত্ব সম্বন্ধেও আর সন্দেহ থাকবেনা। চিত্রাঙ্গদাকে নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যৌবনে একটি কাব্য সুরু করেছিলেন, Chitrangada নামে তার একটু অংশমাত্র এখন পাওয়া যায়। সেখানে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা পাঠের পর অনেকটা প্রতিযোগীভাবেই * তিনি পাশাপাশি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন নিজের কল্পনা-মূর্তি। কিন্তু কি সৌন্দর্যে, কি চরিত্রের গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্যে তাঁর সাবিত্রী এমন একটা পূর্ণতা ও স্বপ্রতিষ্ঠার

---

* মন্তব্য : লেখকের একান্ত নিজস্ব মতামত—ব. স.

আদর্শ সৃষ্টি করেছে যার তুলনা নেই। হেলেন, বেয়াত্রিচে, মিলটনের ঈভ্—কোনো আলেখ্যই সাবিত্রীর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নয়। একই সঙ্গে এক মহৎ ভাবাদর্শকে প্রতিমায় ধারণ, ও সেই সঙ্গে এই পৃথিবীজীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবন্ত হয়ে ওঠা—এই দু'রকম সার্থকতার মিলনে সাবিত্রী অনন্য, অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার স্বপ্ন-শিহরিত সৌন্দর্য, তপতীর সুনিস্রার ধ্যানদীপ্ত মহিমা, রক্ত করবীর নন্দিনীর সহজ আত্মীয়তা—এ সবই যেন এক হয়ে মিশেছে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী চরিত্রে। আর মৃত্যুদেবতার সঙ্গে সূক্ষ্ম বিতর্করত যে সাবিত্রী—তিনি যেন প্রজ্ঞার জীবন্ত মূর্তি। যাঁরা মহৎকাব্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে সাবিত্রীর কথা কাজ ভাব ইত্যাদির আবেদন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত হবার কথা নয়।

জীবনের কোনো পরমক্ষণে বা চরম সঙ্কটে যে অভূতপূর্ব ইরোশন বা ভাববিপর্যয় আসে তার যথাযথ রূপায়ণ মহাকবিদের রসকৃতিত্বের একটা প্রমাণ। একিলিসের বন্ধুবিয়োগ-শোক, প্রায়ামের পুত্রশোক, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা মুহূর্তে উচ্চারণ, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর বেদনা ও ক্রোধের উচ্ছ্বাস, স্বর্গের উচ্ছৃঙ্খল সমারোহ দেখে দান্তের অনির্বচনীয় ভাবোদ্বেগ, ঈশ্বরের কাছে আদম ইভের অনুশোচনা, প্যারাডাইস ছেড়ে যাবার মুহূর্তে তাদের মনোভাব—এই সব এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। তারই সঙ্গে মনে পড়বে সঙ্কটমুহূর্তে হ্যামলেট ম্যাকবেথ লীয়র প্রভৃতির আত্মগত গভীর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যান। এই সব ক্ষেত্রে কাব্যিক উচ্চারণ তার শিখর স্পর্শ করেছে বলে মনে করা হয়। সাবিত্রীতেও নেয়ের নিয়তি জানতে পেরে অশ্বপতি ও তাঁর রাণীর একেবারে ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া, সেই একই ব্যাপারে ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি নারদের মনোভাব; প্রথমদর্শনে সাবিত্রী ও সত্যবানএর মনে অলৌকিক প্রেম-সঞ্চার, একত্র জীবনযাপনের কয়েকটি অমৃতে-ভরা দিন, তারপর মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে হঠাৎ সাবিত্রীর মনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতির উদয়—তাছাড়া যমরাজের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরে ঐ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনে লব্ধ সমস্ত বিচিত্র দর্শন, মনোভঙ্গী আশা আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত রূপায়ণ—এই সব থেকে সাবিত্রীর কাব্য-সম্পদের প্রমাণ সকলেই পেতে পারেন।

সত্যবানকে হারানোর শোক চেপে সাবিত্রী মৃত্যুর দেবতাকে নিজের ভবিতব্য সম্বন্ধে যে দৃঢ়প্রত্যয় জানিয়েছিলেন, সাবিত্রী কাব্য সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য। এই কাব্যও মৃত্যুঞ্জয়ী।

সাবিত্রী বলছেন আমার এই প্রখর প্রবল দুঃখ আমার মনকে টলাতে পারেনি তার স্থির আসন থেকে। না-কাঁদা আমার চোখের জল হয়ে উঠেছে শক্তিরই কঠিন মুক্তা। আমার এই অস্থায়ী হীনগঠন মাটিকে বদলে আমি গড়েছি আমার

শিলায়িত আত্মার প্রতিমা। মহা মহা দেবতাদের বিরোধ ও হাত কাড়াকাড়ির মধ্যে অটল দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবে আমার আত্মা জগতের বিরাট 'না'—ব্যাপক অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে।

My first strong grief moves not my seated mind ;
My unwept tears have turned to the pearls of strength
I have transformed my ill-shaped brittle clay
Into the hardness of a statued soul.
Now in the wrestling of the splendid gods
My spirit shall be obstinate and strong
Against the vast refusals of the world. *

---

* 'আকাশ-বাণী'র সৌজন্যে

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(১৩)

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে আমরা দেখেছি সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তিকে। তাঁর সৎ-স্বরূপের প্রকাশকে বলি অধিষ্ঠান, যাতে এক অখণ্ড সমতার ভাব। যোগে তাকেই বলে সমত্ব—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" তাঁর চিৎ-স্বরূপের প্রকাশ প্রজ্ঞায়, আর তারই পরিচয় বিজ্ঞানে। এই বিজ্ঞানের আলোই মনে নেমে এসে খণ্ডিত হয়েছে। মনকে বিজ্ঞানে তুলে নিয়ে তার জড়স্বভাব পরিবর্তিত করতে হবে। পূর্ণযোগের সাধনায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা অতিমানস রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রজ্ঞার কর্মের আলোচনা করেছি। কিন্তু ব্রহ্ম যে আবার আনন্দ-স্বরূপই। আর তার প্রকাশ হয় প্রেমে। তাই প্রেমের কর্মে সেই ভালবাসার স্বরূপ লক্ষণটি ও বিলাস উল্লাসের বৈচিত্র্যটিও যথাসম্ভব বুঝতে ও পেতে হবে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, আনন্দং ব্রহ্ম। এই প্রজ্ঞাসমন্বিত আনন্দের বিচ্ছুরণ হয় ব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ। তাহলে ব্রহ্মের সৎ-স্বভাবকে অধিষ্ঠান রূপে রেখে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর চিৎ-স্বভাব থেকে প্রজ্ঞার কর্ম, আনন্দ-স্বভাব থেকে প্রেমের কর্ম ও শক্তি-স্বভাব থেকে প্রাণের কর্ম বিচ্ছুরিত হয়ে যেন উথলে পড়ছে। চৈত্য, চিন্ময় ও অতিমানস এই তিন ভাবে রূপান্তরিত চেতনাই পূর্ণযোগের সম্যক সিদ্ধিতে অধিগত হবে অতিমানসী শক্তির অবতরণে, সে আভাস পর্যন্ত আমরা পেলাম। প্রজ্ঞার প্রসঙ্গে একটা ক্রম দেখিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সাধনা ক্রমেও চলে, অক্রমেও চলতে পারে। তাই চৈত্য পুরুষকে জাগানোই আসল কথা এবং চৈত্যরূপান্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে সাধনপথে চলাই সমীচীন।

হুঁশে থেকে সাধনা করতে হয়, ভাবাবেগে অন্ধ হলেই মুশকিল। বিবেক-বিচারকে নিরাপদ আশ্রয় করে জ্ঞানের পথে চলার কথাতে মস্তিষ্কের ক্রিয়াই প্রধান, এইরকম মনে হয়। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সত্তার ভূমিকাতে প্রজ্ঞার বেদি গড়ে তুলতে হয়, সাধনায় এটা যেন পৌরুষের দিক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই সব মহাবাক্যের আদেশে পৌরুষের ব্যঞ্জনাই স্পষ্টত অভিব্যক্ত দেখতে পাই। এর ওপরে হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত করে আত্ম-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে পারলে রসের অনুভূতিতে প্রাণ যখন আবার নতুন করে জেগে ওঠে, তখন বোঝা যায় যে হৃদয় যেন এতক্ষণ শুষ্ক ছিল; আমরা ভালবাসতে

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

পারিনি তো! তখন প্রজ্ঞায় স্থিত হয়ে হৃদয় দিয়ে সাধনা শুরু হয়। তাহলে আবার পেলাম, সৎ চিৎ যেন পৌরুষের দিক দিয়ে জ্ঞানের দেবতা শিব, অচল অটল; আবার তাঁরই উল্লাস আনন্দময়ী প্রকৃতি ভুবনেশ্বরী শক্তি। এইভাবে শিব-শক্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত সাধনায় আমরা জ্ঞান প্রেম ও শক্তিকে কর্মে মিলিয়ে নিতে পারি। সাধনার পথে বস্তিকে (বুদ্ধিতে) হৃদয়ে ও সঙ্কল্পে উত্তরোত্তর তার প্রকাশ সুসমঞ্জস হতে থাকে। হৃদয় উন্মুক্ত হলে বোঝা যায়, মহাপ্রকৃতি জীবের মধ্য দিয়ে নিজেই সাধনা করে চলেন, চৈত্যসত্তা (soul) তখন হৃদয়ের পুরোধা।

আমরা অনেক সময় নিশ্চাচ্ছলে কোন মানুষকে বলে থাকি বিরস (heart-less)। তার অর্থই হল তার আত্মা জাগেনি, হৃদয়ের রসের সন্ধান সে পায়নি। অথচ, এই হৃদয়ের ভালবাসাতেই কামনা বাসনার রস এমন ভাবেই গেঁজে ওঠে যে, তাকে হৃদয়ের মৌলিক বৃত্তি বলে ভুল করে, মানুষের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক পাতিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেখা যায় যে, বাসনার ক্ষণিক তুষ্টি হলেও তা ভালবাসার মানুষকে ও যে ভালবাসে তাকে, সার্থক করে তুলতে পারল না। এক তিক্ততা ও অবসাদ যেন হৃদয়বৃত্তিকে অবসন্ন করে অসাড় করে দিল। কিন্তু এই হৃদয়েই রসচেতনার আশ্রয় সেই চৈত্যপুরুষের বাস। তিনিই জীবনের মধ্বদ পুরুষ, মধুভোজী আত্মা। হৃদয়ের মণিকোঠার একান্ত অন্তিকে বসে তিনিই মিষ্ট তিক্ত কষায় সব কিছু রস পান করে চলেছেন—'স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি'। তাঁর সম্বন্ধে বেদ বলেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

এই স্বাদু পিপ্পলাদ হলেন চৈত্যপুরুষ, আর অপর কূটস্থ চিন্মাত্র—অনশ্নন্ অভিচাকশীতি, তিনি দ্রষ্টা কিন্তু ভোগ করেন না। দুটিকেই সদাযুক্ত একজোড়া সুপর্ণ বলা হয়েছে, তারা একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে! তাই জীবনের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ যা-কিছু ভোগ, তা সবই চৈত্যপুরুষের জন্য। ভালবাসা চৈত্যপুরুষের ধর্ম, কিন্তু সে ভালবাসার ভোগের মধ্যেও কূটস্থ আত্মা জেগে থাকেন। তাই ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

গীতা বলেছেন ভাবসংশুদ্ধি চাই। আবার বলছেন "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে"। প্রজ্ঞাধৌত নির্বিকার চিত্তেই বিশুদ্ধ রস সঞ্চারিত হয়। তাতে প্রজ্ঞাবান পুরুষ আত্মারাম আনন্দঘন, আর তাঁর আনন্দের বিলাস প্রকৃতিতে উচ্ছলিত, যাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বলেন রস ও রতি। এইভাবে জ্ঞানাত্মা চৈত্যপুরুষের আনন্দঘন ভাবের উচ্ছলনে (ecstasy), সাধকের আত্মদানের অভীপ্সায় বিগলিত হয়ে উঠিয়ে ওঠে। এই হল তাঁকে পাবার প্রশান্ত ব্যাকুলতা। আর তাতেই অধ্যাত্ম-সাধনার প্রধান প্রবেশ-পথটি উন্মুক্ত হল। এর অভিব্যক্তি প্রতিটি সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হয়ে

থাকে, কিন্তু জীবনের ও সাধনের অধিকাংশ বৃত্তিই হল এই শুদ্ধ ভালবাসা। একেই বলে ভগবানের প্রতি আসক্তি, যাকে নরনিয়া বলেছেন "লগ রহ ভাই।" এই প্রেমের যোগটি চাই-ই। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন মায়ের ভালবাসা বলা যায় মা-ই (SHE) ভালবাসা (LOVE)—পরমপুরুষের হৃদয়। পিতা উচ্চে সমাসীন, নির্বিকার দ্রষ্টা আর কর্মরতা মা যে আমার সঙ্গেই। তাঁর কাছে যাই আপীল করি, তিনি শুনবেন। তাই তাঁর প্রতি জন্মগত সহজ আসক্তি নিয়েই আমাদের সাধনা শুরু হয়। কিন্তু ভাবের জগতে বে-সামাল হওয়ার কথা আগেই হয়েছে। শুদ্ধ বিচারণাকে অনেক সময় কুতর্ক দিয়ে নস্যাৎ করা হয়ে থাকে, মনের এই এক দুর্গুণ যেমন আছে, তেমনি বুভুক্ষু প্রাণের কেন্দ্র এই হৃদয়ে অবর প্রাণ এসে থানা দেয়; কেবল খাই খাই চাই চাই তার রব। কোনদিই সে প্রাণবাসনার তর্পণ শেষ হয় না, তার শান্তি কোন সময়েই নেই। এ জন্য ভগবানকে চাওয়ারূপ পবিত্র ভালবাসার মধ্যেও ভেজাল এসে পড়ে। তাই ভগবানকে আমার মত করে চেয়ে যে ভালবাসতে চাই, তা যদি প্রজ্ঞা দ্বারা বিধৃত না হয়, তাতে অশুদ্ধি এসে পড়ে। প্রাণের অবর লোকেই (lower vital) কামনার অধিকার। সেজন্য শুদ্ধ না হলে সে ভালবাসার হোমশিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। চৈত্য-পুরুষকে আবৃত করে কামপুরুষের ছায়া অপদেবতার মত ভর করে থাকে। সেই বিকৃত রস সর্বতোভাবে বর্জন করা চাই, না হলে চৈত্যপুরুষের অধিকারে শুদ্ধ রসবিলাস চলতে পারবে না।

তাহলে শুদ্ধ ভাবে চৈত্যপুরুষের ভালবাসা কেমন করে বুঝতে পারব? সাধনার সময় গোড়ায় জীবাত্মা ও কামাত্মা পাশাপাশিই চলতে থাকে, পরস্পরের ছায়া-সংস্পর্শ হচ্ছে, এটা বোধে আসে। যখন অনুরাগ আসে, প্রাণ কেঁদে ওঠে, তখন দেখতে হয় কিসের এই কান্না। যদি অনেক-কিছুর অভাবে সে কান্না আসে, তাহলে সেটা হবে কামপুরুষের কান্না। তাকে সাধনজীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। অন্তরের গভীরে নিরবদ্য পিপ্পলাদ চৈত্যপুরুষ, হাসি-কান্নায় তিনিই রসভুক্। কাজেই তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেম, ভালবাসা। উন্মুখ হয়ে তাঁকেই চাইতে হবে, বাহিরের কোন বিষয় নয়। ভগবানকে চাইতে গেলে গভীরের সেই আকূতি চাই, lust for life বা কামপুরুষের যে ভালবাসা, তা নয়। পরমহংসদেব বলতেন তিন-টান এক হলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়—পতির প্রতি সতীর টান, সন্তানের প্রতি মায়ের টান আর বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর টান। বিষয়বিষবিকারে চিত্ত মলিন ও অধোমুখী হয়। এটা জেনে ও বুঝে নিয়ে সেই ঊর্ধ্বগামী আকর্ষণকে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হতে দিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই কারণেই চৈত্যপুরুষকে সম্মুখে আনার কথা বারবার বলেছেন। চৈত্যপুরুষের স্বভাবই হল তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমে উন্মুখ; সবের মধ্যে ও সবার মধ্যে তিনি রস যুগিয়ে চলেন। সেই লক্ষণ দিয়ে তাঁকে চিনে নিতে হবে। তাই

ভগবানের প্রতি আকর্ষণ এলে পরে, স্বামী স্ত্রী মাতা পিতা সন্তান, এই সব সম্পর্কের মধ্যে বহির্জীবনের যে সঙ্গ, তাতে যেন আর রস পাওয়া যায় না. প্রাণ অতৃপ্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বোধ করি এই ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাতেই মহাপ্রভু ব্রজ বেয়ের উপপতিসঙ্গের কামনার সংবেগটি ধরতে শিখিয়েছিলেন। গৃহকর্মে ব্যাপৃত রয়েছে তার সর্বেন্দ্রিয়, কিন্তু মন পড়ে আছে অভিসারের দিকে। এই তীব্র আকুলতায় তাঁর সঙ্গে নিত্যই নব সঙ্গ-রসায়নে চিত্ত আপ্লুত হয়ে আছে। এই ভাবটি জাগিয়ে রাখলে বাহিরে সংসারের বিরহের মধ্যে, অন্তরে তাঁর সঙ্গে নিত্য মিলনটি ঘটতে থাকে। কেননা সেই ভালবাসার ব্যাকুলতা ও আবেশ, তা তো তিনিই। তিনিই তো অন্তর্যামী ঈশ্বর হয়ে আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে জড়িয়ে ধরে আছেন. এই ভাব দৃঢ় হলে বাহিরের কর্মে ও ভাবে সব কিছুই শেষ পর্যন্ত সরস হয়ে উঠবে। চৈত্যপুরুষকে জাগানোর প্রধান লক্ষণও তাইতে ধরা যায়; তখন সবই ভাল লাগে, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

প্রজ্ঞা ও প্রেম এই দুই দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে যে চৈত্যপুরুষ জাগ্রত হলে এক দিকে মন ও বুদ্ধি আর অপর দিকে হৃদয়, এই দুই কেন্দ্রেই শক্তি সমৃদ্ধ হতে থাকে। বুদ্ধি দিয়ে যার কূলকিনারা পাই না, প্রাণ তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে এও যেমন সত্য, তেমনি হৃদয়ের উত্তালতাকে বুদ্ধি যদি সামলাতে না পারে, তাতেও বিক্ষোভ এসে বাধার সৃষ্টি করে—এও ঠিক। তাই জ্ঞানের পথে রসবর্জন করতে গিয়ে জীবন থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লে, সাধনপথেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। যে পর্যন্ত না সত্যের সাক্ষাৎকার হচ্ছে, ততক্ষণ সে ত্রুটি থাকবেই। সাধনার সামঞ্জস্য রেখে চলতে গেলে তাই প্রথম প্রয়োজনীয় কর্ম হল বুদ্ধির শুদ্ধির সঙ্গে ভাবেরও শোধন। ভাব শুদ্ধ হলে প্রেমও সহজ হবে। রসের পথকে বলা হয় পিছল; কেননা রসচেতনায় প্রাণের সঙ্গে যুক্ত থাকেন হ্লাদিনী শক্তি স্বয়ং। তিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী। প্রাণের ভালবাসার উৎকর্ষ তাঁকেই অবলম্বন করে, এবং ভালবাসার গতিও সেই পরম লক্ষ্যে। তাই ভালবাসা বা ভাবাবেগ যখন ভাসিয়ে নিতে চায়, তখন দেখতে হয় সেটা খাঁটি কি না।

যদি দেখা যায় মানুষ কাকে ভালবাসে কাকে চায়, তাহলে প্রথমে দেখতে পাই যে এক আত্মরতিতেই সে মজে আছে। ছোট শিশু একটি যেন আনন্দের জীবন্ত প্রতিমা। তাকে ঘিরে সকলে আনন্দ পায়। সেও এতই আত্মকেন্দ্রিক যে, নিজের আনন্দ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এই ভাবে ভালবাসার শৈশব পর্ব কেটে চলে এক ঊর্ধ্বায়ন—উৎকর্ষের দিকে। তখন দেখা যায়, অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হচ্ছে ভালবাসার ব্যাপারে। সেজন্য এ পথে চাই হৃদয়ের প্রসার। অপরের সঙ্গে ভালবাসায় মিলতে হয় হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে; হৃদয়ের এই ব্যাপ্তিতে প্রেমে ত্যাগ সহজ হয়, আর তাতেই প্রেম মধুর হয়ে ওঠে। পরিবারের ভিতর থেকেই এই ত্যাগের শিক্ষা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা থেকে সমাজের জন্য ও বৃহত্তর পৃথিবীর

সমগ্র মানবসমাজের জন্য, ভালবেসেই ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। হৃদয়ের সব গ্রন্থিগুলি খুলে বৃহৎ হতে না পারলে প্রেমে ত্যাগ করাও সহজ হয় না। শেষ পর্যন্ত প্রেমে চিত্তের প্রসার ও জ্ঞানে চিত্তের ব্যাপ্তি একই কথা হয়ে দাঁড়ায়। তাই জ্ঞানে চিত্তের শুদ্ধির সঙ্গে প্রেমেও চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে কিনা বুঝতে আমরা পতঞ্জলির যোগভূমির চিত্তবৃত্তিগুলি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

মূঢ় ভূমিতে চিত্তের ভালবাসা তামসিক, তাই দেহ ও দেহের সব বৃত্তির মূলে। পশুর ভালবাসা, যান্ত্রিক কামাবেগ, সব এই পর্যায়ে পড়ে। জ্ঞানীরা তাকে ভালবাসা বলবেন না, সেটা শুধুই ভারের মত চেপে বসে। ক্ষিপ্ত ভূমির ভালবাসায় আলো আসে, কিন্তু চিত্ত তখনও স্বচ্ছ হয় না। রস-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিন্তু ধৈর্য বা ধৃতি নেই। তাতে এক বিহ্বলতা ও আবেশ আছে এবং শিল্পের সৌন্দর্যবোধও সেখানে দেখা দেয় কিন্তু তা গভীরে যেতে পারে না। এই রাজসিক ভালবাসার বৃত্তিই মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে আসে। এরপর বিক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্তবৃত্তি অনেকটা গুছিয়ে আসে; সেখানে সাত্ত্বিক ভালবাসা স্ফুরিত হলে চিত্তে এক আদর্শবোধ দেখা দেয়। সমাজ-জীবনে ভালবাসার আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা এই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ ভূমির ত্রুটি হল এই যে, এই ভালবাসার বিশুদ্ধি জীবনে ও সংসারে স্থায়ী করা যায় না। নীচের টানে মূঢ়তা ও অস্থিরতা এমন ভাবে সে সাত্ত্বিক ভালবাসাকে পেয়ে বসে যে, তা শুদ্ধ থাকতে পারে না। কেননা মূঢ় ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ভূমিতে অযোগী-চিত্তের প্রাকৃত ভালবাসা। একাগ্র ভূমিতে গেলে এই ভালবাসা লোক থেকে লোকোত্তরের দিকে যাবার প্রবণতা পেয়ে যায়। একাগ্র ভূমিতে ভালবাসাকে নাম দিতে পারি চৈত্য (Psychic) ভালবাসা। তখন তাকে আমরা বলি ভক্তি, প্রেম, প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি যদি নিরুদ্ধ ভূমিতে তুলে স্থায়ী করতে পারা যায়, তবেই পরমপুরুষের ভালবাসার স্বরূপটি বোঝা যেতে পারে। জ্ঞানের সাধনায় চরম জ্ঞানে যিনি এক্য একল, প্রেমের স্পন্দনে তাঁকেই দুইকোটি হতে হয়। সেই একই যেন দ্বিধাবিভক্ত; সাধকের এই একের জ্ঞান হয় একরসে, দুই হয়েও সেই এক। আবার এক থেকেও এক দ্বৈতাভাস; তাকে ভেদও বলা যায় না আবার অভেদ বললেও সবটা বলা হল না, মনে হয়। তাই সেই প্রেমরসের স্বরূপকে বলা হয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

মূঢ় দেহাশ্রিত ভালবাসাই প্রজননের কর্ম করে চলেছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই কামলীলাই রিরংসারূপে বয়ে চলেছে। কোথা থেকে তার অন্ধ প্রবেগ, সেটা বলা যায় না। এক creative urge পিছন থেকে আকর্ষণ করে পশু মানব সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তারও এক রস ও সৌন্দর্য আছে, যা সাধক-রসের সৃষ্টি করে। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পর্যন্ত এই ধূমাচ্ছন্ন মলিন রসেই প্রাণ ও মন জেগে তাকে আলোকিত ও কিছু

পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। তখন যে আদর্শবোধ দেখা দেয়, তা গার্হস্থ্য জীবনের সংযত পুরুষে ও সতী স্ত্রীতে দেখা যায়। কিন্তু ওই আকর্ষণে গভীর থেকে এলেও আত্মসচেতনতা না থাকলে এর অন্ধ প্রবেগ ভাসিয়ে নিয়ে আদর্শ থেকে চ্যুত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যে ও সাহিত্যে এই মাদক-রসই উপজীব্য। তাই ভালবাসার পরীক্ষায় দেহকে ছাপিয়ে প্রাণময় ও মনোময় হয়ে তা যখন একাগ্র ভূমিতে যেতে পারে, তখনই যোগশক্তি তাতে সচেতনভাবে যুক্ত হয়। তা থেকে ভালবাসার আদর্শবোধ আবার দেহ ও প্রাণেও সংক্রামিত হয়। চিত্ত একাগ্র হবে, না হলে তাঁর বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ রূপ সে রসে স্নিত হতে পারবে না। একাগ্রতায় তন্ময়ীন হয়ে চিত্ত পরিণামে নিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

এদেশে ওই একাগ্র ভূমির ভালবাসাতেই সতী নারীর চিত্তে "পতি পরম গুরু" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল। পুরুষের রাশ খোলা থাকা সত্ত্বেও এদেশের নারীচিত্তের প্রবল সংস্কার ছিল যে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেবতাতেই আত্মনিবেদন। ভগবানকে হৃদয় দিলে সে ভালবাসা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ভক্তিপথের সাধনায় ও রসশাস্ত্রে আমরা এই ভালবাসার পরিচয় পেয়ে থাকি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা ত্রুটি সেখানে থেকে যেতে পারে। প্রেমের গভীরতা ও তুঙ্গতা দিয়ে নিজ দেবতাতে একান্তী হয়েও অন্যমতের সঙ্গে সংঘর্ষ এসে পড়তে পারে। তাতে সংসারের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে বিরোধটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এই কারণে একাগ্র ভূমিতে উঠেও চিত্তের প্রেম ঠিক পূর্ণভাবে মুক্তি পায় না। হৃদয়ের প্রসার ও ব্যাপ্তিবোধ নাও আসতে পারে। ইষ্ট-গোষ্ঠী ধর্মসংঘ এসব করেও সেখানে যেন আটকে যেতে হল, এমনও হয়। অথচ শুদ্ধচিত্তের এই প্রেম খাঁটি বস্তু। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেক ধর্মসংঘের মধ্যে, বিভেদটাই স্পষ্ট হতে দেখেছি। পরস্পরের মধ্যে ভাবের মিলনটি যেন সংঘটিত হতে পারেনি। মতান্তরের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার তো কোন কারণ নেই। তাই মনে হয়, সে ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে পূর্ণ মিলনটি হয়নি। অথচ প্রত্যেকেই নিজমতের প্রতি একনিষ্ঠ।

এরই প্রতিক্রিয়ায় বোধকরি এ দেশেও এক ভাবের ঢেউ এসে পড়ে যে, মানুষকে ভালবেসে মানুষের হিতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই শ্রেয়। সেই শ্রেয়ের পথে ভগবানকে বাদ দিলেও বুঝি কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সে ভাবে প্রেমের সার্থকতা হয় না, কাজেই সে সেবাকর্মও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আবার সকলের ভাল করতে গিয়ে নিজের অহং এমনভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে পারে যে, নীতিবোধের দোহাই দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তে হয়। অধুনা রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্যাগী নেতাদের পর্যন্ত কি করুণ পরিণতিই না লক্ষ্য করা যায়। তাই ভগবান স্বয়ং যেভাবে ভালবাসেন, তাঁর হৃদয় ধ্যান করে তাতে মিলিত হয়ে নিজেকে একেবারে গলিয়ে দিয়ে যদি ভালবাসাই হয়ে যেতে পারি, তখন

নিজের মধ্যেই তাঁর সেই মাধ্বীধারাটির উৎস খুলে যেতে দেখব। তাই বলা হয়েছে একাগ্র ভূমির প্রেম নিয়ে উজানে গিয়ে নিরুদ্ধ ভূমির প্রেমরসে নিজকে হারিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে। একাগ্রতার ফলে বহুমুখী চিত্তবৃত্তিগুলিই গভীরে প্রবেশ করে নাস্তিবৎ এক শূন্যতায় প্রেমসমাধিতে মগ্ন হয়ে যায়। এই ভাবেই পরমপুরুষের বুকে প্রকৃতি আত্মহারা হয়ে চলে পড়ে যেমন করে কালিদাসের চিত্রে তপস্বিনী উমার প্রেমকে দেখানো হয়েছে। আবার উমাই শিবের হৃদয়, শিবের ভালবাসা। আত্মারামের মহাশূন্য আকাশ-হৃদয় তো প্রকৃতির প্রেমেই আত্মহারা—সে এক মহাসমাধিমগ্ন মৌন অথচ প্রেমনিবিড় অমৃত স্বলসিত রস। এই পরমপুরুষ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই বিশ্বজগৎকে আকর্ষণ করেন প্রেমের শক্তিতে। কৃষ্ণের আকর্ষণে তাই গোপীচিত্ত উতলা হয়ে ছুটে যায়, তাঁর প্রেমে আত্মনিবেদন না করে সে পারে না। কেননা আপূর্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ সেই ভালবাসাই তো গোপীকে সম্মুখে এনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরই পরমা প্রকৃতি রাধা। এই ভাবে পুরুষের প্রেমকে যেন আত্মারাম করে দেখানো হয়েছে—তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ থাকেন প্রেমে, আর প্রকৃতি তাঁর প্রেমেই তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। তাই তাঁরই প্রেমের আকর্ষণে তাঁর দিকে যে উজানে চলা—সেই ভাবকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন চৈত্য ভালবাসা (Psychic love)

এই চৈত্যভালবাসা অতুলন, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতিকে এখানে যেন ছোট মনে করা না হয়। পরমপুরুষের হৃদ্যসমুদ্রে নিঃশেষ আত্মসমর্পণে সেই ভালবাসাই অদ্বৈতনিবিড় প্রেমরসে গলে একাকার হয়ে যাবে। আর সে পর্যন্ত না যেতে পারলে প্রেমের ক্ষেত্রও যেন বুদ্ধিগত থেকে যায়। চৈত্যপুরুষের প্রেম বা চৈত্য ভালবাসা বুঝতে গেলে ডুবতে হবে অকূল সেই তত্ত্বে। প্রেমকে সমুদ্রের সঙ্গে একাকার করে দেখানো হয় তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। বেদে ও উপনিষদে এই প্রেমের তত্ত্বটি বিভিন্ন ভাবে উপস্থিত থাকলেও শ্রীঅরবিন্দদর্শনেই প্রথম এই আলোর মাধ্বীধারাটির এক পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের হৃদয়ে ভগবানের আবেশে তাঁরই একটি স্ফুলিঙ্গ চিৎ-কণরূপে অধিষ্ঠিত, আর সেই বিন্দুটিকে বেষ্টন করে এক জ্যোতির্ময় নীহারিকা ছন্দায়িত হয়ে চলেছে—এই হল চৈত্যপুরুষ। ছোট একটি পুরুষসত্তা যিনি দেহান্বিত শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন, তাঁকেই কঠোপনিষদ বলেছেন "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা ..."। তিনিই হলেন জীবের ভূতভব্যের ঈশান। এতদিন যা ছিলাম, যা হয়েছি ও যা হতে চলেছি, সব তাঁরই ঈশনায়। শ্রীঅরবিন্দ এঁকে soul বলেও উল্লেখ করেছেন। জীবন-রসের এই রসিক পুরুষটিই সরস বিরস সব রকমের অঘটন ঘটিয়েও রসাস্বাদন করে থাকেন। চিত্তে যখন হাসি-কান্না সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু, এইরকম যুগ্মরসের দোলায় সমান রস উচ্ছলিত হতে দেখব, তখনই বুঝতে হবে চৈত্যপুরুষ সম্মুখে। কবির ভাষায় "দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে," তাঁকেই বলা হয়েছে। সুখের আবেশে রসিয়ে উঠি, এটা বুঝে নেওয়া সহজ; কিন্তু ঘোর

বিপদের মধ্যেও তাঁর হাসিমুখটি দেখে তাঁকে চিনে নিতে হয়। বৈষ্ণব কবি বলেছেন "কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।" তাঁর ভালবাসায় এই ঘর্ষণের বেদনাও রূপান্তরিত হয় আনন্দে, রসে।

শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় এই প্রাকৃত জীবনেই স্বাভাবিকভাবে চৈত্যপুরুষ সামনে আসেন, তা আমরা জেনেছি। তখন জীবন যেন সুন্দর একটি স্বপ্নে লঘু হয়ে ভেসে চলে। কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে হয় না। চেতনায় মালিন্য এলেও ধূলি ঝেড়ে ফেলার মত সহজেই তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। জীবনে প্রেমের ফুল সহজেই ফুটে উঠতে পারে; আর আদর্শের প্রতি অনুরাগ, বীর পূজা (hero-worship), এই সকল বিভিন্ন রূপে সেই চৈত্যসত্তাকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কৈশোরের সরল বিশ্বাসে, বুদ্ধিতেও প্রতিভার ছাপ বিকশিত হতে দেখা যায়। তাকে যদি দেহ প্রাণ মনের অশুদ্ধি থেকে মুক্ত রাখা যায়, তবেই সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার শক্তি অর্জন করে মেধাবী হওয়া যায়। ষোল বৎসর বয়সকে অধ্যাত্মজীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলা হয়েছে। উপনিষদের সৌম্য পুরুষ ষোড়শকল। তন্ত্রের শক্তি নিত্যা ষোড়শী। চন্দ্রের কলার ক্ষয় ও বৃদ্ধি পঞ্চদশ কলায়, তারই অক্ষয় সৌন্দর্য ও মধুর রূপটি আধ্যাত্মিক ভাবনায় ষোড়শ কলার নিত্যপূর্ণ। কৈশোরের আনন্দময় চেতনাকে জীবনে যদি ষোড়শ কলায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত করেই সম্মুখে রাখা যেতে পারত, দিব্যজীবনও তাহলে সহজে লাভ করা যেত। কিন্তু বয়সের অতিজ্ঞতায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করে আমরা সেই স্বপ্নের সৌরভ ও আবেগের দীপ্তি জীবনে হারিয়ে ফেলি। বিষয়-বিষ বিকারে চিত্ত মলিন ও বিকৃত হয়ে পড়ে—এই হল জীবনের অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পতিতা" কবিতায় পতিতার কণ্ঠে এই নিষ্ঠুর সত্যটি শুনিয়েছেন, "নগরের ধূলি লেগেছে নয়নে, আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?"

শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে চেতনার স্তরবিন্যাস করেছেন, তাতে চৈত্য-সত্তার স্থান মনের আগে প্রাণের পরেই। সৎ চিৎ আনন্দ অতিমানস (বিজ্ঞান) ঊর্ধ্বলোকের স্তরে, যাকে বলা হয় পরার্ধ। আর অপরার্ধে দেহ প্রাণ চৈত্য ও মন, এইভাবে স্তরগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। আনন্দলোকের রসচেতনাই অবর লোকের চৈত্যসত্তায় প্রতিফলিত। আনন্দধামে আনন্দময় পুরুষ ও চৈত্যপুরুষ যেন মুখোমুখি হয়ে আছেন। দেহ প্রাণ ও মন তিনই মলিন হয়ে যায়, তাদের পরিশুদ্ধ করলে চৈত্যপুরুষ সম্মুখেই থেকে যান। বুদ্ধির শুদ্ধি ও রসসংশুদ্ধির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। প্রাণের শুদ্ধির জন্য প্রাণের উত্তালতাকে সংহত করতে হয়। কাচের চিমনি পরিয়ে যেমন অগ্নিশিখাকে শোভন ও সুদীপ্ত করে জ্বালাতে হয়, তেমনি করে প্রাণের এই উত্তালতাকে স্বচ্ছ নির্মল আলোর আবরণে রক্ষা করে এক-মুখী ঊর্ধ্বশিখ করতে হবে। এই ভাবে প্রাণাগ্নির প্রজ্বলন শুদ্ধপ্রাণের লক্ষণ। এই

অধুনক জ্যোতি প্রাণস্পন্দেরই, কিন্তু তাতে কামহত বাসনার উত্তালতার মালিন্য নেই। ইন্দ্রিয়শক্তিকে এইরকম করে মূল প্রাণশক্তির প্রশাসনে আনতে পারলে, চিত্ত আর বানচাল হতে পারে না।

পরিশেষে দেহের শুদ্ধির কথাও এ প্রসঙ্গে তুলতে হয়। দেহের জড়ত্ব এক ভারের মত যোগবিঘ্ন ঘটিয়ে চৈত্যপুরুষকে আড়াল করতে পারে। আলস্য প্রমাদ এই সব বৃত্তি-গুলি তমোগুণ থেকে উদ্ভূত; এই জড়ত্বকে যথাসম্ভব লঘু করতে হবে। আহার-শুদ্ধি তার এক প্রধান উপায়। উপনিষদ বলেছেন, "আহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা-স্মৃতিঃ"...ইত্যাদি। এর অর্থ হল, আহারের শুদ্ধি থেকে সত্বশুদ্ধি হতে থাকে, আর সত্বশুদ্ধির ফলে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করা যায়। তখন আর জড়ের বাঁধন বেঁধে রাখতে পারেনা। অবশ্যই এ আহার শুধু দেহের অন্ন বোঝাচ্ছে না। প্রাণের ও মনের অন্নকেও শুদ্ধ করে আহরণ করতে হয়। আহার সংযমনের গুরুত্ব সম্বন্ধে গীতাও বলেছেন "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু...।" আহার বিহার কর্ম চেষ্টা নিদ্রা জাগরণ সবই যোগযুক্ত করতে হবে। Mother বলেছেন, আদর্শ দেহ হবে শিশুর দেহের মত, তেমনি সহজ স্বচ্ছ নমনীয় ও আনন্দময়। তাতে দেহের সঙ্গে প্রাণের ও মনের বিরোধ ঘুচে যাবে ও তারা চৈত্যপুরুষকে আর আবৃত করে রাখতে পারবে না। এই হল দেহশুদ্ধির ফল। তাহলে চৈত্যপুরুষকে জাগ্রত দিশারী করতে হলে চাই—শিশুর সুস্থ সুগঠিত দেহ, কিশোরের উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তি ও তরুণের প্রদীপ্ত মন।

একাগ্রতার সাধন করতে বলা হয় হৃদয়ে, হৃদিস্থিত চৈত্যপুরুষ গহ্বরেষ্ঠ হয়ে হৃদয়পুরে শয়ান; তাঁকে জাগাতে হলে ঐকান্তিক একাগ্র হয়ে চেতনাকে সংহত করা চাই। কিন্তু প্রাণের ও মনের অবর স্তর-বিন্যাসে বা কামনাবাসনার বিক্ষোভের মধ্যে ডুবে একাগ্র হলে চৈত্যপুরুষকে বোঝা যাবে না। এ একাগ্রতা যোগভূমির, কাজেই দেহ প্রাণ মন অতিক্রম করে বিজ্ঞানেই সে শক্তি নিহিত, এই বিচারটি সাধনার সময়ে থাকা আবশ্যক। তাই প্রজ্ঞার কর্মের সাধনায় ও পূর্বে ঈশ্বরভাবনায় অনন্ত বিরাট জ্যোতিঃসত্তার ধ্যানের যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সচ্চিদানন্দসমুদ্রে মীনের মত বিচরণ করা—এই ভূমির একাগ্রতার অনুশীলনটি সর্বদাই ধরে থাকা চাই। সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ ব্রহ্ম—এই ভূমি থেকে কোন কারণেই একাগ্রতা স্খলিত হতে না পারে, এই হল ভূমির একাগ্রতার সাধন। সেই অনন্ত আকাশ আনন্দ হয়ে সর্বতোভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আলোর মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল তাঁর প্রকাশ। তাঁর সেই সুখস্পর্শে আমার অহং-এর অন্তরালে গোপীচিত্ত ব্যাপ্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সেই তাঁর নীলাকাশের আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছে আমার মন। একাগ্রতার সাধন এইভাবে করলে উপলব্ধি করতে পারব, তিনিই অপিধান ও

উপস্তরণ হয়ে আবার ওই গোপীচিত্তের আকূতিবিস্পৃটিকে বুকার মত ধারণ করে আছেন। সেই প্রেমের আলোয় দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এইভাবের ঐকান্তিক একাগ্রতা ও ভূমির একাগ্রতা একসঙ্গে সহজে সিদ্ধ হতে পারেনা। এজন্য দুদিক থেকেই সহযোগিতা চাই। সাধকের দিক থেকে থাকা চাই অভীপ্সা—যাতে অনন্ত বিরহের ভারে চিত্ত আবিত হয়ে থাকে; আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রসাদ—বুদ্ধসংস্পর্শ। "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা", এই রকম ব্যাকুলতা তীব্র না হলে, চৈত্যপুরুষ অগ্রসর হয়ে আসেননি বুঝতে হবে। পরিবার দেশ মানবসমাজ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আসক্তি চলে গিয়ে, সর্বহারা অন্তরাত্মার আকুলতা উদ্বেল হয়ে বলে, "শুধু তোমাকেই চাই।" এই ভক্তির বীর্য না আসা পর্যন্ত বুঝতে হবে ভগবৎ-তৃষ্ণা ঠিক মত পুষ্ট হয়নি। সেই বিরহের আগুনে চিত্ত গৈরিক হয়ে অনন্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তখন জীবে সেবা করেও ঈশ্বরসেবার মাধুরী ও তৃপ্তি মেলে না। শূন্য চিত্ত পূর্ণ হয় প্রেমে, তাঁরই প্রসাদে। আর সেই সিদ্ধির পরে আসে ঈশ্বর হয়ে জীবের সেবা। তখনই প্রেমের কর্মে সেবার মাধুর্যে আত্মা প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

আমরা চৈত্যপুরুষকে চিনতে গিয়ে প্রকৃতির সাধনাকে গোপীচিত্ত বা নারীর হৃদয় দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। বাগদত্তা কিশোরী একটি মেয়ে, সে জানে সে তাঁরই কাছে নিবেদিতা। তাই সে অন্য কারও দিকে ফিরতে পারে না; কোথাও তার চিত্ত বাঁধা পড়ে না। বিবাহের পর তার হল গোত্রান্তর, সে অকূলে ভাসল, একূলে আর ফিরতেই পারে না। পরম পতিকে দেখে কূল ছেড়ে কূলবতী স্রোতাপন্ন হয়ে ভেসেই চলে, তার সঙ্গে মিলনের জন্যই যা কিছু কর্ম। জগতের অন্য কোন সমস্যার ধার তার নেই, সে তাঁর লীলা-বাসরে প্রেমে নিমজ্জিত। আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রে ও রসাশ্রিত সাধনায় এই প্রেম-ভক্তির সৌন্দর্য অতুলনীয়; সায়ংসোৎফুল্ল মল্লিকার মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ করে তাকে মহাজনেরা কাব্যরসেও পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু এই রসের সাধনাতেই বহুক্ষেত্রে, অসংস্কৃত চিত্তের মত্ততাও বড় বেশি এসে পড়েছে। তাতে ওই উজ্জ্বলরসসর্বস্ব চিতে অনেক গহন গভীর গহ্বর সব মুখব্যাদান করে আছে, দেখা গেছে। মহাজনেরা সাধকদের রসোল্লাস নিয়ে প্রমত্ত ও অস্থির না হওয়ার জন্য বহু সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, তাঁদের জীবন-বেদে তার দৃষ্টান্তও দেখিয়ে গেছেন। প্রেমের ধর্ম তো শুধুই রসোল্লাস নয়, তা যে কর্মে সেবার মাধুরী হয়েও পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হবে। তাই ওই কিশোরী মেয়েটিকে দেখি, সে-ই যেন দিনে ঈশ্বরী আর রাতে অপ্সরী। এইভাবে রাত্রির কাব্য ও দিনের কাব্য দুভাবেই ওই কবিপ্রিয়াকে দেখতে পাই। এই মেয়ে যখন জননী, তখন তার রূপ রূপান্তর। পুরুষের বীর্যে ঈশানী মা আবার তখন ভাবয়িত্রী। এমনি করে সবার জন্য তখন আবার প্রাণ খুলে যাবে প্রেমে; আর রূপান্তরিত চেতনায় ধরণীর বুকভরা ভালবাসা

নিয়ে দশভুজার মত কাজ করে চলে যে ওই কিশোরী মেয়েটিই। এইভাবে চৈত্য রূপান্তরকে (Psychicisation) নারী-চিত্ত দিয়ে দেখান হল। দু' ভাবেই একে দেখতে পারি, আবার একের মধ্যেই প্রকৃতি-পুরুষ ভাগ করেও দুভাবে দেখা যায়। যে ভাবেই হোক, চৈত্য ভালবাসাকে যেমন তুলে নিতে হয় চিন্ময় ভালবাসায়—সব কিছুর উর্ধ্বে, আবার সেই ভালবাসার পরমা শক্তিকেই নামিয়ে এনে কর্মযোগে প্রযুক্ত করতে হবে, আর তবেই কর্ম দিব্য হয়ে উঠবে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে প্রকৃতিকে অপরা পরা ও পরমা এই ক্রমে চিনিয়েছেন। সবই তাঁর স্বীয়া প্রকৃতির বিভঙ্গ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চিরকৈশোর লীলা—একদিকে যেমন দিনের আলোয় সখাদের সঙ্গে গোচারণ, অপরদিকে জ্যোৎস্না রাত্রে সখিদের সঙ্গে রাসের মিলন। কালের রাখাল তিনি আমাদের গোপাল। আমাদের প্রাণ হল পশু—পশবঃ বৈ প্রাণাঃ। সেই পশুপ্রাণ আলোর পিপাসী হলেই হয় গো। সকালে গোষ্ঠের আগড় খুলে সেই গোযূথ নিয়ে তিনি রাখাল হয়ে চলেন, আবার সন্ধ্যায় তাদের গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনেন। এই রকম করেই প্রাণগোপাল গো-চালনা করেন। এই প্রাণেরই উন্নততর চেতনায় অর্জুন তাঁর সখা, আর তিনি তার সারথি। কুরুক্ষেত্রের প্রকৃতি যাজ্ঞসেনী তাঁর সখী, সে সখ্যও অপূর্ব। রামকৃষ্ণদেব বলতেন বার বছরের বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ের মত হতে চান। কি সেই বাল-বিধবার আভিজাত্য! তার ভালবাসার কৌলীন্য থেকে তাকে কেউ টলাতে পারে না। সেই রকম সখীর ভালবাসা বীর্যবতী হলে পাই যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে। তিনিই মহাভারতের মহাসমরের নায়িকা, নেপথ্যে ওই যুদ্ধের পরিচালিকা। সেখানে যুদ্ধ করছেন অর্জুন-কৃষ্ণ, যুদ্ধের সারথি বাসুদেব কৃষ্ণ আর যুদ্ধের কারণ যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা। দিনের প্রখর আলোয় প্রকৃতিকে যেমন সখ্যরসে এই যুদ্ধের চিত্রে দেখা গেল, সেই রকম রসচেতনা নিবিড় হলে আবার পাই বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীকে। এ সবই চৈত্যপুরুষের (psychic being) লীলা। তিনি দেহপুরে জাগ্রত হলে এই ভাবেই লীলারসে ও কর্মের বীর্যে স্ফুরিত হয়ে চলেন। মূলে সেই পুরুষোত্তম—তিনিই নারীচিত্ত পুরুষচিত্ত দুয়েরই নায়ক ও ধারক। এই দুইকে অবলম্বন করেই চৈত্য ভালবাসা (psychic love)। সে ভালবাসায় দুই-ই এক, দুই-এ মিলে এক ; দুই-এর প্রত্যেক এক হয়েও দুই মিলে লীলারস আস্বাদন করে পুষ্ট করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাবে আমরা একই তত্ত্বকে জ্ঞান ও প্রেম দুই ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছি। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয় এই দুই প্রধান বৃত্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সব কিছু জেনে সব ছাপিয়ে লোকোত্তরে হারিয়ে যাওয়াকে জ্ঞানের চরম ভূমি বলে জেনেছি। সেই লোকোত্তরের সর্বনাশা জ্ঞান যেমন রয়েছে অধিষ্ঠান হয়ে, তেমনি তাকেই আবার নেমে আসতে হয়েছে সৃষ্টিতে অণুরও অণিয়ান, মহতেরও মহীয়ান্

সব কিছু প্রকাশের মূলে। বিশ্বমূল তত্ত্বই বিশ্বাতীত। জিজ্ঞাসা যখন জাগে, তার পিছনে ধাওয়া করে দেখা যায় অজানা হয়ে থাকাই তাঁর স্বভাব, তিনি যেন সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে আছেন। এই পরম পুরুষের প্রকৃতিই তাঁর পরম প্রেমস্বরূপ। পুরুষের আনন্দ রসসৃষ্টির মূলে, তাঁর অনন্ত প্রেমের অবতরণেই এই রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তি চিদানন্দ-স্বরূপ। এ তো শুধু বিচারে ও ভাবে বুঝলে হবে না, তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হবে। তাই জানতে সাধ যায় না কি—কি সেই পরম জ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে পরম প্রেমের দিব্য আহুতি সম্ভব হয়েছে? আর সেই ভাবের দিব্যকর্ম তো আমাদেরও কর্মযোগের লক্ষ্য।

সাংখ্য বলেন জ্ঞান অনন্ত জ্ঞেয় অল্প। একটা ঘাসের শিসকেও কি আমরা পরিপূর্ণ ভাবে জানতে পেরেছি, বলতে পারি? প্রতিটি সীমিত জ্ঞানকে ধরে আছে অখণ্ড সমগ্র জ্ঞান। সেই অসীম অনন্তের বোধে প্রতিভান উদিত হয়। অনুভাব আবেশ এইভাবে চেতনায় তার ক্রিয়া। ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে হাট করে, তাঁর নিত্যপ্রকাশ সেই আলোকে পরিপূর্ণভাবে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে পেয়ে তবে জানতে হয়। তিনি অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত তাঁকে জানার বিভাবও অনন্ত। রূপে রূপে প্রতি রূপে তাঁকে জানতে গিয়ে তাঁর মূর্তিকে দেহ দিয়ে না জানতে পারলে জানাও পূর্ণ হয় না। তিনি সচ্চিদানন্দময়—আত্মার এক হয়ে একাকার হয়ে তাঁকে যেমন জানতে হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহরূপেও তো তাঁকে জানতে হবে। তাই বলা যায় যেমন লোকাতীত জ্ঞান আছে, তেমনি লোকাতত লোকে লোকে লোকী—এই সব রূপে একই সঙ্গে তাঁকে জানতে হবে। এ হল ভালবেসে জানা ও পাওয়ার কথা। সে জানাতেও দেহাতীত হয়ে উত্তিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে জেনে, আবার স্বভাবের নিয়মেই দেহের অভ্যন্তরে তাঁরই কল্যাণতম রূপটি দেখে বিস্মিত হতে হয়—এই যে বিগ্রহের মধ্যে তিনি অপরূপ, এ রূপ যে চেয়ে দেখবার মত। এ তো আগে জানিনি। এ জানা আর ফুরায় না। কাজেই জ্ঞানের সাধনা আর প্রেমের সাধনা পরস্পর বিরোধীও নয়। কখনও কোনটা আগে বা কোনটা পরে, এ ভাবেও সাধনায় আসতে পারে।

প্রাকৃত জীবনের এই ভালবাসাকেই তুলে নিতে হবে রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসায়, শিব-সতীর ভালবাসায়, আর মুক্তিই তার ধর্ম। প্রেম খোঁজে ত্যাগ, তাই সংসারে আবদ্ধ ভালবাসায় সাধারণত তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এক আদর্শ সামনে রেখে যখন ভালবাসতে চাই, তখন সে-ই আবার ভগবান। আমার বৃহত্তর রূপ ও পরিকল্পনা নিয়ে ভালবেসে তাঁকে সবই দিয়ে দিতে চাই। তিনি লোভী নন লোলুপ নন, তিনি তা গ্রহণ করে আমাকেই ধন্য করেন। তাই আমার পূজা আমার কর্ম, এই ভাবে সব ঢেলে ত্যাগে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয়ে থাকে। এই ভূমানন্দ ভালবাসার আদান প্রদান সংসারে চালাতে পারলে দিব্য-

জীবনের পথ কত সুগম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা সম্ভূত হয়েও যেন সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। শতকরা নিরনব্বইজন লোকই ভালবাসা পেয়ে ভালবেসে স্বার্থপর হয়ে ওঠে, অহন্তা ফেঁপে ওঠে। শিশুর পবিত্র ভালবাসা, শিশুর প্রতি মায়ের ভালবাসা—সেখানেও এক অহন্তার বোধ এসে ভালবেসে সন্তাকে গ্রাস করে রাখতে চায়। সেবাব্রত নিয়ে কর্মকে বিস্তৃত করেও দলাদলি খাইখাই ভাবের থেকে রেহাই মেলে না। তারপর দেখা যায়, এরই মধ্য থেকে বৈরাগ্য আসে, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় চিত্তে এক বিস্ফারণ ঘটে। তখন সন্তানের জন্য ত্যাগ প্রিয়ের জন্য আত্মবিসর্জন এ সব দেখা দেয়। তাকে যোগ করে তুলতে হবে বিশুদ্ধ করে। প্রথম দিকে সংসারের সঙ্গে ভাগবত ভাবের একটা বিরোধ লাগেই, তখন আমরা আশ্রম মঠ মহাপুরুষ-সঙ্গ এইসব খুঁজি। একাগ্রতার সাধন পেয়েও সমন্বয় করা সহজ হয় না। দেখা যায় ভগবান ভালবাসা, সে সহজ নয় কঠিন তার সাধন। কিন্তু উপাসনা করে তাকে কিছুটা আয়ত্ত করতে পারি। সংসারে থেকেও কিছুটা সময় চিত্তকে বশী করে একাগ্র করার সাধন সাধতে হয়। বিগ্রহের উপাসনাতেও ভগবানকে ভালবাসার স্বাদ পেয়ে ভালবাসার তুরভূমি সহজে অধিগত হতে পারে। এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণদেব দেখিয়েছেন তাঁর ভবতারিণীর বিগ্রহ-উপাসনায়।

কিন্তু সেও কি সাধারণ লোকের কাছে সহজ হয়? তামসিক উপাসনার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ রাগ করেই বলেছেন যে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?...মানুষকেই ভালবাসতে শিখলি না, ঈশ্বরকে ভালবাসবি কি করে?" আবার মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে ক্রমে এই ভাবই আসতে হবে "আগে কহ আর"। কোথায় সেই মনের মানুষ? তখন চিত্তে নির্বেদ এসে ব্যাপ্তিচৈতন্যে চিত্ত প্রসারিত হয়ে শূন্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু চিত্ত পাষাণের মত নীরস হয়ে গেল, রসের উৎস খুললই না এরকম যদি হয়, তাকে কোন মতেই সিদ্ধ অবস্থা বলা চলে না। শূন্য হয়ে পূর্ণও হতে হয়, মূলে গিয়ে রসের উৎসটি ধরতে পারলে, পুরুষ-প্রকৃতির ভালবাসা ও তাথেকে জগৎ-সংসারকে ভালবাসার স্বরূপটি ধরা যায়। এ তো আর কোন ফর্মুলা (formula) করে বোঝা যাবে না, এক রহস্যপূর্ণ অনুভবই তার সন্ধান দেয়। ভালবাসা এক বিপুল যজ্ঞ, তার সাধনাও বড় কঠিন। উর্ধ্বমুখী দীপশিখার মত তার গতি হয়েও সব কিছু ভাসিয়ে তা টলমল করে দেয়। বহু রূপের মধ্যে সেই ভালবাসা এলেই তবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সার্থক হয়। সেই সোমধারার বর্ষণে এই মর্ত্য জীবও অমৃত হয়ে ওঠে। সে সত্যকে ঐকান্তিকরূপে পেতে হয় বিগ্রহে, তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপে, আবার সব মিলিয়ে

নিজের আত্মাতে। বলা যায়, অরূপ বহুরূপ অপরূপ—এসব মিলিয়েই তো তাঁর স্বরূপ। সব রকম করে সে ভালবাসার সত্যকে না বুঝলে প্রেমের কর্ম প্রাণের কর্ম আর প্রজ্ঞার কর্ম সুসমঞ্জস হবে কেমন করে?

তাহলে প্রেমের কর্ম সাধনা করতে কি পেলাম? সর্বজীবে ভগবান—এই শিবজ্ঞানে সে কর্ম সম্পন্ন হবে। রামকৃষ্ণদেব যে বলতেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করতে, এও সেই রকম। এই বোধ নিবিড় হয়ে যখন অন্তর্মুখী হল, তখন বাহিরের ফলিত কর্ম এক প্রতীকের মতন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিমায় বা বিগ্রহে যাকে যেমন দেখি, সেই রকম সব কর্মে সেই আদর্শের (vision) অনুষ্ঠান। কিন্তু ভালবেসে সেবা করতে গিয়ে, মানুষের কাছ থেকে সেই অন্তরের আদর্শ রূপটি বারবার ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়। তবুও মানতে হবে তিনিই তো সব রূপ ধরে এসেছেন। এ বড় কঠিন কর্ম কিন্তু কঠিন সত্য। সাধক রামপ্রসাদের জীবনে মা-ই তো কন্যার রূপ ধরে বেড়া বেঁধে পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। এই আটপৌরে জীবনের খাওয়া পরার মধ্যেও তাঁর কত বিভূতিই প্রকাশ করেন তাঁর অপার করুণার, মানুষের প্রেমে। সেই সর্বনাশা মেয়েটি না পারে কি? মা হয়ে কন্যা হয়ে জায়া হয়ে সহোদরা হয়ে কি খেলাই খেলে চলেছেন। এই ভূতভাবন দক্ষযজ্ঞ কি তাঁরই খেলা নয়? এরকম দেখতে পেলে ছোট ও বড় সব রকম কর্মেই রূপ দর্শন (vision) সার্থক হয়ে উঠবে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা উচ্চকোটির সাধকের। কিন্তু যথার্থ এই ভাবটুকু সম্বল না হলে, প্রতীক পূজার মত কর্ম যন্ত্র হয়ে উঠবে কেমন করে? ভালবাসার যজ্ঞকর্ম শূন্যে শূন্যে আদান-প্রদান নয়। প্রত্যেক কর্মে ও ব্যবহারে এক নিগূঢ় শুদ্ধ রসের সম্পর্ক। আমাকে তোমার মত করে দেব, আবার তোমাকেও আমার মত করে পাব, এই অন্যোন্য ভাববিলাসের বহু রকমের রূপবৈচিত্র্য। আর এই দিব্য বিলাসকে ধরে আছে যোগিনী হৃদয় বা তার আদিত্যহৃদয়। সেই বিরাট জ্ঞানাত্মা পুরুষেরই নিত্যকর্মযোগ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তাই তো আমার প্রতীকপূজা। তবে প্রতীকে মনটা বাঁধা পড়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তাহলে তাঁকে পেতে হবে তিন ভাবেই, জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে। আর সাযুজ্যের জ্ঞান গভীরে রেখে তাঁর ভালবাসাকেই পূজায় ফলিত করতে হবে কর্মযোগে। চৈত্য-পুরুষই ভগবানকে ভালবাসার পথ দেখিয়ে দেবেন, আর তাতে প্রকৃতিও চৈত্যভালবাসায় রূপান্তরিত হবে। সে ভালবাসায় লালসা নেই, কিন্তু সংসারের ভোগজীবন তাকে লালসার পঙ্কে টেনে আটকে রাখতে চায়। সেজন্য শক্তির সাধনা চাই। তাই চৈত্যভালবাসাকে তুলে নিতে হবে আত্মার মহিমময় ভালবাসায় (Spiritual Love)। তা না হওয়া পর্যন্ত অবর লোকের অনেক বিকৃতিই ভালবাসার মুখোস পরে এসে দাঁড়ায় ও আদর্শচ্যুত করতে পারে। অবচেতনের গহনে কামনা-বাসনাগুলি জট পাকিয়ে (complex)

থাকে। তা অনেক সময় সাধককে বিভ্রান্ত করে। তখন প্রেমের শুদ্ধ ভাববিলাস স্বভাবে থাকে না, তা থেকে বিস্মৃতি ও প্রশান্তি হারিয়ে ভালবাসা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তারই শক্ত বনিয়াদ করে নিরুদ্ধ ভূমির ভালবাসাকে দেখিয়েছি। কুমারসম্ভব কাব্যে মদনদহন করে একাগ্রভূমির ভালবাসাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যোগীর নিরুদ্ধভূমিতে। কাম দগ্ধ না হলে প্রেমের উজ্জীবন হয় না। আর তাই হলে তবেই উমা শিবের অঙ্কশায়িনী। অতনু হয়ে সঞ্জীবিত হতে হবে সর্বতনুতে। এই রুদ্রগ্রন্থিটি পেরিয়ে চৈত্যপুরুষের ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধ হয়। সর্বভাবের সমাহারে আত্মা ও তনু এক হয়ে যাবে। গভীরে অতনু থেকে শিবের সেই ভালবাসা—আত্মারামের আত্মহারা ভালবাসা, মৃত্যুকে পেরিয়ে তার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দাম চঞ্চলতে দুর্বার তার গতিবেগ আর গভীরে থাকে অতল শান্তি। শ্রীঅরবিন্দ প্রেমের পরিপূর্ণ রূপটিকে অতিমানসী প্রেম (Supramental Love) বলে অভিহিত করেছেন। গম্ভীরায় চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের অদ্ভুত বিবরণে তার কিছুটা আভাস যদি পাওয়া যায়, না হলে মননে বা ভাষায় তাকে রূপ দিতে পারি সে সাধ্য কি! চৈত্যপুরুষের জাগৃতিতে দিব্যকর্মযোগে আহৃত হলে সে শক্তিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তার জন্য ভাবসংশুদ্ধির সাধনে গভীরে চাই শান্তির প্রতিষ্ঠা—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সে যেন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে ধ্যানের গভীর নিথরতা, উর্ধ্বে বৃহতে ব্যাপ্ত অনন্ত প্রশান্ত আকাশ। আর তারই মধ্যে চলেছে বহু বিচিত্র তরঙ্গের উল্লাসিত লীলায়ন—শিবশক্তির সামরস্যে বিলসিত উল্লাসের বিসৃষ্টি।

(ক্রমশ)

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

জুন ১০, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"বিরোধী শক্তির আক্রমণ অনিবার্য ওগুলোকে তোমার গন্তব্য পথের পরীক্ষা জেনে অকুতোভয়ে অতিক্রম করে যেতে হবে। সংগ্রাম কঠিনও হতে পারে, কিন্তু যখন তার থেকে বেরিয়ে আসবে তখন দেখবে যে ওতে তোমার কিছু লাভই হয়েছে, এক ধাপ এগিয়ে গেছ। তা ছাড়া এই সব বিরোধী শক্তির অস্তিত্বের কিছু প্রয়োজনও আছে। ওদের দ্বারাই তোমার সংকল্প আরো সুদৃঢ় হয়, আশ্রদ্ধা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। তবে একথাও ভুল নয় যে, তুমি ওদের সুযোগ দাও বলেই ওরা আসে। যতক্ষণ তোমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তাদের কথার সাড়া দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথা গলিয়ে ঢোকা ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমার ভিতরের কোনো অংশই তাদের আবাহন না দেয়, তোমার প্রকৃতির কোনো অংশকেই যদি তারা দখল করতে না পারে তখন তারা আপনিই ছেড়ে চলে যাবে।"

কিন্তু আমি যখন একবার একটা বিরোধী শক্তির আক্রমণকে অতিক্রম করে এসেছি তখন আবার কেন সেই একই শক্তির দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হই ?

উত্তর কারণ ভিতরে নিশ্চয় কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে যে ভিতরে কিছুমাত্র তার অনুকূল জিনিস থাকলে, তা যতই কেন সামান্য হোক, সেখানে বিরোধী শক্তি আবার আসবেই। এমন একটা আকর্ষণ থাকে, অসঙ্গতি বা অপূর্ণতার দিক দিয়ে এমন একটা মিল থাকে, যার টানে বিরোধী শক্তি আস্কারা পেয়ে যায়। আক্রমণ এলে অবশ্য তুমি অবিচল থেকে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারো, কিন্তু তাতেই তোমার সেই সামান্য অনুকূল অংশটুকু দূর হয়না, তাতেই সে আক্রমণ আবারও ফিরে আসতে পারে।

তোমার মধ্যে রয়েছে কিছু তার আকর্ষণী, যেমন ধরো হতাশার ক্রিয়া, (যা খুবই সাধারণ), তার ঢেউ উঠে তোমাকে হতাশ করে ফেলে : তখন আর তোমার কোনো আশা থাকেনা, আস্থা থাকেনা, মনে হয় যে তুমি কিছুই আর করতে পারবে না, তোমাকে তাতে একদম পেড়ে ফেলে দেয় ; তার মানে তোমার প্রাণসত্তাতে লুকিয়ে আছে কিছু অহং, কিছু আত্মগর্ব, সে চায় একটু নাড়াচাড়া। সে যেন ইঙ্গিত করে ওকে ডাকে, "চলে এসো, দরজা আছে খোলা।" অমনি অন্য একটা অংশ সেটা স্পষ্ট লক্ষ্য করে, তখন এই অংশ

জোর করে ওকে প্রত্যাখ্যান করে বলে "চাইনা, চাইনা ওকে, ও সত্য কিছু নয়," এই বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেই তোমার ভিতরকার ঐ ত্রুটি ঘুচল না। অতএব তোমাকে আপন গভীরে প্রবেশ করে সেই জিনিসকে নির্মূল করতে হবে খুব ধৈর্যের সঙ্গে, যেন আদৌ সে আর ওরূপ কোনো সুযোগ দিতে না পারে। এ কাজে পুরোপুরি সফল না হওয়া পর্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ আসবেই। একটা বলের মতো তুমি তাকে ঠেলে দিলেও আবার সে গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরে আসবে; তাকে আবার ঠেলে দেবে, আবার সে আসবে; ঐ আকর্ষণটুকু না থাকলে তখন আর সে আসবে না।

সুতরাং যখনই কোনো বিরোধী শক্তির আক্রমণ আসবে, তখন সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন এই কথা বলা "হাঁ, বাইরের থেকেই এটা এসেছে বটে, কিন্তু আমার নিজের প্রকৃতিতে নিশ্চয় কোথাও তাতে সায় ছিল, নতুবা এটা আসতে পারত না। আমাকে এখন দেখতে হবে যে নিজের মধ্যে তেমন কোন ত্রুটি লুকিয়ে আছে, তাকেই আগে ঘোচাতে বা বদলাতে বা তার উপর চেতনার দীপ্তি এনে ফেলতে হবে, যাতে ও জিনিস আমার মধ্যে আর না থাকে।"...

উপায় কিছু আছেই, নয় কি? বিরোধী শক্তি যখন হামলা করে তখন ভিতরের সহায়ক জিনিসটা আও বাড়িয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিলে যায়। তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে কিংবা ছট্‌ফট্ না ক'রে যদি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করো যে নিজের মধ্যে কোথায় স্পন্দন জেগেছে (একরকম খুট্‌খুট্ শব্দ হয় আর যেন বলে আবার একটা আসছে), তাহলে তাকে ধরে ফেলতে পারবে। তাকেই ধরে বলবে: "যাও, তোমার বন্ধুদের নিয়ে তুমিও সরে পড়ো, তোমাকে আমার দরকার নেই।" দুইই তখন একসঙ্গে সরে যাবে, আক্রমণকারী ও তার আকর্ষণকারী; এতেই তুমি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবে।

এরজন্যে খুব বেশি সজাগ থাকা চাই আর কিছু সাহসী হওয়া চাই, যাতে দুই মুষ্টিতে ধরে তাকে উপড়ে বের করে দিতে পারো—যদিও তাতে কিছু ব্যথা লাগে—তবু তাকে যথাসাধ্য জোরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তবেই তা নিঃশেষ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ বারেবারেই আসবে। আর ধৈর্য ধরে সজাগ ও সাহসী হয়ে না থাকলে চার পাঁচটা আক্রমণের পরেই তুমি এলিয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বলবে: "খুব হয়েছে, আর সওয়া যাচ্ছে না।" তখন বিরোধী শক্তি পুরোদমে তার কাজ করতে থাকবে; হয়তো দেখবে যে জিতে যাওয়াতে তার আনোদ হচ্ছে, সে হাসছে। তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে খুবই বেগ পেতে হবে। কিন্তু যদি নিজের দিকে লক্ষ্য রেখে বলো "যে জিনিস এটা হতে দিচ্ছে তাকে আমি ধরবোই", তখন দেখতে পাবে যে কোন জিনিসটা উস্‌খুস্ করে সেই অশুভশক্তির নাগাল পেতে চাইছে। তখনই সবসমেত ছুঁড়ে ফেলতে পারা চাই।

প্রশ্ন কিন্তু ছুঁড়ে ফেললেও যে সেই শক্তি মরেনা। এ জগতে থেকেই যায়, আর ফের অন্য কোথাও ঢুকে যেতে পারে তো?

উত্তর ঠিক কথা, জগতের মধ্যেই থেকে সে অন্য কোথাও মাথা গলাবেই যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো আধ্যাত্মিক ও গুহ্য শক্তিসম্পন্ন মানুষের হাতে না পড়ে যে তাকে একেবারে নাশ করতে পারে, কিন্তু তা খুবই কঠিন কাজ। তেমন বলশালী ও জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার যে অমন দানবীয় শক্তিকে লুপ্ত করে দিতে পারে,—যখন তার অস্তিত্বের কিছু কারণ রয়েছে (কমপক্ষে বলতে গেলে)—সেই কারণ ন্যায্য না হলেও একটা কারণ তো বটে। ওকে নষ্ট করা যায়; কিন্তু জগতে কারো মধ্যে একবার স্থান পেলে সেই ব্যক্তিই আবার তাকে গঠন দিয়ে আনে। প্রাণরাজ্যের ছোটো ছোটো বিরোধী শক্তিরা যখন মানুষকে আক্রমণ করে তখন তাদের আবহাওয়াতে সে চেপে বসে, অর্থাৎ তাদের দেহসত্তা সমেত সব কিছুকেই অধিকার করে। তাই যাকে তারা ধরে তাদের পক্ষে তাকে তাড়ানো খুবই কঠিন: তার জন্য কঠোর যোগের দরকার। কিন্তু যার তেমন জ্ঞান ও ক্ষমতা আছে সে পারে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে আবহাওয়া থেকে দূর ক'রে তাকে নষ্ট ক'রে ফেলতে। আর যে তুচ্ছ দুর্বলতাবশত একবার ঢুকতে দেয় সে আবার তাকে ডেকে আনে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি।

একজনের কথা বলি যার মধ্যে প্রায় তিন ভাগই ঐরূপ শক্তির তর হয়ে থাকাতে সে এমন ক্ষমতার কাজ দেখাতো যা ভালো নয়, কিন্তু তাই নিয়ে সে খুব বড়াই করত। কিন্তু একবার তাকে অনিষ্টকারী শক্তি জেনে সে তার থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা জানালো। সে শক্তি ছেড়ে যাবার সুযোগও ঘটল সেই মন্দ সত্তা ওর নিজের থেকে পৃথক বলে দেখা গেল, তাকে টেনে বের ক'রে দেওয়াও সম্ভব হলো। তখন কিন্তু সে ব্যক্তি দেখলে যে ওকে ছেড়ে দিয়ে সে তো অক্ষম বেকুব বনে গেল। তেমন ক্ষমতার তেজ আর তার মধ্যে নেই, নিতান্ত সাধারণ জনের মতো হয়ে সে বললে "আমার যে আসলে গুণ বলে কিছু রইল না, কোনো দানই এখন নেই, সাধারণের চেয়েও ছোটো অতি ইতর মানুষ হয়ে পড়লাম!" এই বলে সে কি করলে জানো? আবার প্রার্থনা করলে ঐ শক্তিকে ফিরে পেতে। কিছুদিন পরে আবার যা ছিল তাই হলো।

অতএব চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। যার যেমন নিয়তি তার তাই হতে দেওয়াই ভালো। এমন ব্যাপার অনেক বারই হয়েছে। ওদের নিজেদের অহংকারই ঐ সকল শক্তির দিকে দরজা খুলে দেয়, তারা চায় বড়ো হতে, শক্তিধর হতে, কেওকেটা হয়ে অদ্ভুত কিছু করে ক্ষমতা দেখাতে; তাতেই ঐ শক্তিরা তাদের পেয়ে বসে। সে জিনিস

ছাড়িয়ে দাও, অমনি তাদের ক্ষমতা চলে যাবে, তাতে অহংকারটি ক্ষুণ্ন হবে। তখন সাধারণের মতো হচ্ছে দেখে তাদের ভিতরকার একটা অংশ বলবে : "আহা, এর চেয়ে আগেই তো বেশ ভালো ছিলাম।"...কাজেই একটাকে নষ্ট করলে তার স্থানে দশটা আসবে। এ বড়ো তাজ্জব প্রচেষ্টা।

শ্রীদুর্গার কাহিনী তোমরা সকলেই জানো, তিনি বছরে বছরে আসেন তাঁর বিরোধী অসুরকে নিধন করতে, বারেবারেই তাঁকে নতুন করে এ কাজটি করতে হয়। এই সব অসুরদের রাজত্ব যতদিনে না নিঃশেষ হয় ততদিন পর্যন্ত এই রকমই চলবে। ওরা যখন জগৎ থেকে একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে তখন আর এমন দরকার হবে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এমন জিনিসের একটা দরকার রয়েছে এবং তার সার্থকতাও রয়েছে (যে কথা আমি বলেছি), অর্থাৎ যাতে তোমাদের সকলের আশ্পৃহা আরো বেশি জোরালো হয়, চেতনা আরো বেশি নির্মল হয়, আর মানুষে ঐকান্তিকতার পরীক্ষা হতে পারে, ততদিন পর্যন্ত ওগুলি থাকবে। যখন আর পরীক্ষার কোনো দরকার হবেনা, তোমাদের ঐকান্তিকতা আপনা হতেই বিশুদ্ধ হবে, তখন এরাও চলে যাবে। সেদিন থেকে দুর্গাকে আর প্রতি বছরে এমন করে সংগ্রাম শুরু করতে হবেনা।

প্রশ্ন ওদেরকেই বদলাতে পারলে ভালো হয় নাকি?

উত্তর : হাঁ গো ছেলে, ভালো তো হয়ই, খুবই ভালো হয়। কিন্তু...

ও রাজ্যের সম্বন্ধে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। চৌদ্দ বছর চেষ্টার ফলে আমি জেনেছি যে কাউকেই বদলানো যায় না, যদি সে নিজে তা বাস্তবিকই না চায়। পুরো ঐকান্তিকভাবে কেউ যদি নিজে সেই চেষ্টা না করে—আমি তো চৌদ্দ বছর ধরে দেখেছি, কিন্তু তার একশো গুণ সময় তুমি চেষ্টা করতে থাকলেও ফল তার একই রকম হবে—সে একটুও নড়বে না। ও সব সত্তাদের স্বভাবই হলো নিজেকে নিয়ে খুশি থাকা, কোনো কিছু বদলাতে তারা আদপেই চায়না।

ঐ সব সত্তাদের মধ্যে যারা নাকি মহা অসুর, তারা এখনও পর্যন্ত তাদের ক্রিয়া করে চলেছে পৃথিবীকে নিয়ে, তার মধ্যে রয়েছে অসত্যের অসুর, যিনি নাম নিয়েছেন "জাতিকুলের প্রভু"—খাসা নাম, সকল জাতির উপরেই অবাধ প্রভুত্ব—নিশ্চয় জানবে যে যেখানেই কোনো হাঙ্গামা বেধেছে সেখানেই ইনি বা এঁর কোনো প্রতিনিধি এসে মাথা গলিয়েছে। এরা বিলক্ষণ জানে যে এদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবার খসে পড়তে হবে। কিন্তু তবু বদলাতে চায়না। কারণ তাহলে যে ওরূপ শক্তি আর থাকবে না। অতএব তা অসম্ভব। তবে এটা জানে যে যেতেই হবে। তাই

খুব সজোরে আস্ফালন করছে যে যাবার আগে যতটা পারে ধ্বংস করে যাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে নড়তে চায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অতটা সম্ভব নয়। তবু যতটা পারে করবে, ভেঙেচুরে অনেক নষ্ট করবে, অনেক কিছু বিগ্‌ড়ে দেবে, কলুষিত করে দেবে। তাতে কোনো ভুল নেই। তার পরেই পতন। এমন শর্ত হলেও তাতেই রাজী। তবু বদলাবার কথা মানে না, তাতে যে নিজস্ব কিছু থাকেনা।

প্রাণরাজ্যের এই সব সত্তাদের সঙ্গে মানুষের অনেক তফাৎ। সে কথা অনেক-বারই বলেছি, আবার বলি :

মানুষের মধ্যে রয়েছে ভগবৎ উপস্থিতির স্ফুলিঙ্গ, এবং তার বিশিষ্ট চৈত্যসত্তা—প্রথমে তা অঙ্কুরমাত্র থেকে ক্রমে শেষ পর্যন্ত তা হয় পূর্ণ পরিণত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সচেতন, স্বাধীন। এমন জিনিস প্রাণের রাজ্যে নেই। এই বাস্তবের জগতে ধরিত্রীবাসী মানুষদেরই বেলাতে এই সবিশেষ কৃপাটি দেওয়া আছে। সেই কারণে প্রত্যেক মানুষই পরিবর্তিত হতে পারে, যদি সে চায়; অর্থাৎ প্রত্যেকেরই মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনা, সে পারে। চাইলেই সে পারবে, আর চাইলে সাফল্য হবেই। কিন্তু ঐ সব প্রাণসত্তাদের চৈত্য বলে জিনিসটাই নেই, প্রত্যক্ষ ভগবৎ উপস্থিতিই ওদের মধ্যে নেই। (যদিও আদিতে ভগবান থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু তার পরে মূল থেকে অনেক দূরে সরে গেছে)। তাই ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শও নেই আর চৈত্যও নেই। ওদের যদি পরিবর্তন আসে তাহলে নিজস্ব চরিত্র যে কিছুই থাকেনা। ওদের সব কিছুই হলো উল্‌টো রকম ক্রিয়া আত্মাভিমানে ভরপুর, স্বেচ্ছাচারী প্রভুত্বপ্রিয়, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন, তা ছাড়া যা কিছু শুদ্ধ সুন্দর ও মহৎ তার বিরোধী। যে চৈত্যবস্তু থাকাতে একজন অধঃপতিত মানুষও শুদ্ধ ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হয়ে পারে না, সেই বস্তুই ওদের নেই; অতি হীন জনেও সুন্দর ও পবিত্র ও মহতের কাছে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নত হয়ে যাবে, কিন্তু ওদের তা হবেনা। ওরা তার সম্পূর্ণ বিরোধী, ওদের রুচিতে বাধে, দেখলেই তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। এমন কিছুতেই চায়না, পাছে নিজের অনিষ্ট হয়, অস্তিত্ব চলে যায়। তাই ওরা সব কিছু ভালোকেই ঘৃণা করে।

জানিনা কি ভাবে ওদের বদলানো যেতে পারে। কিরূপ সূত্রে তা করা যায়? খুঁজে তো পাই না। বড়োদের বেলাতেও তাই। অর্থাৎ এই সকল সত্তা সরে যাবে না যাবৎ পৃথিবী থেকে ঘৃণা জিনিসটা না দূর হচ্ছে...এ কথা উল্‌টো দিক থেকেও বলা যায়। এরা যখন যাবে তখন পৃথিবী থেকে ঘৃণাও যাবে। কিন্তু যে উপায়ের কথা বললাম, অন্ধকারের স্থানে আলো আর কদর্যতার স্থানে সুন্দরকে আনতে পারা, সে শক্তি কেবল মানুষেরই আছে, অসুরের নেই। অতএব মানুষকেই

এ কাজ করতে হবে, সে-ই পৃথিবীর রূপান্তর আনবে, সে-ই অসুরকে তাড়াবে অন্য জগতে কিংবা একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে। তখন সবই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এই হলো কথা।

আর প্রশ্ন ?

প্রশ্ন মনের সম্বন্ধে আপনি বলেছেন ("কথাবার্তা" থেকে) "সত্তার যে অংশ আপন এলাকায় থেকে আপন কাজটি করে, তার দ্বারা সমুচিত সাহায্যই হয় ; কিন্তু তার এলাকার বাইরে গেলেই তার মধ্যে জটিল বিকৃতি এসে তার কাজ পণ্ড হয়ে যায়। ভগবৎ নির্দেশ-মত চললে তার কাজ ঠিকই হয় ; কিন্তু আপন খুশিতে চললে সব মিথ্যা হয়ে যায়।"

সত্তার কোনো অংশ এলাকার বাইরে গেলেই তার কাজ বিকৃত ও ভুল হবে কেন ?

উত্তর : নিজের এলাকা বলার মানে যে স্থানে থেকে যে কাজটুকু করা তার ধার্য। সত্তার প্রত্যেক অংশেরই সমগ্রের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট কিছু করার আছে। সেইটি ছাড়া সে যদি অন্য কিছু করতে যায় তাহলে তার নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুণ আর থাকেনা, এবং তার পক্ষে বিজাতীয় অন্য কিছু সে করতে পারেনা। কাজেই বিগড়ে গিয়ে তার বিকৃতি আসে। যেমন ওতে বলা হয়েছে যে মনের উপযুক্ত ক্রিয়া হলো সকল রকম কাজের সে গঠন দেবে। মনের মধ্যে একটা ভাব উপস্থিত হলে সেই ভাবকে একটা আকার দিয়ে সমুচিত কর্মপ্রেরণা এনে তাকে বাস্তবে পরিণত করবে। ভাবকে সে কর্মে সার্থক করে তুলবে, এই হলো তার কাজ, আর যতক্ষণ সে এই কাজটি সযত্নে ও সঠিক ভাবে করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দ্বারা পুরো সাহায্যই মিলবে। কিন্তু মন যদি ভাবে যে তার সব কিছুই জানা আছে, অন্য কোথাও থেকে—অর্থাৎ উপর থেকে জানবার কিছু দরকার নেই—আর নিজেই জ্ঞান পেয়েছি ভেবে ধার করা জিনিসকে নিয়ে যদি সে বাস্তব জীবনে তা খাটাতে যায়, তখন সে নিজের এলাকা ছেড়ে অত্যাচারী হয়ে ওঠে, বিকৃতি আসাতে সাধনার কাজে সাহায্য করার বদলে তাকে আরো নীচে নামিয়ে দেয়। তা অনায়াসেই লক্ষ্য করতে পারবে। তবে সেখানে সমুচিত ধারাকেই অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা।

প্রাণের বেলাতেও একই কথা। প্রাণের কাজ হলো কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ আনা, উদ্যম ও শক্তির প্রয়োগ, যাতে মনের দ্বারা ভাবের গঠনকে দেহচেষ্টার মাধ্যমে কর্মে সফল করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কর্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে প্রাণ তার উৎসাহ ও উদ্যম প্রভৃতির দ্বারা মনের সঙ্গে সহযোগিতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু ভালোই চলে। কিন্তু প্রাণকে যদি হঠাৎ কোনো কামনাতে পেয়ে বসে—যা প্রায়ই হয়ে থাকে—এবং উচ্চভাবকে সফল করার চেষ্টার বদলে সেই কামনা পূরণের দিকেই সকল শক্তিকে প্রয়োগ করে, তাহলে গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়াতে বিকৃতি এসে পড়ে, তার থেকে নানা বিপর্যয় ঘটতে পারে।

প্রশ্ন : বিরোধী শক্তির আক্রমণ আমরা কখনো কখনো জানতে পাইনা কেন ?

উত্তর : জানতে পারোনা ? তার কারণ যথেষ্ট সজাগ থাকোনা, অন্যমনা হয়ে থাকো, দিনগত বাহ্য ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকো। সেই সুযোগেই বিরোধী শক্তিরা ভিতরে ঢুকে পড়ে, তোমার অজ্ঞাতে তারা চেপে বসে। সরাসরি আক্রমণ ওরা প্রায় করেনা, কারণ তাহলে তুমি জেনে ফেলতে পারো (অর্থাৎ অস্বস্তি লাগলেই সচেতন হতে পারো)। প্রথমে নিশ্চেতনের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে নীরবে উপরে উঠে আসে। তুমি তাই জানতেই পারোনা যে তোমার মধ্যে কি হচ্ছে। যখন জানতে পারো তখন তারা এসেই গেছে, চেপে কায়েমি হয়ে বসেছে।

প্রশ্ন আবার কখনো বা বিরোধী শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির প্রভেদ করা যায়না।

উত্তর : অচেতন হয়ে থাকলে তাই হয়।

দুই অবস্থাতে তা হতে পারে : হয়তো আপন ভিতরকার ক্রিয়া সম্বন্ধে তুমি একেবারে অজ্ঞান—কখনো সেদিকে লক্ষ্যই করোনি, জানতেই চাওনি যে ভিতরে কি হচ্ছে,—কিংবা তুমি ভান করে দেখতেই চাইছনা : উটপাখীদের মতো মাথা গুঁজে থেকে নিজের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণকে এড়িয়ে বলছ "কই কিছুই তো হয়নি।" অবশ্য তোমাদের পক্ষে সে কথা নিশ্চয় নয়। লক্ষ্য করা অভ্যাস নেই বলেই জানতে পারোনা।

কখনো বেছে নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছ কি যে কোন জিনিষটা আসছে মন থেকে, কোনটা প্রাণ থেকে, আর কোনটা দেহ থেকে ?...তার বাছাই করতে পারোনা, কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে সবই একত্রে মিশে খিঁচুড়ি হয়ে যায়, পরস্পরকে পৃথকভাবে চেনা যায়না। এমনই ঘোরালো যে ঠাহর করা যায়না। কিন্তু লক্ষ্য করা শুরু করলে কিছুকাল পরে দেখবে যে কতকগুলো জিনিসকে যেন গায়ের উপরেই রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে ; আর কতকগুলো জিনিস এমন যাকে জানতে ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে ; আরো কতকগুলোকে জানতে আরো গভীরে যাওয়া চাই, যেগুলো আসে অচেতনার দিক থেকে ; আরো কিছু আছে যা নিতান্তই গভীরের। এই হলো পরখ আরম্ভ।

কেবল লক্ষ্য করে যাবে। মনে করো একটা দুর্বোধ্য অবস্থাতে পড়ে গেছ। তখন দেখ চোখ মেলে : "কেন এমন হলো ?" আগে দেখ তোমার জ্বর হয়েছে কিনা, বা কোনো-রকম অসুখ করেছে কিনা ; যখন দেখলে যে সবই ঠিক আছে, জ্বরজারিও নেই, মাথাধরাও নেই, পেটও ঠিক আছে, হার্টও ঠিক চলছে,—তাহলে সব কিছু স্বাভাবিক হলেও এমন

অস্বস্তি বোধ করি কেন?...তখন খোঁজ নেবে ভিতরের দিকে। হয়তো কোনো বাবে তৎক্ষণাৎ একটা জবাব পেয়ে যাবে: সামান্য কিছু বিরক্তিকর ব্যাপার কখন ঘটেছিল, হয়তো কেউ কিছু অপ্রিয় কথা বলেছিল, বা কোনো কাজে তোমার গলদ ছিল, বা পড়া বলতে না পারাতে মাষ্টারের কাছে বকুনি খেয়েছিলে। সে সময়ে অতটা গ্রাহ্য করোনি, পরে ব্যথা পেলে। এই হলো দোসরা রকম।

আর যেখানে ও সব কিছুই নয়, সব দিকেই ঠিক আছে, উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি, "তবু এমন বোধ করছি কেন?" তখন আরো গভীরে যাওয়া দরকার। অনেক কিছু কারণ হতে পারে হয়তো কোনো আসন্ন আক্রমণের সূচনা; উন্নতি হচ্ছে না বলে উৎকণ্ঠা; পরিবর্তন আসার পূর্বাভাসে সঙ্গতিহানি, যাতে নিজের মধ্যে বোঝাপড়া দরকার—যা থাকা অনুচিত তাকে বদলানো, তার উপর আলো ফেলা। নিজের দিকে চেয়ে তখন বলবে "আমি এখনও তাই আছি। একটা অস্পষ্ট কিছু এখনও এক কোণে লুকিয়ে আছে—ক্ষুদ্র স্বার্থ, কু-ইচ্ছা, যাকে বদলানো যাচ্ছেনা।" তখন সেটার নাক বা কান ধরে আলোর দিকে টেনে এনে বলবে "তুমি লুকিয়েছিলে, এখনও লুকোতে চাও? কিন্তু আমি তোমাকে কোনোমতেই চাইছি না।" অতঃপর তাকে চলে যেতেই হবে।

তা হবে একটা মস্ত অগ্রগতি।

প্রশ্ন ক্লাসের মধ্যেই যদি তাই হয়, এমনি দারুণ অস্বস্তি বোধ করি...

উত্তর: ক্লাসের মধ্যেই তা হয়? তার মানে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের পড়ানো শোনোনি, শুনলে তা হতে পারেনা। ক্লাসে পাঠের দিকে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কোনো কিছুই হয় না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে হতে পারে, কিন্তু ক্লাসের মধ্যে নয়। তার মানে তুমি তখন হয়তো স্বপ্নরাজ্যে ছিলে বা নিজের মধ্যে তলিয়ে ছিলে বা কল্পনার জগতে ছিলে, ক্লাসে যা বলা হচ্ছে তার দিকে কান দিচ্ছিলে না।...কিন্তু এই সুন্দর সত্যটি শুনে রাখ যে, তোমরা যখন কিছু পড়ছো বা শিখছো, যখন তাতেই একাগ্র হয়ে আছো, তখন অমন কিছুই হতে পারে না। তার আগে হতে পারে, পরে হতে পারে, কিন্তু সে সময়ে নয়। কারণ একাগ্র হলে তোমার সকল শক্তিও তাতেই একাগ্র হয়, তাতে অস্বস্তি কিছু আসতে পারেনা। যা শিখছো এবং বুঝছো সেই দিকেই মন লেগে রয়েছে।

প্রশ্ন : একাগ্র হতে চেষ্টা করলেও যে কখনো কখনো তা হয় না।

উত্তর যদি সত্যই তাতে অপারগ হও, তখন নিজের মধ্যে খোঁজ করবে যে তার কারণ কি হতে পারে! যদি শিক্ষক তোমাকে ঐ সময়ে কোনো প্রশ্ন করেন, তুমি খোলাখুলি বলবে "মাপ করবেন, আমি আগে কিছু শুনিনি।"

শিক্ষা পেতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

প্রশ্ন : তা হয়।

উত্তর : তবে কেন অমন হবে?

প্রশ্ন কোনো কোনো ক্লাসে আমি সব কথা বুঝতে পারিনা।

উত্তর তার মানে ঐ সব ক্লাসে তোমার শেখবার ইচ্ছা থাকেনা। তুমি হয়তো বলবে, "ইচ্ছা থাকে বৈকি।" কিন্তু বাস্তবিক ইচ্ছা থাকলে এমন কোনো ক্লাস নেই যেখানে কিছু শেখা যায় না। অবশ্য এমন কথা সেখানে বলা হতে পারে যা তুমি জানো না, তা তোমাকে শিখে নিতে হবে। তুমি তো আর জ্যান্ত একটা অভিধান নও। যদি একই বই থেকে বার বার পড়ানো হয় (যা কোথাও কোথাও হয়ে থাকে), সেখানে তুমি বলো "এ তো জানা জিনিস, একঘেয়ে কথা",—সেখানেও তুমি শিখতে নারাজ হচ্ছ; একই বই আবার পড়ানো মানে এই যে, প্রথম বারে যা শেখা বাদ গেছে, দ্বিতীয় বারে তা আরো যত্নের সঙ্গে শিখে নেবে। এমন কি ব্যাকরণের পড়াও! ব্যাকরণ পড়তে অবশ্য আগ্রহ জন্মায় না, তবু তাও সম্ভব হবে যদি তারই বর্ণগুলো ঠিক শিখতে শুরু করো, এমন কি তার শুষ্ক সূত্রগুলো পর্যন্ত। তেমন ভাবে শিখতে আরম্ভ করলে যে তাতেই কতটা আমোদ পাবে তার ধারণা নেই,—যখন কেবলই মুখস্থ না করে ভিতরে ঢুকে বুঝতে চাইবে যে এখানে এমন কথাটা বলেছে কেন! কি এতে বোঝাচ্ছে? কি এর উদ্দেশ্য?...যা কিছুই নিয়ম তৈরি দেখ সবগুই উপস্থিত বিষয়কে নিয়ে মানুষের মন ছকে বেঁধেছে। কয়েকটি মাথা একত্রিত হয়ে নিয়মগুলি রচনা করেছে যাতে উপস্থিত সত্যকে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাবে ধরে দেওয়া যায়—সূত্রগুলির পিছনে সেই চেষ্টাই রয়েছে—তাহলে তা কতই আগ্রহদায়ক! সেটা বুঝে নিতে তখন কত স্ফূর্তি হয়! ঘন জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার একটি দেশ আবিষ্কারের মতো, উত্তর মেরুতে অভিযানের মতো। ব্যাকরণের সূত্রেও তেমনি ধরনের আবিষ্কার হতে পারে।

শুধু পড়ার বদলে বুঝে দেখবে, তাহলে একঘেয়ে লাগবে না।

তবে এতে একাগ্রতা চাই, মনের উপরকার খোলস ভেদ করে ঢুকে যাওয়ার মতো। তবেই চেষ্টার দান মিলবে...একটা নীরস কঠোর জিনিসকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলে...একাগ্র হতে হতে হঠাৎ আলো মিলে গেল, তখন বলবে "ওহো, এবার বুঝলাম, চমৎকার তো!" সামান্য জিনিসেই কত আনন্দ মিলতে পারে।

স্কুলের পড়াগুলো একঘেয়ে লাগবার কথা নয়।

প্রশ্ন : স্কুলের একটা কোর্স এক বছরেই শেষ করতে হবে, কখনো-বা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে। একটা জিনিস শিখতে না শিখতে অন্য জিনিসে চলে যেতে হয়।

উত্তর : হাঁ, এটা ঠিক বলেছ। এখানে চেষ্টা করব এ নিয়ম বদলাতে; একটা বই যে এক বছরেই শেষ হবে তার কোনো মানে নেই। একটা পাঠ সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে তবেই অন্যটা ধরা উচিত। যা শেষ হলো তা হলো, যা হলোনা তা হয়নি।

আসলে শিক্ষকদেরই উচিত আগে সমস্ত জিনিসটা আয়ত্ত ক'রে নেওয়া। আর এটা দেখা উচিত যে একটা বিষয়ে যখন অধিকাংশ ছাত্রই শিখতে পেরেছে—সকলেই যে বুঝেছে তা নয়, তা হওয়া অসম্ভব—কিন্তু যারা কিছু বুদ্ধিমান তারা বুঝেছে, তখন অন্য বিষয়টি ধরা। তাতে দেড় বছর বা দুই বছর লাগলেও কিছু যায় আসেনা। কারণ শিক্ষক তার ক্লাসের প্রয়োজন যতই পড়িয়েছে এবং শিখিয়েছে। এইরকম শিক্ষাবিধিই আমার মনোমত। অবশ্য এতে অসুবিধাও আছে। কিন্তু যে বই ছাত্রদের পক্ষে সহজ নয় তার বেলাতে এইরূপ করাই উচিত...তবে সকলকেই যে ওতেও খুশি করা যাবে তা নয়। যাদের চেষ্টা আছে তাদের দিকেই নজর দিতে হবে। যারা কুঁড়ে অলস বা ঢিলা প্রকৃতির তারা ঘুমোতে চায় তো ঘুমোক, যতক্ষণ না আঘাত পেয়ে জেগে ওঠে। কিন্তু যাদের শিখবার আগ্রহ আছে তাদের জন্যই ক্লাস করা উচিত। এখনকার শিক্ষাবিধি যেন সবাইকে পিটে সমান চৌকস করার মতো। যারা মাথা চাড়িয়ে উঠছে তাদের মাথাটা কেটে আর যাদের মাথা নীচু তাদের উপরে টেনে উঠিয়ে এক সমান ক'রে দাও। কিন্তু এতে কিছু ভালো হয়না। যারা নিতে পারে তাদের ধরেই কাজ করা উচিত, বাকী সকলে যতটা পারে নিক। আর সকলকেই যে সব কিছু জানতে হবে তার মানে নেই—তা স্বাভাবিক নয়। যারা জানতে চায় তারা জানুক, যারা কাজ করতে চায় তারা করুক, যথাসাধ্য তাদের সাহায্য দেওয়া হোক, তাদের নতুন খাদ্য দেওয়া হোক, কারণ তারা বুভুক্ষু। আমার সময় থাকলে আমি নিজেই ক্লাস নিতাম। কিন্তু সব দিক নিজে করা যায় না। আজ এই পর্যন্ত। অনেক দেরী হয়েছে, এ রাত্রির মত ছুটি।

জুন ১৩, ১৯৫৩

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন ("কথাবার্তা" থেকে)—"বুদ্ধির একটা সত্য আর একটা অসত্য ক্রিয়া আছে ; একটাতে সাধনার সাহায্য করে, অন্যটাতে বাধা দেয়।"

বুদ্ধির সত্য ক্রিয়া বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর বুদ্ধি কাকে বলে তা জানো ? তা কি মনের একটা বৃত্তি অথবা তোমার সত্তার একটা অংশ ? কি মনে হয় ?

প্রশ্ন : মনেরই বৃত্তি।

উত্তর মনের জিনিস ? মনের যে অংশ চিন্তার কাজ করে, তাই বলতে চাও ?

প্রশ্ন চিন্তা নয় যা।

উত্তর নয় ? তবে কি ?

প্রশ্ন : চিন্তা বটে, কিন্তু...

উত্তর মনের একটা অংশ ভাবকে গ্রহণ করে, যা আসে উচ্চ মানস থেকে। তবে বলতে পারিনা, তুমি যেটা বলতে চাইছ তার সঠিক সংজ্ঞা কি হবে।

বুদ্ধি ভাবগুলিকে চিন্তায় পর্যবসিত করে, সেই চিন্তাগুলিকে জুড়ে পরে পরে সাজিয়ে নেয়। অনেক উচ্চ ভাব আসে যা মনের আয়ত্তের বাইরে, সেগুলি নানারূপ আকার নিতে পারে। সেই বৃহৎ জিনিস নেমে এসে সুনির্দিষ্ট আকারে অভিব্যক্ত হতে চায়। ভাব থেকে ভাবনার মধ্যে তা আকার নেয় ; তাকেই বুদ্ধি বলে মনে করি, যা ভাবকে চিন্তায় রূপ দিচ্ছে। অতঃপর সেই চিন্তাগুলিকে সাজিয়ে একটা মোটমাট কিছুতে দাঁড় করাতে হবে, নতুবা সব এলোমেলো হয়ে যাবে। এবং তারপর তাকে বাস্তব কাজে লাগাতে হবে। এও বুদ্ধির ক্রিয়া।

এখন সত্য ক্রিয়া বলতে গেলে জানতে হবে কোন রকম ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। তোমার রয়েছে এই দেহটা, কিন্তু একে তুমি খেয়ালমতো মাথা দিয়ে বা হাত দিয়ে হাঁটাতে পারোনা, পেটে ভর করে হামাগুড়ি দেওয়াতে পারোনা, পা দুটো উপরে তুলে মাথা নীচু ক'রে থাকতে পারোনা। প্রত্যেক অঙ্গ দিয়েই যার যেটা কাজ তাই করিয়ে নাও। এখন জিনিসটা অভ্যাস হয়ে গেছে বলেই খুব স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু শিশুরা প্রথমে জানেনা কোনটা দিয়ে কি করতে হবে, পা বা হাত বা মাথা কোনোটার বিষয়েই

নয়। মনের ক্রিয়া সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা। জেনে নিতে হবে যে মনের কোন অংশের কি কাজ, তখন বলা যাবে যে তার কোনটা সত্য ক্রিয়া আর কোনটা নয়। যে অংশের কাজ বৃহৎ ভাবকে চিন্তার রূপ দেওয়া, সে তাই করবে যথাসাধ্য নিখুঁত ও সুগঠিত প্রকারে। আর যে অংশের কাজ চিন্তাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করা, যাতে এলোমেলো না হয়ে একটা ধারাগত হয়, তার পক্ষে সত্য ক্রিয়া হবে উচ্চতর যুক্তি দিয়ে তাকে স্বচ্ছভাবে এমন থাকের মধ্যে স্থাপন করা যাতে প্রয়োজন হলেই তুমি জানতে পারো যে কোন নির্দিষ্ট থাকে তা তোলা রয়েছে, উল্টোপাল্টা না হতে পারে। কারো কারো মন এমন ভাবে কাজ করেনা, যখন যে ভাবটা মনে আসে তাকে নিয়ে এলোমেলো চিন্তার জটিলতা দিয়ে একটা আভ্যন্তরীণ ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। এমন লোকদের কথা জানি যারা দার্শনিক দিক থেকে—যদিও দর্শনের কিছু তার মধ্যে নেই—তারা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাকে পাশাপাশি স্থান দিয়ে রাখতো, তার মধ্যে উচ্চনীচ ভাবও থাকতো, আবার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজদ্রোহিতাও থাকতো, সবগুলোই সমান মূল্য নিয়ে মাথার মধ্যে ঠোকাঠুকি করতো, তারা তা বুঝতেও পারতোনা!...তোমরা তো জানো, "কোনো প্রশ্নকে ঠিক ভাবে ব্যক্ত করতে পারলে তার দ্বারাই সে প্রশ্নের তিন ভাগের সমাধান হয়ে যায়।" এবার তাহলে প্রশ্ন করো। কোন বিষয় নিয়ে বলতে চাও? আমি সাহায্য করতে হাত বাড়াচ্ছি, ধরো তুমি। কোন জিনিসকে বুদ্ধি বলো? ভাব ও চিন্তাতে কি তফাৎ তা জানো তো?

প্রশ্ন : ঠিক জানিনা।

উত্তর : হাঁ, তাহলে এখানেই প্রথম বাধা। কেউ বলতে পারো? (অন্যের দিকে ফিরে) তুমি জানো ভাব ও চিন্তাতে কি তফাৎ?

প্রশ্ন চিন্তা অস্পষ্ট জিনিস, ভাবের চেয়েও অস্পষ্ট।

উত্তর : না, এখানে অস্পষ্ট মনের অস্পষ্ট চিন্তা বা স্পষ্ট মনের স্পষ্ট চিন্তা নিয়ে কোনো কথা নয়। ও কথা ঠিক হলোনা।

প্রশ্ন আপনি যে বললেন, ভাব উপর থেকে এসে চিন্তাতে রূপ নেয়।

উত্তর : হাঁ, কিন্তু উপর থেকে আসে কিভাবে?

প্রশ্ন মনের উচ্চতর অংশ থেকে।

উত্তর : হাঁ, কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলো যে ভাব কেমন ক'রে চিন্তাতে রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বলতে পারো? (অন্যের দিকে চেয়ে) এ দেখছি বলবার জন্যে মুখিয়ে আছে। আচ্ছা, বলো তুমি, দেখি।

প্রশ্ন পৃথিবীতে ভগবানের প্রকাশ একটি ভাব, আর রূপান্তর আনয়ন তারই চিন্তা।

উত্তর তুমি কি অদ্বৈতবাদী? এটি বোধহয় অদ্বৈতাদেরই একটি সূত্র। ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এ একটা চিন্তা, আমরা তাকে ভাবই বলি। আর কেউ বলতে পারো?

প্রশ্ন (জনৈক শিক্ষক) লজিকে বলে: "নশ্বরতা" হলো ভাব, আর মানুষ "নশ্বর" এ হলো একটা চিন্তা।

উত্তর : হাঁ, তুমি বুঝেছ ভাব আর চিন্তাতে কি তফাৎ। তা এখানে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। একটি ভাব নানারূপ চিন্তাতে রূপান্তরিত হতে পারে। তা পরস্পরবিরোধী চিন্তাও হতে পারে, সেগুলিকে মানিয়ে সুসংলগ্ন করে নিতে হয়। অনেকবারই আমি বলেছি যে ভাবের উচ্চতায় উঠে গেলে তখন পরস্পরবিরোধী চিন্তারও মিল হয়ে এক হয়ে যায়।...চেষ্টা করে দেখতে পারো, এও একরকম কৌতুক। একটা সিদ্ধান্ত ধরে নিলাম, তার বিপরীত সিদ্ধান্তও এসে গেল, তার থেকে একটা সংশ্লেষণ করা হলো।

কে বলবে একটা কিছু সিদ্ধান্ত?...আচ্ছা আমিই বলছি: "মানুষ নশ্বর", এর বিপরীত কথা হলো "মানুষ অনশ্বর"। এখন দেখ দুটির কোথায় সংশ্লেষণ হতে পারে।

প্রশ্ন অজ্ঞানতাই মানুষকে অমর চিন্তার সঙ্গে মিল আসতে দেয় না।

উত্তর এটা ধোঁয়াটে ভাবে বলা হলো। আরো বুদ্ধি সহকারে বলতে হবে মানুষ বস্তুতঃ অমর; অজ্ঞানতা বা অচেতনার কারণেই সে মর বা নশ্বর হয়েছে। এই ভালো হলোনা? আরো এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারো কেন সে অমর? কেনই বা সে মর? কেমন ক'রে সে মর থেকে অমর হতে পারে?

সত্তার যে অংশেই হোক, বুদ্ধি বা মন বা প্রাণ বা আর কিছু, তার প্রত্যেকটিরই প্রকৃত ক্রিয়া হলো দুই তরফা ক্রিয়া: প্রথম, সত্যের বিকাশে প্রতিবন্ধক না হওয়া;

আর দ্বিতীয়, তাতে সক্রিয় সহায়তা করা। একটা হলো না-এর দিক, কোনো আড়াল বা অন্তরাল না হওয়া, আর অপরটি হাঁ-এর দিক, নির্ভেজাল বিশুদ্ধভাবে তার সহযোগিতা করা। এ সূত্র সবেতেই খাটাতে পারো, তাতে যথেষ্ট সুবিধা পাবে।

আর কোনো প্রশ্ন ?

প্রশ্ন মানুষ যদি না মরবে তাহলে খুব বেশি বয়সে তার দেহ তো নিতান্ত অকেজো হয়ে থেকে যাবে ?

উত্তর : ও, এই কথা। তা নয়, তুমি উল্টো দিক থেকে দেখছ। দেহে ভাঙন না ধরলে তো মরেনা, দেহ ভেঙে গিয়েই মরে। দেহটা অকেজো হলেই মরে। আর, মরতে যদি না হয় তাহলে দেহটাও অকেজো হবেনা। এই হলো দুটি বিপরীত কথা। দেহ জীর্ণ হয়, ভঙ্গুর হয়, অথর্ব হয় বলেই মৃত্যুর দরকার হয়। কিন্তু দেহ যদি ভিতরকার সত্তার ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে সমান তালে চলতে পারতো, চৈত্যসত্তা যেমন পরিণত হয়ে উঠছে দেহের বেলাতেও যদি তাই হতো, তাহলে মৃত্যুর দরকার হতোনা। বছরে বছরে দেহের উত্তরোত্তর ক্ষয় হওয়া, এটি প্রকৃতির অভ্যাস। বর্তমান মুহূর্তে যা হচ্ছে তা ঐ অভ্যাসের ফল। সেটাই মৃত্যুর আসল কারণ। অপরপক্ষে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে যে জীবনের প্রারম্ভে যে পরিণতিক্রিয়ার পত্তন হয়েছে তা শেষে অন্যরূপ আকারও নিতে পারে। অবশ্য আগেই বলেছি যে উত্তরোত্তর কেবল বাড়তেই থাকবে এমন কথা ভাবা যায় না, কারণ তাহলে ঘরের ছাদ ভেঙে আরো উঁচু করতে হবে। কিন্তু উচ্চতায় বাড়ার বদলে অন্যরূপ পরিণতির কথা ভাবা যায়, যেমন গঠনের পরিণতি। গঠনে যত কিছু অপূর্ণতা তার ধীরে ধীরে সংশোধন হবে, সব রকমের দুর্বলতার বদলে আসবে শক্তি-সামর্থ্য, অপারগতার বদলে আসবে পারগতা, এমন কেন হবে না ? এ কথা তোমরা ভাবতে পারোনা কারণ অন্যরূপ দেখাই অভ্যাস। কিন্তু বস্তুত এমন না হবার কোনো কারণ নেই।

গাছের পরিণতি হওয়া কখনো লক্ষ্য করে দেখেছ কি, যেমন মনে করো তাল গাছের ? আমাদের আশ্রমে সমাধি প্রাঙ্গণে এমনি একটি গাছ আছে, যে দরজা দিয়ে তোমরা নিত্য যাওয়া আসা করো তারই এক পাশে, দেখেছ কি কিরূপভাবে সেটা বাড়ছে ? ওর বয়স হয়তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর। ওর উচ্চতা এখন কম কিন্তু পরে তা বাড়ির মাথাকেও ছাড়িয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলে ওরা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অনায়াসে বাঁচে। কেমন ক'রে বাঁচে তা জানো ? আমি উপর থেকে তাই দেখি। খুব সুন্দর ব্যাপার, বছরে একবার ক'রে হয়। প্রথমে মাথার উপর দেখা দেয় বাদামী রংএর

ছোটো একটি বর্তুলপিণ্ড। সেটি ক্রমশ বড়ো হতে শুরু করে, রংটাও পাতলা হয়ে আসে। পরে দেখা যায় তার গায়ে লম্বা আঁচড়ের মতো অনেক জটিল রেখা, তার মাথাগুলো ভিতর-দিকে ঘোরানো; সেগুলো ক্রমশ আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে—কচি কচি হল্‌দে সবজ দাঁড়ি, পাদ্রীদের ক্রস্‌ চিহ্নের মতো। তখন সংখ্যাতে আরো বেড়ে বেশ পৃথক হয়ে পড়তে শুরু করে; তখনও কিন্তু বাদামী রং থাকে (তোমাদের কাছাকাছি), কতকটা ওটি-পোকার মতো। হঠাৎ এক সময় দেখা যায় যেন সেগুলি নাক দিয়ে কেটে গিয়ে পাতা হয়ে বেরিয়েছে। প্রথমে তা খুব ফিকে সবুজ আর অতি নরম। দুই একদিন পরে, তা লম্বা হতে হতে রীতিমত পাতায় পরিণত হয়। গুণে দেখিনি, কতগুলো পাতা। এমনি প্রতি বারেই নতুন পাতার এক এক ঝাঁক। প্রথমে তাদের রং চমৎকার ফিকে সবুজ, পিঙ-দের মতো নরম আর সুন্দর। তখন তারা খুবই কাঁচা, একটু আঘাত পেলেই জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে থাকবে। কিন্তু এমন চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হয়ে বলবে: "প্রকৃতি কেন বরাবরই এমন সুন্দর থাকেনা?" কিন্তু পরের দিন সকালে দেখবে...ওঃ! সবই আলাদা হয়ে গেছে, উজ্জ্বল সবুজ রং ধরেছে, যেন যৌবনের তেজ পেয়ে আশ্চর্য এক রূপ নিয়েছে। এখানেই কিন্তু থামা নেই, আরো বাড়তে থাকে। তারপর আসে যত ধুলা ময়লা, পথিকের যাতায়াতে মলিনতা। শেষকালে হল্‌দে রং ধরে শুকিয়ে গিয়ে সেগুলি ঝরে যায়, আর তাতেই বৃক্ষকাণ্ড খানিকটা ওঠে বেড়ে। এইভাবে শেষ সীমাতে গিয়ে পৌঁছতে ওদের কয়েক শত বছর লেগে যাবে। কিন্তু বছরের পর বছর এই একই ব্যাপার চলতে থাকবে, এমনি একই ভাবে এরা সুন্দর থেকে সুন্দরতর অবস্থাকে পার হয়ে যাবে, তখন তোমরা বলবে "এখানেই থামে না কেন?" আর পরের মিনিটেই দেখবে আবার অন্যরকম, যদিও তেমন সুন্দর নয়। এইভাবে ওদের ক্রমবিকাশ চলে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে; পরে আসে দুর্ঘটনা, তখন হয় ক্ষয় ক্ষতি, তারপরে মৃত্যু।

কিন্তু দুর্ঘটনা যে অপরিহার্য তা নয়। আর থাকে মৃত্যু মনে করো তাতে বরং গাছের বৃদ্ধিই ঘটে। একটা কিছু ঝরে পড়া মানে আরো উন্নয়ন, আরো কিছু লাভ। এমনি করেই সম্পত্তি ও সৌন্দর্যকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে হয়। যে দেহ দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না তাকে রেখে কি ফল, সে থাকা তো অনর্থক থাকা। সেইজন্যই তার বিনাশ হয়। এমন দেহ হওয়া চাই যা উত্তরোত্তর পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারে। দেহের মধ্যে এমন সব কিছু রয়েছে যার সম্বন্ধে তুমি বলে থাকো "এটা যদি এমনতরো না হয়ে অমন-তরো হতো (চরিত্রের কথা নয়, কারণ তার তো প্রায় সবই বদলাতে হয়, আমি বলছি বাহ্য দেহের কথা)—যদি এই অসঙ্গতি ঘুচে যেতো, তাহলে কি ভালোই হতো।"... কিন্তু তাও যে হতে পারে এমন কথা ভাবোনা কেন? যদি বাহির থেকে দেখার দৃষ্টিতে দেখ, অর্থাৎ আপন ক্ষুদ্র আমিত্বের মায়াকে বাদ দিয়ে যেন অন্য কাউকে

দেখছ সেই ভাবে দেখে বলো : "দেহের এই জিনিসের সঙ্গে ওই জিনিসটার সঙ্গতি নেই", আর তার কারণ খুঁজতে যদি আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখ তো দেখতে পাবে যে তোমার চরিত্রেই যে খুঁত রয়েছে তারই অভিব্যক্তি হচ্ছে ঐ অসঙ্গতি। চরিত্রের মধ্যে হয়তো কিছু বেঁকেচুরে আছে যা সঙ্গতি রাখছেনা, তাই দেহের কোনো অংশে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। তাকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখ যে ভিতরে কোথায় দোষ আছে তা আগে খুঁজে বের করা দরকার। সেদিক দিয়ে চেষ্টা করলে তার ফলও মেলে।

দেহ যে কতখানি নমনীয় হতে পারে তা তোমরা জানোনা। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে দেহ খুব অনমনীয় হয়ে থাকে বলেই তার ক্ষয়িষ্ণুতা আসে, কিন্তু তার কারণই এই যে আমরা তার সমুচিত সদ্ব্যবহার করতে জানিনা। যখন এর চাঁটকা পাতাগুলি গজায় তখন আমরা জানিনা যে ইচ্ছা করলে তাকে নিখুঁত ও প্রাণসমৃদ্ধ ক'রে শতদল পুষ্পের মতো ফুটিয়ে তোলা যায়। তখন আর সখেদে এমন কথা বলতে হয়না "ছি ছি, কেন যে আমার হাতটা এমন সরু কিংবা পা দুটো এমন লিক্‌লিকে কিংবা পিঠটা এমন কুঁজো কিংবা মাথাটা এমন বেয়াড়া।" তার বদলে বলবে "এ সব বলা চলবেনা, হাতটা সুডোল করে নিতে হবে, দেহে সঙ্গতি আসা চাই, দেহের প্রতি ভঙ্গীতে সৌন্দর্য বিকাশ চাই", তবে সাফল্য মিলতে পারে,—কিন্তু আগে জানা চাই যে ইচ্ছার জোরে কেমন করে তা হতে পারে, সে ইচ্ছা হবে দুর্বার ও অনির্বাণ ও অসীম সহিষ্ণু, বিফল হলেও সে দমবেনা, ভিতরের কারণ খুঁজে দেখে নীরবে তার আপন কাজ করে যাবে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে লেগে থাকবে। যেমনি দেখবে কোথাও রয়েছে একটা বিশ্রী কালো দাগ, অমনি তাকে তুলে ফেলে তার জায়গাতে আলো ফেলতে থাকবে। কিছুকাল পরে নতুন কিছু আবিষ্কার করে বলবে "এই তো আমার মুখের বেমানান ভাবটা ক্রমশ কমে আসছে, এর বীভৎস বোদা ভাবটা চলে যাচ্ছে।" দশ বছর বাদে নিজেকে তখন চিনতেই পারবেনা।

সকলেই তোমরা এমন নবীনতার অধিকারী। কেবল সুযোগ নিতে জানা চাই,—স্বার্থপর অর্বাচীনের মতো নয়, সৌন্দর্য ও সঙ্গতির কামনা নিয়ে। দেহকে দীর্ঘজীবী করতে হলে ক্ষয় হতে দেওয়া চলবেনা। হওয়া চাই সমৃদ্ধি, তার মানে রূপান্তর, ক্ষয় নয়। ক্ষয়িষ্ণু জিনিস কখনো অমর হতে পারেনা।

প্রশ্ন : মৃত্যুর পরে লোকে যায় কোথায়?

উত্তর : ওহো ছেলে, তুমি যে একটা গোটা বই চাইছ! এ তো সামান্য প্রশ্ন হলোনা। আচ্ছা, পরে দেখা যাবে। আর আমার মনে হচ্ছে এ সম্বন্ধে ঐ বইতেই একটা অধ্যায়

রয়েছে। পরে তার আলোচনা হবে...তবে একটা কথা এখনই বলি : পৃথিবীতে যখন এসে জন্মাও তখন কি জানতে পারো যে কোথায় যাচ্ছ ? আর পৃথিবীতে যারা আসে তারা কি এক জায়গাতেই আসে ? এর জবাব দাও। প্রত্যেকেই যায় তার নিজ নিজ পথে। প্রত্যেকের নিয়তি আলাদা। তাহলে মৃত্যুপরের বেলাতেই বা সকলের পক্ষে একরকম হবে কেন ? প্রত্যেকের পক্ষেই হবে আলাদা আলাদা গন্তব্য।

জুন ২৪, ১৯৫৩

প্রশ্ন : (বায়ের "কথাবার্তা" থেকে)—"প্রাণরাজ্যের সত্তারা স্বভাবতই খুব শক্তিশালী ; তার সঙ্গে জ্ঞান যোগ করলে তারা আরো দ্বিগুণ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ওদের উপরে কিছুই করা যায়না ; তোমার মধ্যে ওদের দমন বা নষ্ট করবার মতো শক্তি না থাকলে ওদের এড়িয়ে চলাই ভালো। যদি নিতান্ত সংস্পর্শ ঘটে তখন জানবে যে বিপদের সম্ভাবনা। বাস্তবের স্তরে ওরা যখন ক্রিয়া করে তখন সর্বদাই সঙ্গে আনে একটা ঘুনপাড়ানি শক্তি ; কারণ ওদের চেতনার কেন্দ্র প্রাণের জগতে, বাস্তব রাজ্যে নয়, তাই ওরা মানবীয় বাস্তব চেতনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ বা খর্বিত হয়না।"

না আপনি এখানে বলেছেন ওরা খুব শক্তিশালী। সে শক্তি কেমন ধরনের ?

উত্তর : জড়ের উপর প্রাণের শক্তি। বস্তুত প্রাণশক্তি ছাড়া কোনো কিছুই করা যায়না, জড় যেমন অসাড় ও অচেতন তেমনি থেকে যায়। লোকে সংক্ষেপে যাকে বলে "শক্তি" তা হলো এই প্রাণশক্তি।

প্রশ্ন প্রাণশক্তির স্থানে কি ওর চেয়ে আরো কোনো উচ্চ শক্তি হতে পারেনা ?

উত্তর : না। প্রাণশক্তিকেই রূপান্তরিত ক'রে নিতে হয়। ওতে বলেছি যে প্রাণশক্তি ছাড়া কোনো কিছুই করা যায়না, কিন্তু ওর রূপান্তর আনা যায় ; অর্থাৎ তাকে ঐ সব সত্তাদের যন্ত্র হয়ে থাকার বদলে ভগবৎ ইচ্ছার যন্ত্র করে নিতে পারো। বাস্তবের রাজ্যে প্রাণকে বাদ দেওয়া চলেনা। সন্ন্যাসীরা সেই ভুলটি করে, তারা দেখে যে এ শক্তি যখন কামনাতে ভরা এবং ওর দ্বারা সেগুলো সার্থক হতে চায়, তখন তারা এই শক্তিকে বর্জন করে। একেবারে অসাড় ক'রে ফেলে ওর অস্তিত্ব পর্যন্ত ঘুচিয়ে দেয়। সকল রকম সন্ন্যাস-বিধিই একে বাদ দিয়ে অসাড় করে ফেলতে বলে। যেহেতু বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক

কাটার পক্ষে তাই সোজা উপায়; কিন্তু ওতে উদ্ভিদের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়। আসলে দরকার এই প্রাণশক্তিকে যথেচ্ছ কাজ করতে না দিয়ে বা অদিব্য শক্তিদের যন্ত্র হয়ে থাকতে না দিয়ে তাকে ভগবৎ যন্ত্রস্বরূপ করে নেওয়া এবং ভগবানের কাজেই দৃঢ়তার সঙ্গে নিযুক্ত করা। তা নিশ্চয়ই সম্ভব।

প্রশ্ন : আমরা যে এত ভয় পাই, তা কি ঐ সকল সত্তাদেরই কারসাজি?

উত্তর : হাঁ ছেলে, ঠিক তাই। ওরাই ভয় জিনিসটা এই জগৎকে উপহার দিয়েছে। এ তাদের প্রথম উপহার এবং তা খুব তেজালো। এর দ্বারাই তারা মানুষকে আবদ্ধ করে রেখেছে। প্রথমে তা নিয়ে আসে ভয়ের একটা স্পন্দন; তাতে যখন তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে তখন আস্তে আস্তে তোমাকে তাদের শক্তির কবলে টেনে নেয়। সে ভয়ের বিশেষ কারণও থাকেনা; অহেতুক ভয়ে তোমাকে এমন পেয়ে বসে যে তুমি উৎকণ্ঠায় কাঁপতে থাকো। অথচ কেন তা জানোনা, কারণ খুঁজে পাওনা। এই তাদের ক্রিয়া।

প্রশ্ন : তেমন ভয় পেলে তখন কি করা যাবে?

উত্তর : তুমি কে ও কেমন তার উপরে তা নির্ভর করে। ভয় ঘোচাবার অনেক উপায়।

যদি তোমার ভিতরকার চৈত্যের বা আত্মার সঙ্গে কোনো সংযোগ থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ডাক দেবে, তার আলোতে তা শুধরে যাবে। এটি জোরালো উপায়।

সেরূপ সংযোগ যদি না থাকে, কিন্তু তুমি যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী হও, অর্থাৎ তোমার মন যদি যুক্তিকে অনুসরণ করে চলে, তাহলে তারই দ্বারা নিজেকে বোঝাবে—যেমন করে শিশুকে বোঝাতে হয়—যে ভয় জিনিসটাই খুব মন্দ, আর যদি বাস্তবিক কোনো বিপদও এসে পাকে তবে ভয় নিয়ে তার সম্মুখীন হওয়া সব চেয়ে গুরুতর বোকামি। প্রকৃত বিপদ যদি আসে তবু তোমার সাহসের জোরেই তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারো; কিছুমাত্র ভয় পেলেই তুমি গেলে। তাই বুদ্ধি দিয়ে তোমার সেই অংশকে বোঝাবে যাতে ভয় করা থেকে সে নিবৃত্ত হয়।

আর তোমার মধ্যে যদি তেমন বিশ্বাস থাকে, যদি ভগবানে একান্ত সমর্পিত হতে পারো, তাহলে তো খুবই সোজা উপায়, ভগবানকে ডেকে বলবে "প্রভু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি যখন আমাকে চালাচ্ছ তখন কোনো কিছুতেই ভয় আর পাবোনা। আমি এখন তোমার, আমার জীবন তোমারই হাতে।" এতে তৎক্ষণাৎ কাজ হবে। এটাই সব চেয়ে ফলদায়ক, অর্থাৎ যথার্থই ভগবানে সমর্পিত হতে পারা। তাতে তখনই

সাফল্য আসে, ভয় স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে অনিষ্টকারী সত্তাও স্বপ্নের মতো উড়ে যায়। দেখতেই পাও যে ছুটে সে পালাচ্ছে...

কিন্তু কারো কারো মধ্যে প্রাণশক্তি এমন জোরালো যে তারা যোদ্ধার মতো মাথা উঁচু ক'রে বলে "শত্রু এলো সম্মুখে, তাকে করতেই হবে পরাজিত।" অবশ্য তার জন্য চাই যথোচিত জ্ঞান ও শক্তি। প্রাণশক্তি চাই দৈত্যের মতো। সকলের তা হয় না।

সুতরাং উপায় আছে নানারকম। সবই ভালো, যার প্রকৃতি যেটা বেছে নেয় আর সঠিকভাবে সেটি প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন জিমন্যাস্টিকের সময় ঝাঁপ খেতে গিয়ে আমি ভয় পাই কেন?

উত্তর আহা শোনো বলি, এর মধ্যে একটা কথা আছে। দুটি অবস্থাকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

যদি ভয়টা হয় প্রাণসত্তার দিক থেকে, তাহলে বুদ্ধির দ্বারা তা বুঝে যেমন আগে বলা হলো তাই করবে। আর যদি ভয় আসে দেহেরই দিক থেকে (তা প্রায়ই হতে পারে এবং দেহ একরকম ভাবে তা জানিয়ে দেয়) তাহলে তখন তার কথা মেনে নেবে, কারণ দেহ সেখানে ঠিক কথাই জানাচ্ছে, যদি তার মধ্যে মনের চিন্তা বা প্রাণের ভরকের কিছু ঘাত না থাকে। দেহ ঠিকই জানতে পারে যে কোনটা সে পারবে আর কোনটা পারবে না।— শুধু তাই নয়, যে কাজটি তুমি সহজেই করতে পারো, সেই কাজই করতে গিয়ে যদি একদিন দেখ যে দেহ তাতে বিমুখ হচ্ছে, নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছে, তাহলে সেদিন বিশেষ করে সেই কাজটি করবে না; নিশ্চয় কিছু কারণে—শরীর ক্রিয়ার ব্যাপারে বাস্তব কিছু কারণ—তুমি তখনকার মতো সে কাজের উপযুক্ত অবস্থাতে নেই; অতএব তখন সেই চেষ্টা করতে যাবে না। এখানে তার মানে শুধু ভয় নয়, দেহের অসম্মতি, বিমুখতা। কারণ মাথার মধ্যে যখন কিছু হচ্ছে না, মনে চিন্তা হচ্ছেনা যে "কি হবে, কি হবে"— সেরূপ চিন্তা এলে তাকে সরিয়ে দেবে, তার কোনো দাম নেই, বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝবে; কিন্তু দেহেতেই যদি বিমুখতা আসে, একটা অনিচ্ছা ও অসম্মতি, তাহলে তা জোর করে কখনই করতে যাবে না, করতে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটবে। ওটা যেন তোমাকে হুঁশিয়ার করে বলা যে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, জোর করতে গেলেই বিপদ। সুতরাং তা করতে যাবে না। তখন কোনো আয়ত্তরিতা না করে বলবে "আমি আজ ঠিক ধাতে নেই।"

কিন্তু যদি প্রাণসত্তার ভয় হতে থাকে, যেমন কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবো, "কি হবে, কি হবে।" সেটা বিশেষ কিছু নয়, তাকে হটিয়ে দেবে।

প্রশ্ন কিন্তু কখনো কখনো কুঁড়েমি এসেও সে কাজে বাধা দেয়।

উত্তর : হাঁ, সেটা হলো তামসিক বাধা, সে অন্য জিনিস। তোমার প্রকৃতি তামসিক হলে তার অন্য উপায় করতে হবে। তোমার চেতনাকে, ইচ্ছাকে, শক্তিকে সংহত করে এনে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে চাবুক মেরে বলবে এগিয়ে চলো, মার্চ অন্। যদি দেখ যে ভল্‌ট খেতে কুঁড়েমি আসছে, তখন নিজেকে আরো শক্ত কাজ দিয়ে বলবে ভল্‌ট খেতে চাইছ না ? বেশ তাহলে ১৫০০ মিটার দৌড় লাগাও !" কিংবা "ভার তুলতে (ওয়েট লিফ্‌টিং) মন চাইছে না তো ৪০০০ বার স্কিপিং করো।"

প্রশ্ন : লেখাপড়ার ব্যাপারেও কি তাই ?

উত্তর : নিশ্চয়। যে বইটা পড়তে মন লাগছে না তার জায়গাতে আরো দশগুণ কঠিন ও নীরস বই খুলে বসবে, যাতে মনোযোগ দিতে বাধ্যই হতে হয়। তেমন শুষ্ক নীরস জ্ঞানের বই অনেক আছে...যদি দেখ যে ইতিহাস বা ভূগোল পড়তে মন লাগছে না যা সহজেই চিত্তাকর্ষক, তাহলে ওর চেয়ে অনেক কঠিন পাঠ্যপুস্তক নেবে (না একজন শিক্ষকের দিকে চেয়ে বললেন বলতে সাহস করছি না, তোমাদের মাষ্টার মশাই রয়েছেন।) যার অন্তত আধখানাও পড়তে হবে। তখন ফিরে দেখবে যে এবার আগের বইটা পড়তে ভালোই লাগছে।

প্রশ্ন : কুঁড়েমি এলেও কি উপস্থিত কাজটা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় ?

উত্তর : তা নির্ভর করবে সেই কাজের উপর। এ হলো আবার অন্য দিকের কথা। কাজটা যদি নিজের ব্যক্তিগত না হয়ে সমষ্টির জন্য কাজ হয় তাহলে তা করতেই হবে, এ যাই কেন হোক। এটা ন্যায় নীতির প্রথম কথা। তোমাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, তুমি তার ভার নিয়েছ, তা করতেই হবে তোমাকে,—যদি নিতান্ত অসুস্থ হয়ে শুয়ে না পড়ো তাহলে তা করাই চাই। অল্প অসুস্থতা হলেও তা করতে হবে। অল্পসল্প অসুস্থতা আপনি সেরেই যায় নিঃস্বার্থ রকমের কাজ করতে থাকলে। প্রবল জ্বরে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তখন অবশ্য অন্য কথা। নতুবা যদি হয় "শরীর ভালো নেই, মাথাটা ধরেছে, হজমের গণ্ডগোল হচ্ছে, ঠাণ্ডা লেগেছে, কাশি হচ্ছে" ইত্যাদি,—তাতেও তোমার কাজটি করেই যাবে, নিজের কথা না ভেবে কাজের কথাটাই ভাববে, যথাসাধ্য ভালো ভাবে সে কাজ করে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে অসুস্থতা মানে ভারসাম্য বিগড়ে যাওয়া, তাই অপর দিক থেকে যদি অন্য একটা ভারসাম্য নিয়ে এসো তাহলে সে দোষটা সেরে যায়। ডাক্তারেরা রোগবীজাণু

প্রকৃতির সম্বন্ধে যতই কেন বলুক, রোগ মাত্রই, সকল ক্ষেত্রেই, সত্তার ভিতরকার ভার-সাম্যের বিপর্যয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেহক্রিয়ার মধ্যে, বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিপর্যয়। রোগ-বীজাণু নেই তা বলছিনা আছে অসংখ্য রকম বীজাণু, যত কিছু জানা গেছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কিন্তু তারাই শুধু যে অসুখের কারণ তা নয়, তারা তো সকল সময়েই রয়েছে। তাই হয়, দিনের পর দিন তারা উপস্থিত থাকলেও কিছুই তারা করেনা, অথচ হঠাৎ একদিন কেউ এসে তোমাকে চেপে ধরলে আর অমনি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে—কেন এমন হয়? যেহেতু স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি তোমার তখন আর নেই, ভারসাম্য কোথাও নষ্ট হয়েছিল, ভিতরের ক্রিয়াগুলো ঠিকভাবে হচ্ছিলনা। সেই ভারসাম্য আবার ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যায়, অসুখ থাকেনা। তদ্ভিন্ন রোগ সারেনা, ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনলে তবেই সারে।

তবে মানুষ আছে দুইরকমের বিভিন্ন প্রকৃতির...একরকম মানুষ তাদের ঐ অসাম্যকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, ছাড়তে চায়না। তুমি যতই কেন চেষ্টা করো বা চেষ্টার দ্বারা কোনোমতে তাদের সাম্যকে ফিরিয়ে আনো, তবু পরমুহূর্তেই দেখবে যে অসাম্য আবার ফিরে এসেছে, কারণ সেটাই তারা পছন্দ করে। তারা মুখে বলবে, "না, না, আমি রোগে ভুগতে চাইনা," কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের একটা অংশ অসাম্যকেই টেনে আনবে, ছাড়তে চাইবেনা। আবার অন্যরকম লোকেরা প্রকৃতই সাম্য রাখতে চায়, সাম্য ফিরিয়ে আনার শক্তি দিলে তখনই তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। তাদের নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির অভাবেই অসাম্যহেতু অসুস্থতা হচ্ছিল, তুমি যদি সেই জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে দাও তাহলে তারই আনুকূল্যে তারা সেরে উঠবে। কিন্তু যারা নিজের অবস্থা আঁকড়ে থেকে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে দেবেনা তারা সারেনা। সেই সব লোক দেখলে আমি বলি "তোমার রোগ তো সারছেনা, তাহলে ডাক্তারের কাছে যাও।" মজার কথা এই যে ডাক্তারকে তারা বিশ্বাস করে, যদিও সেখানে কাজটা হয় একই রকম! কিছু দার্শনিক ভাব থাকলে ডাক্তার মাত্রেই বলবে "এমনিই সারে; আমরা তো নিমিত্ত মাত্র, দেহই আপনাকে সারায়, যখন সে সারতে চায় তখন সেরে ওঠে।" অনেকের দেহ এমন যে একটা কিছু ওষুধ পেটে না দিলে আর বিশেষ যত্ন করা হচ্ছে এমন কিছু তোড়জোড় না করলে তাদের ভারসাম্য ফিরে পেতে চায়না। একটা আঁকালো বা দুষ্প্রাপ্য বা কঠিন রকমের প্রেস্‌ক্রিপশন্ দাও, তখন তাদের প্রত্যয় হবে যে এবার ভারসাম্য ফিরিয়ে না এনে আর গত্যন্তর নেই।

একজন নিউরোপ্যাথ (স্নায়ুরোগ চিকিৎসক) ডাক্তারকে আমি জানতাম, তিনি পেটের রোগ সারাতেন। তিনি বলতেন যে অল্প বিস্তর নার্ভাস বা স্নায়ুর দোষেই পেটের ব্যারাম হয়। তিনি ছিলেন ধনীদের ডাক্তার, নিষ্কর্মা ধনী লোকেরাই তাঁর কাছে যেতো। তারা কেবল বলতো "পেটে ব্যথা পাই, হজম হয়না" ইত্যাদি। ব্যথায় তারা খুব কষ্ট পায়,

ব্যথা ধরে থাকে, সেই সঙ্গে নানা উপসর্গ। ডাক্তার সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একজন মহিলাকে জানি, তিনি এই রকমের সব কথা বলাতে ডাক্তার তাঁকে বললেন "হাঁ, তোমার রোগটা বেশ কঠিন। তুমি বাড়িতে কোন তলায় থাকো? নীচের তলায়? তা বেশ, তাহলে তোমাকে এক কাজ করতে হবে। এক থোলো পাকা আঙুর কিনবে, (সকালে কোনো ব্রেকফাষ্ট খেওনা, ওতেই তোমার পেট খারাপ হয়), তখন ঐ আঙুরের থোলোটি হাতে নেবে, ঠিক এইভাবে। তাই নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে, সদর দরজা দিয়ে নয়, পাশের জানলা দিয়ে বেরোবে একটা টুলের উপর উঠে, দরজাটা বন্ধই থাকবে। রাস্তায় বেরিয়ে চলতে শুরু করবে, আর দুই পা মাত্র হেঁটে প্রত্যেক দফায় একটি করে আঙুর খাবে, একটির বেশি নয়। এমনি দুই পা অন্তর একটি করে আঙুর খেতে খেতে হাঁটতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত আঙুরগুলি ফুরিয়ে না যায়। ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরে আসবেনা। আঙুরের গুচ্ছটা হওয়া চাই বেশ বড়ো রকমের। আর ফিরবার সময়ে যেন গাড়ি নিওনা, হেঁটেই ফিরবে, নইলে আবার কষ্ট পাবে। ধীরে সুস্থে ঘরে ফিরে যাবে। এমনি যদি প্রত্যহ করতে থাকো, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তিন দিন পরে তুমি সেরে যাবে।" আর বাস্তবিক তাতেই মহিলাটি ভালো হয়ে গেল।

প্রশ্ন (একটি ছাত্র) কখনো এত বেশি কাজ থাকে যে কোনটা করব ভেবে পাইনা।

উত্তর: এত বেশি কাজ...সত্যিই খুব বেশি কাজ?

প্রশ্ন: নানা রকমের কাজ। যেমন, পড়াই তৈরি করতে হয় অনেকগুলো বিষয়ে।

উত্তর: সমস্ত দিনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এত সময় কি করো? হাত মুখ ধুতে স্নান সারতে, সাজগোজ করতে কত সময় যায়? মোটামুটি বলো, ঘড়ি ধরে নয়।

প্রশ্ন: তা প্রায় পোনে এক ঘন্টা।

উত্তর: খাওয়া সারতে কত সময় লাগে?

প্রশ্ন: পনের মিনিট।

উত্তর: প্রতি বারে? কবার খাও? দিনে চারবার? আচ্ছা বেশ, আর নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে কতখানি সময় যায়?...তা জানোনা।

প্রশ্ন আমি গল্পগুজব করিনা।

উত্তর : করোনা? আশ্চর্য, তাহলে তোমাকে তো উঁচুতে তুলে ধরতে হয়। কথাই বলোনা?

প্রশ্ন হাঁ, কথা বলি। কাজ যখন করি। বাজে গল্প করিনা।

উত্তর আর তোমার পাঠা পড়া শেষ করতে কত ঘন্টা সময় লাগে?

প্রশ্ন ভোরে কখনো কখনো আমি সাড়ে চারটের সময় উঠি।

উত্তর পড়বার জন্যে? তখন তো আধঘুমন্ত থাকো, নয় কি? পুরো জেগে ওঠো?...

না! আর সেইভাবেই পড়তে শুরু করে দাও?

প্রশ্ন : হাঁ, কোনো কোনো দিন।

উত্তর : আমি এই কথাতেই তোমাকে আনতে চাইছি।...একাগ্র ও সজাগ হয়ে কিছু করলে তুমি এক ঘন্টার কাজ দশ মিনিটে সারবে। সময় যদি বাঁচাতে চাও তো একাগ্র হতে শিখবে। মনোযোগ দিতে পারলে কাজটা ভালোভাবেই হবে আর তাড়াতাড়িও হয়ে যাবে। যদি আধ ঘন্টার মতো কোনো কাজ নিয়ে বসো—লেখার কথা বলছিনা—তখন যদি তোমার মন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, হাতের কাজটি ছাড়াও যদি আগে কি করেছ আর পরে কি করবে ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে থাকো, তাহলে সেই আধঘন্টার কাজ সারতে তিন গুণ সময় লেগে যাবে। অনেকগুলো কাজও যদি করবার থাকে, তবে যখন যেটি করছ কেবল সেটির মধ্যেই মনকে নিমগ্ন করতে শিখবে, তাহলে দেখবে এক ঘন্টার কাজ দশ মিনিটে সারা হবে।

তবে আমি কিন্তু ঠিক জানিনা যে যথার্থই তোমাকে অনেক কাজ করতে হয় কিনা, কাজগুলো আমার কাছে আনলে তবেই বলতে পারি; কিন্তু আমার মনে হয়না যে তোমার কাজের চাপ খুব বেশি। তোমাকে বিশ্বাস করছি না তা নয়। বলতে পারিনা ক্লাসের মাষ্টাররা বেশি কাজ ঘাড়ে চাপায় কিনা। তবে যতই কাজ থাক, একাগ্রতা জিনিসটি শিখে নেবে, যখন যা করছ তার উপরেই নিবিষ্ট থেকে সকল শক্তি প্রয়োগ করবে। এতে অন্তত অর্ধেক সময় বেঁচে যাবে। তাই তুমি যদি বলো যে আমার অনেক কাজ, আমি বলবো, "তোমার একাগ্রতা কম তাই অমন মনে হচ্ছে।"

প্রশ্ন : (অন্য ছাত্র) আমি দেখেছি জটিল কোনো অঙ্ক কষতে বসে উত্তরটা কখনো কখনো সহজেই মিলে যায়, আবার কখনো বা অনেক বেশি সময় লেগে যায়।

উত্তর : ঠিক কথা, তোমার একাগ্রতার উপরেই তা নির্ভর করে। নিজেকে লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারবে ; যখন উত্তরটা আসছে না, তখন তোমার মাথার ভিতরটা তেমন পরিষ্কার নেই, কোথায় কুয়াশা ঘিরে আছে আর তার মধ্যে তুমি ঘোলাটে স্বপ্নের অবস্থায় রয়েছ। ঠেলে ঢুকতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন তুলোর বস্তার মধ্যে ঢুকছ, কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না। এমন অবস্থা ঘন্টার পর ঘন্টা থাকতে পারে।

একাগ্রতা আনা মানে সেই কুয়াশার মেঘকে সরিয়ে দেওয়া। সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিকে গুটিয়ে এনে একটা বিন্দুর উপর স্থির করে রাখবে, সে সময়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টামাত্র করবে না। কেবল প্রশ্নটার উপরে মন রাখবে—কিন্তু কেবল তার উপরদিকটাতেই নয়, তার ভিতরের দিকেও দেখবে প্রশ্নের পিছনে কি লুকিয়ে আছে। মনের সমস্ত শক্তিকে যদি তারই উপর কেন্দ্রীভূত ক'রে এমনভাবে স্থির হয়ে থাকো যেন কোনো কঠিন দেয়ালকে বিদ্ধ করতে যাচ্ছ, তাহলে হঠাৎ এক সময় উত্তরটা আপনি এসে যাবে। এই হলো ঠিক উপায়। নইলে যদি কেবল ভাবতে থাকো যে এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, কোনটা ঠিক...তাহলে কিছুতেই উত্তর মিলবে না, অথচ অনেক ঘন্টা কেটে যাবে। মনের শক্তিকে এমন দৃঢ়ভাবে একটা বিন্দুতে এনে ফেলা চাই যাতে প্রশ্নের কথাগুলো ভিতর দিয়ে তার অন্তরাল পর্যন্ত ফুঁড়ে তা ঢুকতে পারে। সেখানে যা মিলে যাবে তারই দিকে ঝুঁকবে।

যেদিন মাথা কিছু ঘোলাটে থাকে সেইদিনই অমন অবস্থা হয়। মনে হয় যেন তুমি যাকে ধরি ধরি করছ তা পিছলে সরে যাচ্ছে। অবশ্য যা তোমার পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব, এমন বিদ্‌কুটে কাজ তুমি পারবে কেন। তখন যদি তোমার শিক্ষককে গিয়ে বলো, "আমি ওটা পারলাম না, চেষ্টা যথেষ্ট করলাম কিন্তু আর সময় পেলামনা," তাহলে নিশ্চয় তিনি তোমাকে বকুনি দেবেন না। কিন্তু তা নয়, শতকরা নিরানব্বুই স্থলেই মনের ভিতরকার আধা জড়তা-হেতু মনে হয় যে আমাকে বিস্তর কাজ করতে হচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখবে যে মনের ভাবটা ঐ ধরনের, আর এমন একটা ঘোলাটে অবস্থা যেন তুমি তুলোর বস্তার মধ্যে, ঘন মেঘের মধ্যে ডুবে আছ : কিছুই পরিষ্কার নয়।

কাজের ভিতরকার প্রকৃত সার্থকতা মানে আর কিছুই নয়, মনের শক্তি স্বচ্ছ হওয়া। কারণ শিক্ষণের সময় যা কিছু শিখবে, রীতিমত ভাবে তা ব্যবহারিক কাজে না লাগলে কিছু পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্ধেক অন্তত বেমালুম মুছে যাবে। কেবল একটা জিনিস থেকে যাবে, মনের চিন্তাক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করে আনা। তাই

হলো শিক্ষার কাজের প্রকৃত সুফল : মস্তিষ্ক খাটানোর বৃত্তিকে সাবলীল করা। তাই যদি অমন ষোলোটে অবস্থায় মধ্যেই থাকো তাহলে বহু বছরের শিক্ষাও কোনো কাজের হবে না। যেমন ছিলে তার চেয়ে বুদ্ধি কিছুমাত্র ধারালো হবেনা। কিন্তু যদি মাত্র আধ ঘন্টার জন্যও কোনো নীরস বিষয় নিয়ে একাগ্র মনঃসংযোগ করতে পারো, যেমন ধরো কোনো ব্যাকরণের সূত্র নিয়ে (যদিও তার চেয়েও অনেক কঠিন বিষয় আছে), আর তলিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করো, কেবল মুখস্থ করা নয়, যদি ভেবে দেখ যে, "তাইতো, কেন এমন সূত্রটি করা হয়েছে?" আর তার সদুত্তরটি খুঁজে পাও তবেই তাতে খুব কাজ হবে। "যিনি এই সূত্রটি রচনা করেছেন তিনি এ শব্দটার পরে ঐ শব্দটা কেন বসালেন তাই আমি বুঝতে চেষ্টা করছি : নিশ্চয় তিনি জেনেছিলেন যে এই ভাবে বললেই জিনিসটা সব চেয়ে কাজের হবে"। তার পর বুঝতে বুঝতে তখন হঠাৎ বলে উঠবে : "এবার বুঝেছি ওর ভিতরকার কথাটা।" এমনি করেই অর্থটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তাই বলি : বুঝতে পারা মানে বুদ্ধিকে শানানো। এমনি অনেকবার করতে থাকলে ক্রমে তুমি বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠবে। এইভাবেই শিক্ষা সার্থক হয়, কেবল কথাগুলো মাথায় ভরে নিলে কাজ হয় না।

প্রশ্ন যারা বিজ্ঞানের সেবা করে, তাদের শিল্পবোধ থাকেনা কেন? দুটো কি পরস্পর বিরোধী?

উত্তর : না, তা নয়।

প্রশ্ন কিন্তু সাধারণত তাই দেখা যায়।

উত্তর : দু'রকম মানুষ এক স্তরের নয়। মাথার ভিতরকার যে টর্চ লাইট, তার সীমিত রশ্মিটুকু পড়ে কেবল আপন আপন লক্ষ্যবস্তুর উপর। বিজ্ঞানীর যে রশ্মি তা একই ভাবে ফেলা থাকে কেবল তার লক্ষ্যবস্তুতে, অর্থাৎ জড়ের রাজ্যে ও তারই অন্তর্গত সব কিছুর দিকে। কিন্তু যারা কল্পনাকুশলী হয় তারা তাদের আলো ফেলে উপরের দিকে, সেই দিকেই যত কিছু শিল্প ও সাহিত্যের প্রেরণা। তা অন্য স্তরের জিনিস, সেখানে সূক্ষ্মের রাজ্য, নিতান্ত বাস্তব স্থূলের কারবার নয়। ঐদিকে তারা নিজেকে খুলে রাখে ওখানকার আলো পাবার আশাতে। কিন্তু দুজনেরই যন্ত্রটা সেই একই। তুমি যে কোনো দিকেই তার রশ্মি ফেলতে পারো। তবে যখন তুমি একটা দিক নিয়েই একাগ্র হতে অভ্যাস

করো তখন আর তুমি নবনীর থাকনা, ঐটি ছাড়া অন্য কোনো দিকে তা একাগ্র অভ্যাস করতে পারোনা।

কিন্তু তবু একসঙ্গে দুই রকমই করা যায়। যে সময়ে বিজ্ঞানচর্চা করছ তখন তাতেই নিবিষ্ট হলে, আবার সাহিত্য যখন করছ তখন তাতেই নিবিষ্টতা আনলে। যন্ত্রটা তো একই, কেবল প্রয়োগের পার্থক্য। একাগ্রতার শক্তিটি থাকলে তাকে এক দিক থেকে অন্য দিকেও প্রয়োগ করতে পারো, দুই দিকেই ফল পাবে। বিজ্ঞানের সময় তারই রীতি আর শিল্পের সময় তারই রীতি অনুসরণ করবে। যন্ত্রও এক আর শক্তিটাও এক। যারা জানে না তারাই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কব্জার এক দিকে নড়চে পড়ে যায়, সে দিকটা আর খোলে না। দুই দিক খোলা হলেই তা সাবলীল থাকে। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক বিজ্ঞানী ব্যক্তিরও বিশেষ একটা শিল্পানুরাগ রয়েছে, আর শিল্পীরও রয়েছে বিজ্ঞানানুরাগ। তারা জানে যে এতে কোনো ক্ষতি হয়না, বরং তাদের একই নৈপুণ্যকে দুই দিকে প্রয়োগ করা চলে।

আসল কথা বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত ও একাগ্র করতে হবে, সেই ভাবেই তার উন্নতি হওয়া চাই। দেহের ক্রিয়ার দিক থেকে চাই ইচ্ছা, তাকে অটুট করে গড়তে হবে। আর বুদ্ধির দিক থেকে চাই অটুট একাগ্রতা। ইচ্ছা আর একাগ্রতা দুটোই থাকলে তুমি হবে প্রতিভাবান, কিছুতেই তোমাকে ঠেকাতে পারবে না।

—শ্রীমা

প্রসঙ্গত

এপ্রিল ১০, ১৯৬৮

অর্থ নিয়ে যে লড়াই, তা পরস্পরবিরোধী "মালিকদের" লড়াই, অথচ প্রকৃতপক্ষে অর্থের মালিক কেউই নয়। আমার অর্থ এই ভুল ধারণাটাই যত কিছু অনর্থ ঘটাচ্ছে। যেমন "শক্তির" বেলাতে, তেমনি অর্থের বেলাতেও তা কারো নিজের "অধিকারভুক্ত" মনে করা উচিত নয়; তোমাকে তা দেওয়া হয়েছে কাজে প্রয়োগ করবার জন্য, তাই বুঝেই তোমাকে চলতে হবে...তার মানে "যেনেওয়ালার ইচ্ছা" বুঝে, অর্থাৎ নির্ব্যক্তিক ও আলোকপ্রাপ্তভাবে। তুমি যাতে তার যথোচিত সঞ্চালন ও প্রয়োগের উপযুক্ত যন্ত্র হও, তার জন্যই যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আসে তোমার কাছে, আর সেই কাজই তোমার করা চাই। তাই হলো অর্থের সার্থকতা।

সঠিক মনোভাব হবে এই রকম: অর্থ হলো পৃথিবীর কোনো কাজ করবার একটা শক্তি, এবং সে কাজের দরকার যাতে পৃথিবী দিব্যশক্তি গ্রহণের ও তাকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, এবং সেই কাজ করবার এ শক্তি তাদেরই হাতে থাকবে যাদের এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও সত্য দৃষ্টি রয়েছে।

প্রথম কথা (বা একেবারে গোড়ার কথা) এই যে নিজস্ব অধিকারবোধ আদৌ থাকাই চলবেনা। বস্তুত এ কথার মানে কি যে, "এ টাকা আমার"?...আমি বুঝিনা। কি দরকার আছে ওকে আমার জিনিস বলে ভাববার?—যাতে আপন খুশিতে যখন যেমন ইচ্ছা হবে সেই ভাবে তার স্বাধীন ব্যবহার করতে পারবে। এই তো কথা। তা ছাড়া কেউ কেউ চায় যতটা পারে স্তূপীকৃতভাবে তাকে কোনোখানে সঞ্চিত করে রাখতে।... ওটা একটা ব্যাধি। সঞ্চয়ের দ্বারা নিশ্চিন্ত হতে চাইছে যে আমার টাকা জমানো রইল। কিন্তু তার বদলে যদি মনে করা যায় যে আমি হচ্ছি ওর আদানের এবং প্রদানের একটা আধার, সে আধার যতই ব্যাপক হবে (ব্যক্তিগত হয়ে না থেকে), যতই নির্ব্যক্তিক ও বিস্তারিত হবে ততই তা শক্তিবর্ধক হবে (এখানে "শক্তি" রূপান্তরিত হচ্ছে টাকাকড়ি ও নোট প্রভৃতি রূপে) তার সর্বোত্তম প্রায়োগিক সার্থকতা অনুসারে, "সর্বোত্তম" মানে সর্বসাধারণ উন্নতির দিক দিয়ে; দৃষ্টি যতই ব্যাপক ও বুদ্ধিগত ও আলোকপ্রাপ্ত হবে, ততই ওর সদ্ব্যবহারও হতে পারবে, অহংএর মিথ্যা প্রয়োজনে নয়, পৃথিবীর সাধারণ উন্নতি ও বিবর্তনের প্রয়োজনে। অর্থাৎ দৃষ্টিও যত প্রসারিত হবে সার্থকতাও ততই প্রসারিত হবে।

পূর্বোক্ত মিথ্যা ক্রিয়ার পিছনে আছে কিছু সত্য জিনিস—একটা আনন্দ যে আমি কাজটা এমন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুভাবে করতে পারছি যাতে সব চেয়ে কম অপব্যয়ে সব চেয়ে বেশি সুফল মেলে। এমন লক্ষ্য থাকলে তাতে যথেষ্ট উৎসাহ আসে। যারা অনেক সঞ্চয় নিয়ে অনেক বড়ো রকমের কাজে খাটাতে চায় তাদের পক্ষে এরূপ দৃষ্টিই কাম্য। আবার কেউ কেউ এমন যে তারা বেশি খরচ করবার জন্যই বেশি পেতে চায়; সে অন্য কথা, তাদের প্রকৃতি উদার হলেও তা সুনিয়ন্ত্রিত নয়।...কিন্তু যেখানে প্রয়োগের যথার্থ প্রয়োজন, প্রকৃত অর্থ ঢালা দরকার, সেখানে তা করতে পারার আনন্দ, এও খুবই ভালো জিনিস। সে আনন্দ যেন রোগ দূর করার মতো, মিথ্যার জায়গাতে সত্য স্থাপনের মতো, দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করার মতো, একই রকমের কাজ কৃত্রিম ও অবান্তর যে প্রয়োজন অস্বাভাবিক তার জন্য ব্যয় করা নয়, তার বদলে এমন কিছু সম্ভাবনা যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তার জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন আছে, দরকার এটা ওটা সেটা জরুরী ব্যাপারে, কোথাও বা সুব্যবস্থা আনতে এটা মেরামত করতে, ওটা গড়ে তুলতে, সেটা সাজিয়ে সুষ্ঠু করতে,—এ সবই ভালো কাজের মধ্যে। আমার মনে হয় এ সব কাজের বাধ্যমস্বরূপ হতে প্রত্যেকের ভালোই লাগবে, যেখানে প্রকৃত প্রয়োজন সেখানে অর্থ পৌঁছে দিতে। যারা তা করতে চায় তাদের অর্থ আমদানির প্রয়োজন হয়, যদিও তা হীন স্বার্থপরের কাজের মতো দেখায়।

ব্যয় করার জন্য অর্থ চাওয়া (যদিও দুইই অজ্ঞান ও অন্ধ ক্রিয়া) এই দুটিতে মিলে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার আনে। তা ভালোই কথা।

অতঃপর এসে পড়ে অর্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রশ্ন।

তার জন্য দরকার হয় সহকারীদের, যাদের আছে সাফ মাথা ও পূর্ণ সামর্থ্য, যাতে তুমি সব দিক একসঙ্গে সামলাতে পারো। তবেই অর্থের সমস্যার একটা স্থায়ী রকমের কিনারা হতে পারে।

অর্থ কোনো ব্যক্তির জিনিস নয়, তা সমষ্টির সম্পদ, আর তাদের হাত দিয়েই তার ব্যবহার হওয়া উচিত যাদের তেমন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন দৃষ্টি আছে। তার সঙ্গে আরো বলব, শুধু সেই কথাই নয়, সত্য দৃষ্টিটাও থাকা চাই, অর্থাৎ আপন খেয়াল মতো ব্যবহার এবং প্রকৃত বিশ্বোন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকা চাই। কিন্তু তা হলো খুঁটিনাটির কথা, কারণ তাতে ভুলও হয় আর অপপ্রয়োগও হয়ে থাকে; তবে তাতে শিক্ষা হয় উল্টোদিক থেকে।

(নীরব থেকে)

আমার সর্বদা মনে পড়ে ক-এর কথা (তিনি ছিলেন লোকহিতের বিরোধী), তিনি বলতেন: লোকহিত করতে গেলে তাদের দুঃখকে আরো স্থায়ী করা হয়, কারণ

দুঃখ না থাকলে যে লোকহিত জিনিসটার অস্তিত্বই থাকে না। তোমরা তো জানো সেই প্রখ্যাত হিতৈষীর কথা, কি যেন নাম? যিনি ব্যাঙ্গারিনের যুগে "Little sister of charity" গড়েছিলেন?

প্রশ্ন : ভ্যাঁসাঁ দা পল।

উত্তর : হাঁ, তিনি। ব্যাঙ্গারিন তাকে বলেছিলেন : "এর আগে এত বেশি গরিবরা ছিলনা, তুমি ওদের নিয়ে লাগতেই আরো সংখ্যা এত বেড়ে গেল।" (মা হাসলেন)

(কিছুক্ষণ পরে)

আমি নতুন করে ভাবছি আমার আর্থিক ব্যাপার নিয়ে। অরোভিলে ঐরূপভাবেই জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত,—তবে তার জন্য মানুষ প্রস্তুত কিনা সন্দেহ।

প্রশ্ন : জ্ঞানী লোকের দ্বারা পরিচালনা মেনে নিলে তা সম্ভব হতে পারে।

উত্তর : হাঁ। প্রথম কথা এটা সকলকে মানতে হবে যে একটা অদৃশ্য উচ্চশক্তি আছে (অর্থাৎ অনেকের অজানা এক উচ্চ চেতনাস্তরের যে শক্তি, তার যে নামই দাও, যা অসত্যের শক্তির পরিবর্তে সম্পূর্ণ খাঁটি সত্যের শক্তি) সেই শক্তিই পারে সকল পার্থিব ব্যাপারকে সত্য ও সুন্দর ও আনন্দময় করে সুনিয়ন্ত্রিত করতে, সকল পার্থিব শক্তির চেয়ে। এ কথা যদি মেনে নিতে পারো...

সে এমন জিনিস নয় যা নিয়ে কপটতা করা চলে। কেউই তা করতে পারেনা ; তোমার সে শক্তি আছে কিংবা নেই, কারণ (হেসে বললেন) যে-কোন একটা কাজেই তার ফাঁকি বেরিয়ে পড়বে। তা ছাড়া তাতে যথার্থ শক্তিও মেলেনা ক বলেছেন : যে প্রকৃত শক্তির অধিকারী হবে (এখানে প্রত্যেকের চেতনাশক্তির মাত্রা অনুসারে উচ্চ-নীচ পর্যায় ধরেই বলেছেন), যে কিংবা যারা তেমন উপরে উঠেছে তাদের নিজেদের দিকের প্রয়োজন থাকবে সব চেয়ে কম ; যতই তাদের প্রকৃত অধিকার সম্বন্ধে দৃষ্টি বাড়বে ততই তাদের নিজেদের প্রয়োজন কমে যাবে। এ খাঁটি কথা, এটা আপনা হতেই হবে, চেষ্টার দ্বারা নয়। চেতনা যতই প্রশস্ত ও সর্বদর্শী হবে, ততই তার আপন বাস্তব চাহিদা গুটিয়ে আসবে আপনা হতে—কারণ তার কোনো গুরুত্বই থাকবে না। সমস্তই কমে আসবে, ও পরে জড়ের উন্নতি হলে ক্রমে তাও বদ্‌লে যাবে।

ও জিনিস সহজেই চেনা যায়, ও নিয়ে অভিনয় করা দুঃসাধ্য।

আর দ্বিতীয় জিনিস হলো দৃঢ় নিশ্চয়তার শক্তি। অর্থাৎ সর্বোচ্চ চেতনা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে আপনা হতে যে দৃঢ়নিশ্চয়তা আসে তা সকল মধ্যবর্তী স্তরের চেয়ে অনেক বেশী। সহজ কারণেই সেই রূপান্তরকারী শক্তি সকল স্তরের চেয়ে বেশি হয়। এ নির্ভুল কথা। এই দুটি জিনিস এমন যাতে কোনোরকম মেকি থাকা অসম্ভব হয়। আমি বলছি একটা সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে।

আর যখন তুমি নেবে আসবে ঐ উচ্চতা থেকে, অমনি তখনই যত কিছুর প্রভাব এসে মিশতে শুরু হবে (মিশ্রণের ভঙ্গী করলেন), তাই হলো তার অভ্রান্ত লক্ষণ ; এমন কি অল্প একটু অবতরণ (এমন কি উচ্চমানস ও উচ্চবুদ্ধিতেও) এই সব প্রভাবের কাটাকাটি হতে থাকবে। কেবল বিশুদ্ধ চূড়াতেই থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত দৃঢ়নিশ্চয়তা। তার বদল আর সকল কিছুতেই হবে আপোষ নিষ্পত্তি, যা ডেমোক্রেসির চেয়ে অধিক কিছু নয়, অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যায় সর্বনিম্ন স্তরের কর্তৃত্ব (আমি বলছি সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের কথা)।

পরমতম চেতনার প্রতিনিধি স্বরূপ যদি কেউ না থাকে (তাও কি হতে পারেনা ?), তাহলে তার বদলে অল্প কয়েকজনের কর্তৃত্ব (পরীক্ষা স্বরূপ)—চার বা সাত কি আট জনের—যাদের ভালো বোধশক্তি আছে। "বুদ্ধির" চেয়ে এখানে "বোধির" দরকার বেশি, তা প্রকাশ পাবে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে। ব্যবহারিক দিক দিয়ে তাতে অসুবিধা আছে, কিন্তু তা বোধহয় সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি হবে। মাঝামাঝি সব কিছু ব্যবস্থাই নিষ্ফলা বলে প্রমাণ হয়ে গেছে, যথা দৈবতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ইত্যাদি। বাকী আধুনিক পূর্বোক্ত দুটিও ব্যর্থ হতে চলেছে।...তলিয়ে দেখলে ঐ দুটিকে গণশাসন বলা যায় না ; ওতে এমন কোনো একজনের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হয় যার মাথা আছে, যেমন লেনিন। কিন্তু ওর সবগুলিই অসার্থক বলে বোঝা গেছে। সার্থক হতে পারে একমাত্র সত্য চেতনা যা তার নিজের মতো কয়েকটি আধারকে বেছে নিয়ে তাদের মাধ্যমে কাজ করতে পারে, যদি একজন মাত্র না হয় ("একজনে" যথেষ্ট হয়না, তাকেও একটা গোষ্ঠী বা কর্মীদল গড়ে নিতে হয়)। যে কোনো সমাজের মানুষই এমন চেতনার অধিকারী হতে পারে : এ তো কোনো জন্মার্জিত জিনিস নয়, ব্যক্তিগত প্রয়াসে এবং উন্নতিতে জন্মায়। বস্তুত রাজনীতির পক্ষে এ এক বিশেষ পরিবর্তনের লক্ষণ যে এখন আর জন্মগত বা বর্ণগত পরিচয় নিয়ে কোনো কথাই নয়,—সে ধারণা ঘুচে গেছে, যে কেউই উচ্চ চেতনাতে পৌঁছবে তারই হবে শাসনাধিকার, অন্য কারো নয়। এরূপই হবে সত্য দৃষ্টি।

কিন্তু যারা এমন পরীক্ষার প্রবর্তন করতে যাবে তাদের দৃঢ়প্রত্যয় থাকা চাই যে সম্পূর্ণ বাস্তব ব্যাপারেও উচ্চ চেতনাই সর্বাপেক্ষা সুবিচারক্ষম। ভারতের অবনতি এই ভুল ধারণা থেকেই হয়েছে যে উচ্চ চেতনা কেবল উচ্চ ব্যাপারেই কাজ করে, পৃথিবীর নিম্নতর ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই, এ সকল স্থূল বিষয়ের সম্বন্ধে সে চেতনা কিছু বোঝেই না। এতেই সব নষ্ট করেছে। এ ভুল পুরোপুরি ঘোচানো দরকার। উচ্চ চেতনাই সব চেয়ে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়—এবং প্রকৃত সত্য দৃষ্টিতে—সেই জানতে পারে যে বাস্তব ব্যাপারেও বাস্তবিক কিসের প্রয়োজন।

এই নূতন ধারণাটি নিয়ে নূতন রকম শাসনবিধির পরীক্ষা করা যেতে পারে।

এই আশ্রম রইল অগ্রণী হয়ে, প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়ে।
আর অরোভিল হচ্ছে সমষ্টিগত উপলব্ধির এক প্রচেষ্টা। *

—শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S. A. I. C. E-থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

বৈরাগড়ের শিক্ষা শেষ হইল। স্কোয়াড্রন পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বৈরাগড়ে রাখিয়া আসিল শুধু কয়েকটি ভগ্ন বা অগ্নি-দগ্ধ বিমান আর কয়েকজন বৈমানিকের ভস্মীভূত দেহ।

ক্যাম্বেলপুরে আসিয়াই পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুতি সুরু। এবারকার যাত্রা আবার আর একটি দেশীয় রাজার রাজত্বে। গাইকোয়াড়ের রাজধানী গোয়ালিয়র সহরের দশ-বার মাইল দূরে—মহারাজপুর, সেখানে এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যখানে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র। কিছুদূরে ঘন বন-জঙ্গল, নদী-নালা আর ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়গুলির মধ্যে সংকীর্ণ গিরিখাত। নদী সবসময় জলপূর্ণ নয়—বর্ষায় দুকূলভাসান নদী, আর গ্রীষ্মে নদীখাল সব জলশূন্য, প্রান্তর জুড়িয়া চতুর্দ্দিকে গভীর খাদ। যখন বৃষ্টি নামিল তখন প্রচণ্ড বেগে খাদ দিয়া জল বহিয়া গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে এখানে সেখানে কিছু জল শুধু রহিয়া গেল। খরার সময় হয়ত নদীর মধ্যে সেই জলটুকুও নাই। বর্ষায় গাছপালাগুলি সজীব—অন্যসময় গাছপালাগুলিও মাটির সাথে প্রায় এক রাঙা—ধূসর বর্ণ। সেই সময় প্রান্তরে বা নদীর বুকের উপর যদি ধূসর-পরিচ্ছদে কোন মানুষ একেবারে স্থির হইয়া থাকে, তবে বিমান হইতে তাহার অস্তিত্ব নজরে আনা একেবারে অসম্ভব। চতুর্দ্দিকের ধূসর বর্ণের সাথে তাহার অস্তিত্ব মিলিয়া যায়। সে যখন গতিবান হইল—তখনই তাহাকে দেখা যাইবে নতুবা উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়াও তাহার অস্তিত্ব গোপন রহিল। সেই কারণে (Guerilla War) গোপন-যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের তুলনায় এই প্রকার স্থান অনেক প্রকৃষ্ট।

এবার স্কোয়াড্রনের সকল বৈমানিকরা জরুরী স্পেশাল ট্রেনে ক্যাম্বেলপুর হইতে মহারাজপুর অভিমুখে রওনা হইল। আমরা একচল্লিশজন বিমানে চলিলাম—দুইখানা হার্ভার্ড শিক্ষা-বিমান এবং অন্য আঠারখানা ভল্টি ভেনজিয়ান্স।

সকল প্রকার বন্দোবস্ত ভালভাবে করার জন্য আমরা চারজন হার্ভার্ড শিক্ষা-বিমানে পূর্ব্বদিন রওনা হইয়া সেই দিনই মহারাজপুর বিমানঘাটিতে পৌঁছাইলাম। পরদিন ভল্টি ভেনজিয়ান্স বিমানগুলি রওনা হইবে ঠিক হইল, এবং বিমানগুলিকে রওনা করাইয়া দিবার পর স্পেশাল ট্রেন সমস্ত বৈমানিকদের লইয়া রওনা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা পাকা করা হইল।

মহারাজপুরে পৌঁছিয়া এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়া গেল—সেখানে বৈমানিকদের থাকিবার জন্য ছাউনির বন্দোবস্ত তখনও শেষ হয় নাই। অবতরণ-পথের এক প্রান্তে তাঁবু ফেলিয়া ছাউনি বসাইবার কথা। সমস্ত কাজের ভার ছিল গোয়ালিয়র রাজসৈন্য-বিভাগের উপর এবং তখনও পর্য্যন্ত তাহারা মনস্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা চারজন পৌঁছিবার পর তাহারা তাঁবু ইত্যাদি সংগ্রহে মন দিল।

দুইদিন পরে স্পেশাল ট্রেন সমস্ত বৈমানিকদের লইয়া গোয়ালিয়রে পৌঁছিল। এবার ট্রেনে আগত বৈমানিকদের ছাউনিতে আসার ব্যবস্থা হইল।

এদিকে আঠারখানা ভল্টি ভেনজিয়ান্স বিমান তখনও পৌঁছায় নাই—তাহাদের কোন সংবাদও নাই। আমরা কয়েকজন বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম—বৈমানিকরা সকলে না পৌঁছান পর্য্যন্ত কোন কিছুই করা সম্ভব হইতেছিল না। স্পেশাল ট্রেনে বৈমানিকরা আসার পর, জানা গেল বিমানগুলি পূর্ব্বনির্দ্ধারীকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী সময়মতই ক্যাম্বেলপুর ত্যাগ করিয়া মহারাজপুর অভিমুখে রওনা হইয়াছে। ক্যাম্বেলপুর হইতে মহারাজপুরের দূরত্ব হাজার মাইলেরও কম। ক্যাম্বেলপুর হইতে সরাসরি আসিলে চারঘণ্টার পথও নয়। চারঘণ্টার পথ কি দুই দিনেও অতিক্রম হইল না?

তৃতীয় দিনে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী দিল্লী হইতে সংবাদ দিলেন যে পরদিন তিনি তেরখানা বিমানসহ মহারাজপুরে পৌঁছাইবেন। পরদিন বিমানগুলি পৌঁছিবার পর অন্য পাঁচখানা বিমানের কথা জানা গেল।

ক্যাম্বেলপুর পরিত্যাগ করিয়া বিমানগুলি সব একসাথে উড়িয়া লাহোর অভিমুখে চলে। পথে তাহারা ঝড়-বৃষ্টির ঘন মেঘ দেখিতে পায়। ঝড়-বৃষ্টির মেঘ পাঁচশত ফিট্ হইতে পনর হাজার ফিট পর্য্যন্ত স্তরে-স্তরে সাজান ছিল। লাহোরের যত নিকটে তাঁরা আসিতে থাকেন মেঘের স্তর ততই দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হইতে থাকে। তারপর লাহোরের সন্নিকটে মেঘ অশান্ত হইয়া প্রচণ্ড ঝড়ে পরিণত হয়—আর সেই ঝড়ে আমাদের পাঁচখানি বিমান ভূপাতিত হয়। ঐ পাঁচখানা বিমানের আরোহী ছিলেন এগারজন—পাঁচজন বিমান চালক, পাঁচজন নেভিগেটর ও একজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক—ওয়াদেকর। ওয়াদেকরের বিমানে আসার কোন কথাই ছিলনা—তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শেষ মুহূর্ত্তে তাঁকে বিমানে স্থান দেওয়া হয়।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে না বলিলে, প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ক্যাম্বেলপুর হইতে রওনা হওয়ার পূর্বে প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া কয়েকটা পাঠান কুকুর আমাদের বিমান-গুলির পাশে রাত্রে আসিয়া জড় হইত ও আকুল হইয়া কাঁদিত। তাড়াইয়া দিলেও আবার ফিরিয়া আসিত ও কাঁদিতে আরম্ভ করিত। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাড়ান যাইত না। আবার এদিকে মহারাজপুরেও—তেরখানা বিমান চতুর্থ দিনে না পৌঁছান পর্য্যন্ত প্রত্যেক

রাত্রে কোথা হইতে কতকগুলি কুকুর অবতরণ-পথের উপর আসিয়া কাঁদিতে থাকিত। ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম, রাত্রে কুকুরের কান্না কোন অমঙ্গলের সঙ্কেত। তেরখানা বিমান মহারাজপুরে পৌঁছিবার পর রাত্রে ক্রন্দনরত কুকুরগুলিও অন্তর্ধান করিল। এই ব্যাপার কি কাকতালীয়? না এর পিছনে কোন গূঢ় সত্য নিহিত আছে? জানিনা। তবে দেখিয়াছি, যখনই রাত্রে কুকুর কাঁদিয়াছে তখনই একটা কিছু অমঙ্গল ঘটনা ঘটিয়াছে।

স্পেশাল ট্রেনে বৈমানিকরা পৌঁছিবার পর, গোয়ালিয়র রাজ-সৈন্য বিভাগের কর্তারা তাঁবুগুলি পৌঁছাইয়া দিলেন। তখন ঠিক হইল যে বৈমানিকরা তাহাদের বাসের জন্য নিজেরাই তাঁবু খাটাইয়া লইবে। ছোটগুলিতে থাকিবে দুইজন ও বড়গুলিতে তিন বা চারজন।

দেখা গেল অবতরণ-ক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে ছাউনি বসাইবার সব বন্দোবস্তই করা হইয়াছে, শুধু তাঁবুগুলিই খাটান হয় নাই।

ইংরাজীতে তাঁবু খাটানকে বলে to pitch a tent অর্থাৎ তাঁবুটা ছুঁড়িয়া যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া।

ট্রেনে নিষ্কর্মা হইয়া দুইদিন বসিয়া থাকিবার পর বৈমানিকরা সকলেই শ্রান্ত হইয়া ছিল। তাঁবু খাটাইতে হইলে প্রত্যেক তাঁবুতে ছয় কিলো ওজনের হাতুর হাতুড়ি দিয়া ষোলটি খুঁটি শক্ত মাটিতে বসাইতে হয়। সেই হাতুড়ি বাবার সময়ে সকলেই বিরক্তি প্রকাশ করিল বটে কিন্তু এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যখন সারি সারি তাঁবুগুলি খাটান হইয়া গেল তখন সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই হাসি কিন্তু নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী—কারণ দেখা গেল—সারা ছাউনির মধ্যে জলের জন্য মোটে দুইটি টিউব ওয়েল।

দুইদিন পর, বৈমানিকদের অসুবিধার কথা জানা মাত্র, স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরী আসিয়া সমস্ত ছাউনি পরিদর্শন করিলেন। পরদিনই জলাভাব কিছুটা দূর হইল। গোয়ালিয়র সহরের পানীয় জলের নল হইতে আমাদের ছাউনিতে একটা নলের ব্যবস্থা হইল।

এবার আমাদের শিক্ষার বিষয়টি খুবই গোপনভাবে রাখা হইল। বৈমানিকদের বলা হইল যে তাহারা যে সব চিঠি লিখিবে তাহাতে মহারাজপুরের ঠিকানা দেওয়া চলিবেনা। পত্রে বেসক্যাম্পের সংখ্যাটিই শুধু দিতে হইবে।

এবারকার শিক্ষার বিষয় হইল স্থলসৈন্যদের সাথে সহযোগিতা। আমাদের স্থল-সৈন্যদের দলকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল—একদল শত্রুপক্ষের ন্যায় কুচ-কাওয়াজ করিতে থাকিল আর অন্য দল অপরপক্ষ যাহাতে সক্রিয় থাকিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে থাকিল। দুইদলেরই সমস্ত চলাচল হইতেছে ঐ ধূসর রঙের সংকীর্ণ গিরিখাতের

মধ্যে বা পার্শ্বে, অথবা প্রান্তরের মধ্যে। আমাদের ছোকরাভূন এবার গোপন যুদ্ধের শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া উঠিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্থলবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার কাজে অনেক বিপত্তি আছে। প্রথমতঃ সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে শত্রুসৈন্য ও আমাদের নিজেদের সৈন্য—দুই পক্ষই লুকাইয়া আছে। দুই পক্ষেরই সৈন্যবাহিনী গিরিখাতের রংয়ের সাথে রং মিলাইয়া পোষাক পরিয়াছে এবং বিমান উড়িবার শব্দ পাইলেই একেবারে নিশ্চল হইয়া যাইতেছে—কেননা দ্রুতগামী বিমান হইতে নিশ্চল কোন বস্তুকে—সে মানুষই হউক আর জন্তু-জানোয়ারই হউক, দেখিতে পাওয়া যায় না। সচল বস্তুরই অস্তিত্ব ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। সেই জন্যই বোধহয় কতকগুলি পোকামাকড়ভুক জীবজন্তুর চক্ষু এমনভাবে প্রস্তুত যে, যতক্ষণ তাহার শিকার—অন্য কোনও পোকা-মাকড়—চুপচাপ নিশ্চল হইয়া রহিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব শিকারীর নজরে আসে না কিন্তু যেই সে সচল হইয়া উঠে অমনি শিকারীর নজরে তাহার সচলতা ধরা পড়িল। তাহার পর শিকারীর নিকট তাহার আর নিস্তার নাই। অনেক সময় দ্রুত উড়িয়া যাইবার কালে শত্রু-সৈন্য নজরে পড়িলনা বটে, কিন্তু মিত্র-সৈন্য শুধু নজরেই পড়িলনা—নজরে পড়িল একেবারে শত্রুসৈন্য হিসাবেই। বৈমানিকের চক্ষে যে কোনও সচল বাহিনীকে একবার শত্রুসৈন্য বলিয়া বোধ হইলেই—সেই বাহিনীর খুবই বিপদ! বৈমানিক কোনও দ্বিধা না করিয়া তাহার নিকট যতপ্রকার মারণাস্ত্র আছে, সবগুলি দিয়াই সচল বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। প্রথমে, গুলি নিক্ষেপ, তারপর বোমাবর্ষণ আর সর্ব্বশেষে যদি তাহার নিকট রকেট-চালিত মারণাস্ত্র থাকে, তবে সেইগুলির ব্যবহার করিবে। গুলি, বোমা বা রকেট-চালিত মারণাস্ত্র—কোনটিই যাদুমন্ত্রায়ক নয়।

বহুবার এই প্রকার ভুল নানাদেশের বৈমানিকরা করিয়াছে এবং করিবে। আমাদের দেশের বৈমানিকরাও করিয়াছে। কোন কালে বৈমানিকরা এই মারাত্মক ভুল হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় কাজ হইল—নিজ স্থলবাহিনীর চক্ষু হিসাবে কাজ করা। শত্রুপক্ষ লুকাইয়া রহিয়াছে—লুকাইয়া আক্রমণ করার উদ্যোগ করিতেছে, নিজ রসদ লুকাইয়া আনিয়া মজুদ করিতেছে, অথবা তাহারা আমাদের আক্রমণকে বাধা দিবার কি ব্যবস্থা করিতেছে বা কোন প্রকার ব্যূহ রচনা করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতেছে—এই সব খুঁটিনাটি ভালভাবে নজর করিয়া আসিতে হইবে এবং নিজ দলের স্থলবাহিনীর কর্ত্তাদের নিকট তুরন্ত সংবাদ পাঠাইতে হইবে। অনেক সময় বিমানের সম্মুখ দিকে বা পেটের তলায় ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা থাকে। তখন ক্যামেরার সাহায্যে শত্রুসৈন্যের কোথায় ছাউনি কোথায় রসদের গুদাম, কোথায়

দূর-পাল্লার কামান সজ্জিত রাখা আছে—সবকিছুর ছবি তুলিয়া আনা সম্ভব হয়। সেই সব ছবি দেখিয়া স্থলবাহিনীর কর্তারা তাঁহাদের কর্তব্য স্থির করেন।

তৃতীয় কাজও কম বিপজ্জনক নয়। শত্রুবাহিনীর বিস্তার এবং তাহারা কোথায় কি ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে অথবা তাহাদের উদ্দেশ্য কি—স্থলবাহিনীর কর্তারা হয়ত জানিতে পারিয়াছেন এবং সক্রিয়ভাবে শত্রুপক্ষকে বাধাদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করার প্রকৃষ্ট উপায় হইল আক্রমণ করা—পুরাকাল হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্থলবাহিনীর এই আক্রমণকে আকস্মিক ও প্রচণ্ড করিতে হইবে যাহাতে শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তখন, আক্রমণ যাহাতে আকস্মিক ও প্রচণ্ড হয়—সেইজন্য স্থলবাহিনীর কর্তারা এই কার্যের ভার দিলেন বিমান-বাহিনীর উপর। তাঁরা বিমানবাহিনীর কর্তাদের পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিলেন যে অমুক পাহাড়ের অমুক স্থানে বা অমুক সংকীর্ণ গিরিখাতের অমুক কিনারে বা অমুক জঙ্গলের অমুকভাগে, শত্রুপক্ষ যে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে হইবে। বিমান-বাহিনীর কর্তারা তখন সেই প্রয়োজনানুসারে বিমান ও মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করিবেন।

অনেক সময় স্থলবাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করার জন্য বিমানবাহিনী হইতে কিছু সংখ্যক স্কোয়াড্রন একেবারে আলাদা করিয়া স্থলবাহিনীর সাথে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তখন আর কর্তাদের মারফৎ বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রনকে হুকুম জানানোর প্রয়োজন হয় না—সরাসরিই স্কোয়াড্রনকে হুকুম দেওয়া হয়। সেই স্কোয়াড্রন তখন স্থলবাহিনীর তাঁবেদার হিসাব হুকুম তামিল করে।

চতুর্থতঃ স্থলবাহিনী যখন আক্রমণ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে, তখন যাহাতে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ সফল না হয়, তাহার জন্য শত্রুপক্ষের সমস্ত ঘাঁটিগুলির উপর বিমান হইতে প্রচুর বোমা বর্ষণ করিবে। ইহাতে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভাঙিয়া যাইবে এবং তাহার প্রতিরোধ-ক্ষমতাও যথেষ্ট নরম হইয়া যাইবে। নরম হইবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ শত্রুপক্ষ বোমা আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিবার পূর্বেই, স্থলবাহিনী শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তখন অনেক অল্প ব্যয়ে অর্থাৎ সৈন্য-সংখ্যা ও রসদ এই দুই প্রকার বস্তুর অনেক কম ব্যবহারে তাহারা যুদ্ধ খতম করিতে সক্ষম হইবে।

জেনারেল উইনগেট্টের স্থলবাহিনীর সাথে সহযোগী হইয়া জাপানী-বাহিনীকে বর্মাবুলুক হইতে হটাইবার জন্য আমাদের স্কোয়াড্রনকে তলিট ভেন্‌জিয়ান্স ডাইভ্ বম্বারের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এইবার সেই শিক্ষার যাহাতে সম্পূর্ণভাব পারদর্শী হওয়া যায়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিল। গোয়ালিয়র রাজ্যের সংকীর্ণ গিরিখাত অঞ্চলে আর

সেখানকার বনে-জঙ্গলে স্থলবাহিনীর সঙ্গে সহযোগী হইয়া কাজ করার শেষ পর্য্যায়ের শিক্ষা আমাদের আরম্ভ হইল। এর পর শিক্ষা বা অনুশীলন করার সুযোগ ও সময় আর পাওয়া যাইবে না। পারদর্শী হওয়া গেল কি না, তাহার প্রমাণ মিলিবে যুদ্ধক্ষেত্রে—জাপানী সেনা ও তাহাদের বিমানবাহিনীর সাথে—আমাদের মল্লযুদ্ধে।

নিশানার দিকে দশ-বার হাজার ফুট উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া যখন নিশানার ঠিক উপরে পৌঁছান গেল তখন বৈমানিক সোজাসুজি নিশানাকে তাক্ করিয়া নামিয়া আসে যেন বিমানই নিশানার দিকে তাক্ হইয়া পড়িতেছে—তারপর বৈমানিক যখন দেখিল যে বিমান নিশানার দিকে তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে তখন সে বোমাগুলি বিমান হইতে ফেলিয়া দিল। বোমাগুলি বিমান হইতে পড়ার সময় বিমানের গতিবেগ বাড়িতে সুরু করিল, ও পরে সেই গতিবেগের সাথে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির যোগে বোমাগুলির গতিবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। এর মধ্যে দশ-বার হাজার ফুট উপর হইতে বিমানটি প্রায় দুইহাজার ফুট নামিয়া আসিয়াছে। এই সময় নিশানার আরও নিকটে আসা সমীচীন নয়—কেননা বোমাগুলি অতি দ্রুতবেগে নিশানার উপর পড়িতেছে এবং পড়ামাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফাটিয়া যাইবে। বিমানটি যদি সেই সময় বিস্ফোরণের আওতার মধ্যে থাকে তাহা হইলে মহাবিপদ। বিস্ফোরণের পর হাওয়ার চাপ তাহাকে ইতস্ততঃ উড়াইয়া লইয়া ভূপাতিত করিবে। এই হাওয়ার চাপে, বিমানটি বৈমানিকের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন বৈমানিক তাহার নিজের তাক্ করা বোমায় বিমানসহ নিজেও বিনষ্ট হইবে। সেইজন্য বিমান হইতে বোমা পড়ামাত্র, বৈমানিক বিমানকে হয় সোজা উপরের দিকে, ইঞ্জিনের পূর্ণশক্তির জোরে উড়াইয়া লইবে, নতুবা পূর্ণগতিতে বিমানকে যেদিকে শত্রুসৈন্যের বিমান ধ্বংসী-কামান সন্নিবেশিত নাই—সেইদিকে লইয়া যাইবে। ততক্ষণে বোমাটি তাক্করা নিশানার উপর পড়িয়াছে এবং সেখানে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। যদি একই নিশানার উপর স্কোয়াড্রনের বারখানা বিমানই বোমা নিক্ষেপ করিতে পারিল, তাহা হইলে, বোমাবর্ষণের অব্যবহিত পরে, নিজপক্ষীয় স্থলসৈনা বিউগিলাদি বাদ্য বাজাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া সেখানে পৌঁছাইতে পারিবে। তখন শত্রুপক্ষ হইতে একটি গুলিও 'পী' শব্দে তাহাদের স্বাগত জানাইবে না।

এই ছিল আমাদের স্কোয়াড্রনের শিক্ষার বিষয় এবং স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে দুজন ফ্লাইট কমাণ্ডার নিজেদের ফ্লাইটের আটজোড়া বৈমানিকদের যতদূর সম্ভব পারদর্শী করিয়া তুলিলেন।

মহারাজপুরের আশে পাশে প্রচুর শিকার পাওয়া যাইত। বাঘ, নানাপ্রকার হরিণ ও ময়ূর ত ছিলই, তাছাড়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র নালায় (যদিও এই নালাগুলিই ঐ দেশে নদী বলিয়া খ্যাত —বাস্তবিক পক্ষে, সেগুলিকে নদী বলা চলে না) প্রচুর কুমীর। মহারাজপুরের সামান্য

কিছুদূরে শিবপুরী বিখ্যাত এক শিকারের জায়গা। সেখানে সন্ধ্যায় নদীর উপর পুলে দাঁড়াইয়া নীচে নদীতে বাঘ জলপান করিতেছে ও মাথা নীচু করিয়া, চক্ষু উপরে তুলিয়া আমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছে দেখা গেল। আমরা চারজন ছিলাম, তিন-জনেরই নিকট ০'৩০৩ ইঞ্চি মাপের সৈন্যবিভাগের রাইফেল বন্দুক। বন্দুকে পাঁচখানা করিয়া গুলি ভর্ত্তি। তাহা সত্বেও আমরা চারজনই অনিমেষ দৃষ্টিতে ব্যাঘ্র মহাশয়কে নয়ন ভরিয়া দেখিলাম—গুলি করিয়া মারিবার কথা কাহারও মনে আসিল না। মহাশয় জলপান করিয়া ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া উপরে নদীর পারে উঠিলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। সন্ধ্যার পর রাত্রের অন্ধকার নামিয়া আসিল। আমরা পুলের কংক্রীট রেলিং-এর উপর বসিয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করিতেছি। জীপগাড়ী দুইটা দূরে রাখা আছে। আমরা এই চারজন ছাড়া বহুদূর পর্য্যন্ত আর কোনও জনমানব নাই। চারিদিক মধুর সন্ধ্যার তরপুর—আমাদেরও তখন উঠি উঠি অবস্থা, হঠাৎ পাইলট অফিসার রহিম পুলের মাথার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"দেখো, উঁহা পিলা রংকা কেয়া হ্যায়—পহলে তো নেহি থা—আভি আয়া!" কথাটি শোনার সাথে সাথেই আমরা তড়াক্ করিয়া জীপ গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। যদিও জীপ গাড়ীর চারদিক খোলা, তবুও পুলের উপর খোলা জায়গা হইতে, জীপের ভিতর কিছুটা নিরাপদ। তারপর ইঞ্জিন চালু করিয়া সামনের বড় আলোগুলি জ্বালা হইল—কিন্তু ততক্ষণে পিলা-রংওয়ালা সরিয়া গিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাহাকে সুন্দর বিবেচনা করিয়া আঘাত করি নাই—সেই হয়ত তাহার ক্ষুধা নিবারণের একটা পন্থা খুঁজিতেছিল।

মহারাজপুরে থাকাকালে বাঘের সাথে আরও দুইবার দেখা হইয়াছে। কিন্তু কোনবারই কেহ অপর পক্ষের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। স্থানীয় একজন লোকের একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে আমাদের ছাউনিতে অনেক সাহায্য করিত; শবজি সংগ্রহ হইতে সুরু করিয়া, ধোবার নিকট পোষাক পৌছান পর্য্যন্ত। সব কাজেই সে তাহার টাট্টু ঘোড়াকে লাগাইত। টাট্টু ঘোড়াটা অবতরণ-ক্ষেত্রের মাঠে সারারাত ছাড়া থাকিত। একদিন সকাল হইতে টাট্টু ঘোড়াটা আর পাওয়া গেলনা। কিছু বেলা হইলে, প্রায় মাইল দুই দূরে আকাশে অনেক শকুনী পক্ষী উড়িতে দেখা গেল। সেখানে গিয়া টাট্টু ঘোড়ার অর্দ্ধেকটা অংশ, একটা ছোট কাঁটাগাছের পাশে পড়িয়া আছে দেখা গেল। নিকটে আরও কয়েকটা ঝোপঝাড়ও ছিল। আমরা গিয়াছি জীপ গাড়ীতে, সাথে একটা লাঠিও নাই। সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া, টাট্টুর অর্দ্ধ অংশ কোথায় গেল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি। এমন সময় আমাদের গাড়ীর চালকের দৃষ্টি দূরে এক ঝোপের উপর পড়িল। আর তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে, এক লাফে জীপে চড়িয়া বসিয়া এঞ্জিন চালু করিলেন। তাঁহার কার্যকলাপে আশ্চর্য হওয়ার পূর্বেই, আমরা তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিলাম, দূরে ঝোপের

আড়ালে হলুদ রংয়ের নিশ্চল মূর্ত্তি। বাক্‌রুদ্ধ আমাদের, এমন কখনও দেখি নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা রথারূঢ় হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম। চাটুর অন্য অর্দ্ধাংশ বোধ হয় সেইদিন রাত্রে সদ্ব্যবহার হইল।

অন্যবার, এক শুক্লপক্ষের রাত্রে তিন-টন লরীতে আমরা চিতল হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছি। সে দেশে তখন প্রচুর চিতল হরিণ। মাইল দশেকের পর সম্মুখের রাস্তার বাঁকে হলুদ রং দেখা গেল। বাঁকের দক্ষিণ দিকে বেশ উঁচু মাটির ঢিবি, আর সেই ঢিবিতে নানা জাতের গাছে ঘন জঙ্গল। মুহূর্ত্তের মধ্যে হলুদ রং ঢিবির পাশে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। আর ঝোপের মধ্য হইতে জ্বলন্ত জোড়া-চক্ষুর দীপ্তি দেখা গেল। জোড়া-চক্ষুর মধ্যভাগ তাক করিয়া একের পর এক আমরা সকলেই রাইফেল বন্দুকের তাক করিলাম। কিন্তু হলুদ-বরণের কপালে বোধ হয় সেদিন অপমৃত্যু লেখা ছিল না। অনেকবার তাক করিয়া গুলি নিক্ষেপ করা গেল, কিন্তু জোড়া-চক্ষু অক্ষতই রহিয়া গেল। আমরা হরিণ শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। কাজেই ব্যাঘ্রের প্রাণ হরণ করার কোন যুক্তি ছিল না। তিন-টন লরী লইয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়া গেল। বেশী দূর যাওয়ার পূর্ব্বেই আর একজন সাথী পাইলাম। এক বিরাটকায় হায়েনা। তিন-টন চলন্ত লরী হইতে কিছুতেই লক্ষ্য স্থির হইতেছিল না। গাড়ীর গতি বন্ধ করা হইল, অমনি হায়েনা রাস্তার পাশে খালে নামিয়া পড়িল। গাড়ী চালু করিতেই, সে আবার সাথী হইল। বিনা অনুমতিতে সাথে ভ্রমণ আমাদের ভাল লাগিতেছিল না, চলন্ত লরী হইতেই এবার তাহার উপর নিশানা তাক করা হইল। রাইফেলের এক গুলি লাগিতেই হায়েনা ধরাশায়ী হইল। সেদিন আর হরিণ শিকার করা হইল না। হায়েনা লইয়াই ফেরা গেল।

মহারাজপুরের গল্পে পণ্ডিতজীর গল্প না বলিলে কিছুই বলা হইল না। গোয়ালীয়র সহর আর মহারাজপুরের মাঝামাঝি যায়গায় পণ্ডিতজীর কুঁড়েঘর ছিল। নিকটে, রাস্তার পাশেই আরও কয়েকজনের বসতবাড়ী আর দোকান ঘরও ছিল। কিন্তু পণ্ডিতজীর কুঁড়েঘরে সহরের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকাল নয়টা-দশটার মধ্যে মিলিত হইতেন। পণ্ডিতজীর কাছে বিদ্যা-শিক্ষা বা শাস্ত্র-বচন শুনিতে তাঁহারা আসিতেন না। সকালে আসিতেন পণ্ডিতজীর নিজ হস্তে প্রস্তুত রসমালাইয়ের জন্য। দেরীতে আসিলে শুধু শুষ্ক বর্ত্তন মিলিত। ভারতের নানা যায়গায় ঘুরিয়াও এত মধুর রসমালাই আর কোথাও পাই নাই। তাঁহার প্রস্তুত রস-মালাইয়ে, রস বা মালাই কখনও তরল হইত না, সব জমাট-বাঁধা অমৃত। এর পরে ঐ অঞ্চলে আরও কয়েকবার যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোনবারেই তাঁহার কুঁড়েঘরকে সকালবেলায় অবহেলা করি নাই।

তিরুমঙ্গৈ আলবার

তিরুমঙ্গৈ তস্কর শ্রেণী বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চোল সেনাপতি ছিলেন। তাঁর বাল্যনাম নীল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তিরুবালির উপরাজ হন। এই সময়ে তিনি সুন্দরী কুমুদবল্লীর প্রেমে পড়েন। কুমারী তাঁর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে জানান বৈষ্ণব ছাড়া কাউকে তিনি গ্রহণ করবেন না। তিরুমঙ্গৈ স্থানীয় এক মন্দিরে জাগ্রত বিগ্রহের তুষ্টিসাধন ক'রে অঙ্গে সার্থক বৈষ্ণবের দশ চিহ্ন নিয়ে ফিরে এলেন। বিবাহ হল, কিন্তু কুমুদবল্লীর পণ ছিল তিরুমঙ্গৈকে এক বছর ধরে ১০০৮ জন বৈষ্ণব-ভোজন করাতে হবে। ধনিকের অর্থ এই ব্যয়ের জন্য অপচয় করাতে তাঁর কারাদণ্ড হল। কারাকক্ষে বিষ্ণু কাঞ্চীর বরদরাজস্বামীরূপে এসে তাঁকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দেন। সেই অর্থে নিজের মুক্তি অর্জন করে আবার বৈষ্ণবসেবা শুরু করেন। যথেষ্ট অর্থের অভাবে পথে রাহাজানি করছিলেন এমন সময়ে এক ধনী পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর সমস্ত সম্পদের বোঝা যখন তিনি তুলতে পারছিলেন না তখন পথিকের এক মন্ত্রে সে-ভার বহনে সক্ষম হলেন। তিনি সেই মন্ত্রে পেলেন চতুর্বেদ ও বিষ্ণুর দর্শন। এই দর্শনের ফল— 'পেরিয়া তিরুমোলি,' 'তিরুকুরুন্ তাণ্ডহম্', 'তিরুনেডুন্ তাণ্ডহম্,' 'তিরুবেঙ্কটুক্কৈ,' 'সিরিয় তিরুমডল্' ও 'পেরিয়া তিরুমড়ল'। শ্রীরঙ্গমে এলে রঙ্গনাথের আদেশে তাঁর মন্দির সংস্কার করান। দশাবতার দর্শনের পর তিরুক্কুরুণগুডিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

১

জরা ছেয়ে ফেলবার আগে
লাঠি ভর করবার আগে
ন্যুব্জদেহে দৃষ্টি সামনে ভূমিনিবদ্ধ রেখে
স্খলিতচরণে চলে-বসে শেষ হবার আগে
পূজা করব সেই বদরীর
যিনি ছদ্মবেশী জননীর স্তন্য শুষে রাক্ষসী * বধ করেছিলেন।

যৌবনের বিদ্রূপ শোনার আগে
(যখন লাঠি ভর করে পিঠে হাত রেখে কাঁপব থরথর,
চোখ ঠিকরে বেরুবে আর কাশির সঙ্গে তারী হবে নিঃশ্বাস)—
'কে এটা ? কী বুড়ো রে বাবা !'
বদরীর পূজা করতে চাই—
নৈমাছি যাঁর নাম গুঞ্জন করে।

* পুতনা

শলাকার মতো শিরা সব ফুলে ওঠার আগে
মাংস খুলে মন ভেঙে টালবাটাল চলার আগে
ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি বিস্ফারিত হবার আগে
শুধু সজ্ঞানে হাজার নাম জপ করব
পূজা করব বদরীর
যোঁবাছি যাঁর গুণ গায়।

রক্ত ফুরিয়ে চোখ নিশ্প্রভ হয়ে যাবার আগে
পিণ্ডক্লেশে বার্ধক্যে শ্লেষ্মার জর্জর স্খলিতচরণে চলার আগে
বদরীর পূজা করতে চাই—
যে-পুষ্করিণী ঘিরেছে তাঁকে সেখানে খেলছে মাছের ঝাঁক ;
এ-রাজ্য সেই রাখাল বালকের
যে গিরি ধারণ করেছিল একদা।

দেহবাবে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিকল হবার আগে
বার্ধক্যে নিরালা হতাশ হয়ে বসবার আগে
শ্লেষ্মা উদ্গীরণ ও লৌকিক কথার আবর কাটার আগে
সেই বদরীর পূজা করতে চাই
যাঁকে গানের সঙ্গে তুলসীর মালা পরাতে চায় সকলে,
চাই মন্দির প্রদক্ষিণ করে সহস্রনাম কীর্তন করতে।

২

নদীপারের গাছটির মতো ভীরু আমি
পাছে পুনর্জন্মের খানায় পড়ে যাই।
প্রভু তুমি ঘাণ তুমি স্বাদ তুমি স্পর্শ তুমি শ্রুতি...
এই পর্যন্তই সাধ্য আমার।

ঝড়ের মাঝে পড়া মাঝিমাল্লাদের মতো ভীরু আমি
পাছে পুনর্জন্মের খানায় পড়ে যাই।
চক্রপাণি, আমার কথায় ক্রোধ উদ্রেক হলেও
একটুখানি শুনো।

সাপের সঙ্গে একচালায় বাসিন্দার মতো ভীরু আমি
পাছে দুঃখের পুনর্জন্মে ডুবে যাই।
অম্বুজাক্ষ, বিভ্রান্ত আমার মন,
সহ্যের পথ তো খুঁজে পাই না।

শলাকার দুই জ্বলন্ত মুখের মাঝখানে পিঁপড়ের মতো ভীরু আমি
পাছে বিপথে ঘুরে ডুবে যাই পরিবর্তনের জন্মচক্রে।
আর্দ্র অন্তর নিয়ে এলাম তোমার কাছে,
তুমিই তো শাশ্বত পরম শিল্প।

বন্যার কবলে শিবাদলের মতো ভীরু আমি
পাছে নিয়তিদত্ত দুর্দশার খানায় ডুবে যাই
চিরন্তন রাজরাজ, তোমার হাতে বাঁধা পেয়ে
মুক্তির পথ হারিয়ে।

নিমগাছের পোকা কুরে কুরে নিমই খায়,
তোমার দাস তোমার চরণই আমার প্রিয়,
শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তুমি, তুমি নাগাঙ্কচ,
ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রকে তুমি উদ্ধার করেছিলে।

৩

মূঢ় বললে না তাকে,*
জীবন-বৈরী বললে না,
অন্ত্যজ বললে না,—
কৃপা করলে তাকে ;
তোমার করুণাধারায় অভিষিক্ত করে বললে,
'নম্রভীরু মৃগনয়না সে তোমার বন্ধু,
আমার ভাই তোমারও ভাই।'
সুখাবেশে সে ফিরতে অরাজী হলে আবার বললে,
'মিত্র আমার তুমি : এখানেই থাক।'

* গুহক

কথাগুলি আমার মনে ধরেছে,
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গমের দেবতা
সাগরকান্তি তোমার :
তোমার চরণে তাই তো শরণ নিলাম।

পবননন্দনকে তুমি অবজ্ঞা করনি বানর বলে
ভিন্ন জীব বলে—
যাতে প্রেম সমুদ্রের চেয়ে মহৎ হতে পারে—
তাই তুমি প্রেম দিলে আর বললে,
'তোমার দানের প্রতিদান দিতে পারি না,
আলিঙ্গন দিলাম তোমাকে
তুমি নিষ্কলঙ্ক সত্য।'
যাতে এমন প্রদীপ্ত বর লাভ হয় আবার
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গমের দেবতা,
তোমার চরণে তাই তো শরণ নিলাম।

পাড় তার সুবাসিত ফুলে ফুলে ঢাকা,
সেই মনোরম সরোবরে পদ্ম তুলতে গিয়ে
করি * যখন হিংস্র কুমীরের † পাকে মরু-বর,
তোমার রুদ্ররোষ আহ্বান করে
সে তখন স্মরণ করল তোমার চরণ,
নির্দয়মুখীর অবস্থাও হল জরজর—
তেমনি আমিও এলাম তোমার কাছে,
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গমের দেবতা
তোমার চরণে তাই তো শরণ নিলাম।

বিষবর্ষী ক্রুদ্ধ ফণী § সন্ত্রস্তে যখন আশ্রয় চাইল
তখন তাকে আশ্রয় দিলে তুমি,
তোমার সুদর্শন বাহনকে দিলে তার রক্ষার ভার।
তোমার এই করুণা দেখে
কঠোরতাধী নির্দয়নিষ্ঠুর যমদূতদের ভয়ে

* শাপগ্রস্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন † গন্ধর্ব হুহু § সুমুখ

দাসানুদাস আমি,
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গনের দেবতা
তোমার চরণে এই শরণ নিলাম।

চিরন্তন চতুর্বেদে পারঙ্গম মহর্ষির* পুত্র
যাকে ছাড়বেনা কঠোর যম
তাকে দিলে প্রার্থিত নিরাপদ আশ্রয়,
কালের প্রতি ভ্রূকুটির পরেও ছাড়লেনা তাকে—
আরো করুণা ঢেলে দিলে,
তার যেন চিরাসক্তি থাকে তোমার পায়ে,
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গনের দেবতা
আমিও তেমনি তোমার চরণে শরণ নিলাম।

যে ব্রাহ্মণ‡ তোমাকে দিয়েছিল মন্ত্র ও উপবীতের রহস্য
তার প্রার্থনা
'জানি না কোথায় লুকানো আমার পুত্র ;
তুমি তো জানো,
ফিরিয়ে এনে দাও তাকে।'
সত্যের প্রতিনা তুমি ঘুচিয়ে দিলে তার শূন্যতা—
এনে দিলে তার পুত্রটিকে ;—
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গনের দেবতা
তোমার চরণে এই শরণ নিলাম।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক তোমার কাছে এসে জানাল,
'আমার স্ত্রী তাঁর সন্তানদের জন্মের পরে দেখতে পায় না,
কোনো নির্দয় দেবতা তাদের লুকিয়েছে।'
শত্রুদের সামনে তুমি দেখালে তোমার করুণা,
বললে তাকে, 'ফিরে আসুক তোমার সন্তানরা'
আর এল যমনি তারা ফিরে।
তরুশ্যামল শ্রীরঙ্গনের দেবতা
আমিও তোমার চরণে শরণ নিলাম।

---

* মার্কণ্ড † মার্কণ্ডেয় (মার্কণ্ড শিবের তপস্যা করে যমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ছিলেন। আলবার এই কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণবকথায়)।

‡ শান্তিপিনি

P8446

Space Donated By—

ESBEE PRINTERS

PRINTERS OF DISTINCTION

5, Subodh Mullick Square (North)

CALCUTTA—13

With best compliments from :

Hooghly Filling Station

Hooghly

West Bengal

Space Donated By

A. Sirkar & Sons

Son & Grandsons of late
M. B. Sirkar

171-1A, Rashbehari Avenue
Ballygunge, CALCUTTA-19

GRAM : GUINECRAFT PHONE : 46-6258

Leading Jeweller of Calcutta

Telegrams 'VesseP Cal

Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones: { Office 23-1393; Dock Office : ; Residence : { 55-6464, 55-3724, 55-503

Sarat Chatterjee & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1

Regular Services :

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of :

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch : VIZAGAPATAM

Telegrams : VESSEL

With Compliments of :—

Inter Provincial Transport Co.,

57, Radhabazar Street,

CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE:
46-1512.

OFFICE PHONE :
22-4972.

Planning a new project ?

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment? All this and many other project problems may confront you. Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours. It is they who know the Indian conditions best.

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS □ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION □ SITE SELECTION AND SURVEY □ BASIC AND PROCESS ENGINEERING □ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL □ DETAIL DESIGN ENGINEERING □ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT □ COMPLETE PLANT ERECTION □ START-UP AND COMMISSIONING □ INITIAL OPERATION □ TRAINING OF PERSONNEL □ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

Evidently the reasoning mind finds it difficult to reach the Divine but a simple heart can enter into contact with Him almost without effort.

—The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Telegram : BIDYASEVA **22-1532-33**

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

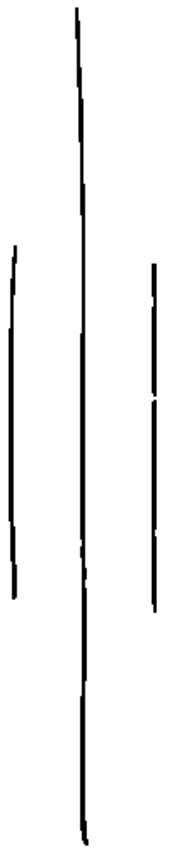

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

Reg. No. 13773/66

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশনা

যোগ সাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
স্মৃতির পাত্র (১ম পর্যায়)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮·৫০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৪·০০
কবির্মনীষী (১ম খণ্ড)	ঐ	৩·০০
ঐ (২য় ,,)	ঐ	৮·৫০
রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৩.৫০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও কর্ম	পশুপতি ভট্টাচার্য (অনুবাদক)	৫·০০
Talks with Sri Aurobindo	by Nirodbaran	৮·০০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্তমান জগৎ	অনিলবরণ রায়	২·০০
সাধনার জীবন	নলীরকান্ত গুপ্ত	১·০০

আশ্রম প্রকাশনা

বিবিধ রচনা	শ্রীঅরবিন্দ	১·০০	উত্তম রচনা	শ্রীমা	
ভারতের নবজন্ম		১·৫০	ছোটদের গল্প		
কর্মযোগী		১·৫০	পুরাণো লেখা		
জগন্নাথের রথ		১·০০	শিক্ষা		
গীতার ভূমিকা		২.০০	মায়ের আলাপ		
শ্রীঅরবিন্দের পত্র		১·০০	সর্বোত্তম আবিষ্কার		

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন—৩৪-২৩৭৬